শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী

ভক্তিভাজনেষু

॥ লেখকের নিবেদন ॥

১৮৫৪ সালের অগস্ট মাসে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মাসিক পত্রিকা'র প্রতি সংখ্যার প্রারম্ভে লেখা থাকত—"বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" এই উক্তি অনুসরণ করে আমিও বলতে চাই যে, বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্য রচিত হয় নি; ছাত্রসমাজ ও জিজ্ঞাসু পাঠক এর প্রধান লক্ষ্য। এর প্রথম চারটি অধ্যায়ে সমালোচনা সম্পর্কে সাধারণ কথা এবং শেষের পাঁচটি অধ্যায়ে সংক্ষেপে সমালোচনার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। স্বল্প পরিসরের জন্য অনেক কথা আশানুরূপ ভাবে বলতে পারি নি, সূত্রাকারে তথ্যসন্নিবেশ করতে বাধ্য হয়েছি।

পরিশেষে 'সুপ্রকাশ'-এর কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের তৎপরতার গুণেই এই গ্রন্থটি অল্প সময়ের মধ্যে সুমুদ্রিত হতে পেরেছে। তাঁদের সতর্ক প্রয়াস সত্ত্বেও দু-একটি মুদ্রণত্রুটি রয়ে গেল।

অ. কু. ব.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩৬৬ ॥ ১৯৫৯

এক

॥ মুখবন্ধ ॥

চতুরানন ব্রহ্মা বিশ্ব সৃষ্টি করে নিশ্চয় আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছিলেন; চারিদিকের অযুত বস্তুপিণ্ডের বিশৃঙ্খল স্তূপ থেকে রূপরসগন্ধভরা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার নীতিনিয়মের শাসনবন্দী অবয়ব-পরিকল্পনা অবশ্যই প্রশংসা দাবি করতে পারে। কিন্তু বিশ্বামিত্রকে যদি বিচারকের আসনে বসিয়ে দিয়ে পিতামহের সৃষ্টিপ্রকরণের মূল্যাবধারণ করতে বলা হত, তা হলে নিশ্চয় তিনি বৃদ্ধ চতুর্মুখের বয়সের দিকে তাকিয়েও কিছুমাত্র করুণা বোধ করতেন না—পিতামহের সৃষ্টিটিকে বিচার-বিশ্লেষণের ছুরি দিয়ে কেটে কেটে এর অসঙ্গতি, ব্যর্থতা ও ত্রুটি আবিষ্কার করতেন।

একালে যিনি পদার্থবিদ্যা পাঠ করে অভিজ্ঞ হয়েছেন, তিনিও বিশ্বগোলকের মধ্যে রচনাগত স্থূল হস্তাবলেপের স্পর্শ পাবেন। তবু এই জরতী পৃথিবী ছাড়া যখন অন্য কোন বাসযোগ্য গ্রহ সম্প্রতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, তখন এটাকেই কোনমতে মেনে নেওয়া যাক।

বিশ্বসৃষ্টিকে যিনি একটা বিশেষ নীতির বাতায়ন থেকে লক্ষ্য করেন এবং সব কিছুর অন্তরালে মঙ্গলময়ের করুণাপূর্ণ হস্তক্ষেপ দর্শন করে মনে মনে তদ্গত হয়ে ওঠেন, তিনিও তলিয়ে দেখবে বিশ্ববিধানের পশ্চাৎপটে নীতিনিয়মহীন অভাবাত্মক বিশৃঙ্খলা ছাড়া অন্য কোন সৎ পরিকল্পনার নিত্যশুদ্ধ পরিস্ফুরণ খুঁজে পাবেন না।

ব্রহ্মাকে হয়তো আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরিতে দাঁড়িয়ে অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিযুক্ত সৃষ্টির জন্য জবাবদিহি করতে হত। শুধু সৃষ্টি করেই যে তিনি চারযুগ ধরে স্রষ্টার গৌরব দাবি করবেন, তা চলবে না। তাঁর সৃষ্টিকে সমালোচকের ভ্রূকুটির সম্মুখীন হতে

হবে; তার জন্য তাঁর ভাগ্যে রুষ্টি-তুষ্টি, কোতল-শিরোপা—যাই জুটুক না কেন!

সৃষ্টিকর্ম আর সৃষ্টিকর্মের বিচার, বিশ্লেষণ, মূল্যাবধারণ—সব একই সূত্রে গ্রথিত। অবশ্য সর্বাগ্রে সৃষ্টি, তারপর তার মূল্য যাচাই। রাম না হতে রামায়ণ রচনা হওয়া সম্ভব, কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি-পরিমাপ সম্ভব নয়। আদিকবি বাল্মীকি শরাহত ক্রৌঞ্চকে দেখে সহসা অভিশাপবাণী উচ্চারণ করেই উপলব্ধি করলেন—সে অভিশাপ শুধু পরিমিত বাক্‌পুঞ্জ নয়, শব্দশৃঙ্খলার অর্থসমন্বিত মালাও নয়, তা কবিতা, শ্লোক—অর্থের সঙ্গে আছে সুর, বিবৃতির সঙ্গে রস। অকস্মাৎ কবিকণ্ঠোচ্চারিত দু পঙ্‌ক্তি তাঁর মনে একাধারে স্রষ্টার সংহত আবেগ এবং সমালোচকের বিশ্লেষণী বিচারবোধ ও জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলল :

তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।
শোকের্তানস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া॥

'বাল্মীকি ব্যাধের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া, আমি পক্ষীর শোকে আকুলচিত্তে কি কার্য করিলাম, বারংবার এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।'
(বসুমতী সাহিত্যমন্দির-প্রকাশিত বাল্মীকি রামায়ণ)

এই যে 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'—এর দ্বারা স্রষ্টা বাল্মীকির মধ্যে সমালোচক জাগ্রত হলেন। শোকার্ত মুনি অপার শক্তির বশেই স্রষ্টা ও সমালোচকের মধ্যে সেতু রচনা করলেন। তারপর তিনি ভাবতে শুরু করলেন,

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥

'আমার মুখ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইল, উহা সমাক্ষর চরণচতুষ্টয়ে নিবদ্ধ তন্ত্রীলয়সমন্বিত। এই বাক্য শোকসহকারে যখন কণ্ঠ হইতে সমুচ্চারিত হইয়াছে তখন ইহা শ্লোক নামে প্রথিত হউক।' (অনুবাদ—ঐ)

কবি বাল্মীকি সমালোচকের বিশ্লেষণী বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়ে চরণচতুষ্টয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হলেন এবং দেখলেন—এর উৎপত্তির মূলে রয়েছে পূর্ণকুম্ভোচ্ছলিত জলের মতো শোকার্ত-চিত্তের আবেগমথিত বাঙ্ময় আত্মপ্রকাশ এবং সেই নিরুপাধিক আত্মপ্রকাশ তন্ত্রীপদলয়সমন্বিত সমাক্ষরবদ্ধ চরণচতুষ্টয় বেছে নিল। সুতরাং দেখা গেল, পুরাতনী কথায় শিল্পসৃষ্টির পরমুহূর্তেই তার মূল্যবিনির্ণয় ও স্বরূপজিজ্ঞাসা সম্বন্ধে স্বয়ং স্রষ্টার মনেই কৌতূহল সঞ্চারিত হয়েছিল।

পরম শ্রদ্ধেয় ঋষিকবির কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি প্রত্নতত্ত্বের পাথর ঠেলে এবং নৃতত্ত্বের হাড়ের প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রাগৈতিহাসিক গুহামানবের অন্ধ পাষাণপুরীর স্বল্প অবকাশে ফিরে যাই, তা' হলে সেখানে দেখব, সে যুগের বর্বর মানুষের মনেও একই সঙ্গে শিল্প-চেতনা এবং শিল্পচেতনার স্বরূপ সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছিল।

কল্পনার পাখায় ভর করে আমরা যেন অনেক পিছিয়ে গেছি। গুহামানবের সংসার! সন্ধ্যার প্রাক্কালে আগুন জ্বালিয়ে ভোজ্য প্রস্তুত হচ্ছে সদ্য-নিহত পশুদেহ থেকে। গুহার বাইরে অকূল আঁধারের নিশ্ছিদ্র যবনিকা, ভিতরে গুটিকয়েক নরাকার জীব রসসিক্ত রসনায় সেদিনের শিকার-কাহিনী আলোচনা করছে। একটা বড় শিকার পালিয়ে গেছে; যে লোকটি সেই শিকার হননে ব্যর্থকাম হয়েছে, সে পাথরের ধারালো অস্ত্রের অগ্রভাগ দিয়ে মাটির ওপর আঁকজোক কেটে বোঝানোর চেষ্টা করছে—পালিয়ে-যাওয়া দাঁতাল শিকারটার আকার কত বড়। স্বল্প আলোয় সকলে ঝুঁকে সেই আঁকাজোকা থেকে প্রকাণ্ড জন্তুটার আকার আয়তন বুঝে নেবার চেষ্টা করছে। আঁকা হল—প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অর্থহীন রেখাপঙ্‌ক্তি।

যারা নির্বাক বিস্ময়ে বনের পশুর রেখাবন্দী নিরীহ রূপ লক্ষ্য করছিল, তাদের মধ্যে একজন কখন যে মুগ্ধবিস্ময় ত্যাগ করে আঁকা ছবিটা বিচার করতে আরম্ভ করেছে, তা সে নিজেই বুঝতে

পারে নি। সে-ই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠল, "না, ঠিক সেই জন্তুটার মতো হয় নি; তার পা কি ঐরকম ছোট? দাঁতগুলো এইরকম সোজা? একটু বাঁকানো নয়?"

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে স্রষ্টা ও বিচারক, শিল্পী ও সমালোচক যে কথা ভেবেছিল, শিল্পসম্বন্ধে যে অশরীরী অস্পষ্ট মূল্যতত্ত্ব তাদের মনে জেগেছিল—শিল্পবিচারের পক্ষে তা নিতান্ত তুচ্ছ হতে পারে; কিন্তু গুহাবাসী শিল্পী ও তার সমালোচক এবং আধুনিক বিশ্বের নানা তথ্যে অভিজ্ঞ সাহিত্যবিচারক—দুয়ের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য থাকলেও গুণগত পার্থক্য নেই। শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে শিল্প-সমালোচনা অনুস্যূত হয়ে আছে অর্ধনারীশ্বরের মতো।

কবি এজরা পাউণ্ড একবার বড় লজ্জায় পড়েছিলেন। সৌন্দর্য-বোধ সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলো বাঁধাপথ আছে—তার বাইরে যেতে হলে চেনাপথে-চলা রসিক মন পদে পদে ঠোক্কর খায়। এজরা পাউণ্ড লিখছেন :

> একটি মেয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে, একটা ছোট ছেলে, তালিদেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেগে—সে থাকতে পারল না, বলে উঠল, "দেখ্ চেয়ে রে, কি সুন্দর।" এই ঘটনার তিনবৎসর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ডিনমাছ পড়েছিল বিস্তর। বড়ো বড়ো কাঠের বাক্সে ওর দাদাখুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল ব্রেসচিয়ার হাটে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেটা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি করে লাফালাফি করতে লাগল। বুড়োরা ধমক দিয়ে বললে, স্থির হয়ে বোস্। তখন সে সেই সাজানো মাছ-গুলোর ওপর হাত বুলাতে বুলাতে তৃপ্তির সঙ্গে ঠিক সেই একই কথা আপন মনে বলে উঠল, "কি সুন্দর।" (রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভাবানুবাদ)

মেয়েও সুন্দর, সার্ডিন মাছও সুন্দর? লজ্জার কথা বৈকি! কিন্তু জেলের ছেলেটি যদি সহসা জাতিস্মর হয়ে উঠত, তা হলে সে আবিষ্কার করত যে, সে কেবলমাত্র জেলের ছেলে নয়—সে উপনিষদের নচিকেতা। তখন সে দুই সৌন্দর্যের বিচার করতে বসত এবং নারীসৌন্দর্য ও আমিষাক্ত সৌন্দর্যের মধ্যে ভেদ কোথায়,

তা নিয়ে প্রাজ্ঞ আলোচনায় প্রমত্ত হতে পারত। বালকের মধ্যেও সৌন্দর্যবোধ তথা শিল্পমূল্য সম্বন্ধে একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য অস্পষ্ট রকমের ধারণা আছে। কিন্তু সেই ধারণার সঙ্গে বিচারশীল বিশ্লেষণশক্তি ততটা নেই বলে সে শুধু 'কি সুন্দর' বলেই ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্তু যে মানুষ শিল্পবোধের 'পৌগণ্ডদশা' উত্তীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে রসভোগের বিস্ময়বোধের সঙ্গে রসবিচারের বিশ্লেষণশক্তি সংযুক্ত হয়ে আছে।

সমালোচনা ও মূল্যবাদ

সমালোচনা বা সাহিত্যবিচার বলতে সাধারণতঃ আমরা কি নির্দেশ করে থাকি, আগে তার স্বরূপ-লক্ষণ জানার চেষ্টা করা যাক। ব্রহ্ম থেকে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সমস্ত গুরুলঘু ব্যাপার মানুষের কাছে কতকগুলো মূল্যবোধের প্রতীক বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মানুষের চিত্তলোকে যে সমস্ত প্রত্যয় গড়ে উঠেছে, তার কিছুটা অশরীরী বা সূক্ষ্ম চেতনার সমষ্টি, কিছুটা অপেক্ষাকৃত স্থূল ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি। স্থূল সূক্ষ্ম যে রকম প্রত্যয়ই হোক না কেন, মানুষ তাকে বিশেষ ধরনের মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করে তবেই তাকে গ্রহণবর্জন করে। গ্রহণবর্জনই মানুষের শেষ কথা—হয় সে বিশেষ বিশেষ ভাবানুষঙ্গকে গ্রহণ করে, আর না হয় 'নেতি' বলে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই দেওয়া-নেওয়ার মূলে থাকে একটা বিশেষ ধরনের মূল্যাবধারণসত্তা। মূল্যবাদ (Theory of Values) এবং উপযোগবাদ (Utilitarianism)—দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রথমটির স্বরূপ নির্ণীত হয়। যখন কোন কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে এসে প্রকাশ প্রার্থনা করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুসত্তার সংযোগ ঘটে, তখন আমাদের চিত্ত সেই ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিকে সানন্দে স্বীকার করে—কখনও নিরুৎসুক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে, কখনও বা চণ্ডবেগে প্রত্যাখ্যান করে। এই যে গ্রহণবর্জনের সক্রিয় আসক্তি, বা না-গ্রহণ না-বর্জনের নিষ্ক্রিয় নির্বেদ—এর পিছনে একটা উপযোগ সবসময়ে কখনও প্রত্যক্ষ-

ভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে বহমান থাকে। উপযোগের গুণকর্মানুসারে প্রত্যয়ের মূল্য নির্ধারিত হয়। উপযোগ বস্তুমূল্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, গঠন করে, রূপান্তরিত করে। উপযোগের পরিবর্তন ঘটলে *মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটবে।*

বাল্যকালে গুরুজনের শাসনতর্জনী উপেক্ষা করে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে নি এমন বালক দুর্লভ। অথচ সেই বালক যখন কিশোর হল, যুবক হল, তখন গোয়েন্দাগিরির লোমহর্ষক কাহিনী তাকে আর ততটা প্রলুব্ধ করতে পারল না। বালকের বিশ্বাসপ্রবণ, দুঃসাহসিক ও কল্পনাবিলাসী মনের কাছে ঐ গোয়েন্দাকাহিনী বা খুনজখম-ডাকাতির গল্প বিশেষ উপযোগী ছিল, এবং উপযোগী ছিল বলেই তার কাছে বটতলাপ্রকাশিত এবং পঞ্জিকাবিজ্ঞাপিত ডিটেকটিভ গল্পগুলির মূল্য ছিল অসাধারণ। কিন্তু যখন সেই বালক কৈশোরের জলতরঙ্গ পার হয়ে যৌবনের নীলাভ বারিধির বুকে পড়ল, তখন তার চিত্তলোকে নতুন প্রত্যয়, নতুন আকাঙ্ক্ষা পাখা মেলতে আরম্ভ করেছে ; 'নীলবসনা সুন্দরী'র রোমাঞ্চ ও রোমান্সের উপযোগিতা তখন তার মন থেকে উবে গেছে, ডিটেকটিভ বইয়ের মূল্যাবনতি ঘটেছে। সুতরাং শিল্প ও সাহিত্য বিচারে এই মূল্যাবধারণের পিছনে একটা বিশেষ উপযোগ বা প্রয়োজনের তাগিদ উঁকি দিচ্ছে। এই মূল্যাবধারণ সাহিত্যবিচারের সবচেয়ে বড় কথা। হুগো যে বলেছিলেন, "Is the work good or bad ?—that is criticism's domain."—সেখানও ভালমন্দ বিচারবুদ্ধির অন্তরালে ভালত্ব ও মন্দত্বের মূল্যবোধই উঁকি দিচ্ছে।

একহাত দাবাখেলার চেয়ে একটি গীতিকবিতা কোন কোন লোকের কাছে কেন ভাল লাগে ? সত্যেন্দ্রনাথের একটি কবিতার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা কেন প্রিয়তর মনে হয়, কেনই বা বাল্মীকিব্যাসের পাশে হোমরকে কিছু নিষ্প্রভ মনে হয় ? আসলে আমরা সাহিত্যজিজ্ঞাসা বা শিল্পবিচারে কতকগুলো মূল্যের মাপকাঠি ব্যবহার করি। মনোবিজ্ঞানের কাছে দীক্ষা নিয়ে রিচার্ডস্

বলেছেন, "to set up as a critic is to set up as a judge of values."—কথাটা অতিশয় সত্য। সাহিত্যবিচারের প্রধান কথাই হল বিশেষ মূল্যমানের দ্বারা কবিকৃতির স্বরূপ নির্ণয়। কালিদাসের 'মেঘদূত' ও ধোয়ীর 'পবনদূত' যে আমার কাছে এক মনে হচ্ছে না, শেক্সপীয়রের *Antony and Cleopatra*)এবং শ'য়ের *Caesar and Cleopatra*-র স্বাদ যে আমার কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে হচ্ছে, ইসকাইলাসের *Prometheus Bound* এবং শেলীর *Prometheus Unbound*(যে একজগতের অধিবাসী নয়, একথা কেন মনে হচ্ছে? কারণ এগুলি পড়ার পর এদের তুল্যমূল্য স্বরূপ সম্বন্ধে কতকগুলো মূল্যবোধ জেগে উঠে। অবশ্য এ মূল্যবোধ ওপর থেকে আরোপিত আইনকানুনের নিয়মশাসন নয়; বাসনা ও সংস্কার থাকলে সৎগ্রন্থের সাহায্যে মানুষের মনে স্বভাবতঃই ভাললাগা মন্দলাগার মূল্য সৃষ্টি হবেই। ছোট বড় মাঝারি শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে পাঠকের যে বিশেষ ধরনের মানসিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে, অন্য কথায় তাকে সাহিত্য-বিচারের মূল্যায়ন বলা চলতে পারে।

মূল্যাবধারণের স্বরূপ

আমরা দেখলাম সাহিত্যবিচারের মূলকথা হল মূল্যবিনির্ণয়। বিশেষ গ্রন্থ বা কবিকৃতির স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে এই মূল্যের স্বরূপ আগে বুঝে নিতে হবে। এখন দেখা যাক—সমালোচক বা রসপ্রমাতা কোন্ কোন্ মূল্যমানের সাহায্যে সাহিত্যের গুণাগুণ নির্ণয় করেন। তিনভাবে এই বিচার বা মূল্যায়ন হওয়া সম্ভব: ব্যাখ্যান, বিচার ও রসোপভোগ।

সাহিত্যের স্বরূপনির্ধারণে ব্যাখ্যান হল রাজভবনে প্রবেশের সদর দেউড়ি। গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করে তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের বস্তুগত পরিচয় দেওয়া ব্যাখ্যানমূলক সাহিত্যবিচারের এলাকা-ভুক্ত। ধরা যাক গ্যয়টের *Faust*-এর কথা। *Faust*-এর মধ্যে মানবাত্মার চূড়ান্ত সঙ্কট বর্ণিত হয়েছে; আধুনিক মানুষের যে

চিত্তসঙ্কট তাকে আত্মস্থ হতে দিচ্ছে না, সেই অন্তর্বেদনার রক্তশত-দলে *Faust*-এর প্রতিষ্ঠা। সমালোচক যখন এই গ্রন্থটির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেবেন, তখন সেখানে প্রধান ভূমিকা হবে পাঠকের। বিষয় নয়, বিষয়ীও নয়, বিষয়-বিষয়ীবহির্ভূত পাঠকচিত্তই তখন সমালোচকের প্রধান লক্ষ্য। সমস্ত বিচারপদ্ধতিটি অনেকটা বিবাহব্যাপারে ঘটকের মতো—সমালোচক পাঠকলেখকের সংযোগ করিয়ে দিতেই ব্যস্ত; লেখক ও পাঠকের চারচক্ষুর মিলন হয়ে গেলেই সমালোচকের কাজ শেষ হল। কার্লাইল বলেছেন, "Criticism stands like an interpreter between the inspired and the uninspired"—অনেকটা আদালতের দোভাষীর মতো। বিচারক আসামীর ভাষা বোঝেন না, আসামীও বিচারকের ভাষা বোঝে না। মাঝখানে দোভাষী দাঁড়িয়ে কাঠগড়া ও বিচারাসনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। Inspired অর্থাৎ কবি এবং uninspired অর্থাৎ সাধারণ পাঠক—এর একজন অপরজনের কথা সব সময় বোঝে না, কোন কোন সময় ভুল বোঝে। এই সময় সমালোচক এসে দুয়ের মধ্যে রাজযোটক মিল ঘটিয়ে দেন। তখন সমালোচকের কাজ শুধু ব্যাখ্যান—কবির দৈববাণীকে রসিকের কর্ণগোচর করে একটি গীতিকবিতা, একটি নাটক বা একটি আখ্যানের মূল তাৎপর্য, তার রস, শিল্পত্ব, স্রষ্টার বোধ ও বোধি—এইগুলিকে সমালোচক পাঠকের কাছে ফুটিয়ে তুলবেন। সমালোচক তখন তাঁর ব্যক্তিগত ভাললাগার ভাবোচ্ছ্বাস বা ভাল না লাগার নিরুচ্ছ্বাস নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না; তিনি যথাসম্ভব নিঃস্পৃহ, নিরাসক্ত ও বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যবিচারে এমনভাবে প্রবৃত্ত হবেন যাতে পাঠকের সঙ্গে সাহিত্যের প্রাথমিক পরিচয় ঘটতে কোন বাধা, কোন আরোপিত নিয়মকানুনের বাঁধন না পড়ে। ব্যাখ্যানমূলক সমালোচনার একমাত্র কাজ, সাহিত্যকে পাঠকের কাছে সুবোধ্য করে তোলা, রসোপভোগের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সমালোচনা—বিচার, সমালোচক—দণ্ডপাণি,—যেখানে তিনি নীতি বা সাহিত্যতত্ত্বের গজকাঠি দিয়ে শিল্পবিচারে প্রবৃত্ত হন। বিচারকের আসনে বসে গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে সমালোচক তখন সাহিত্যকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেন। সেন্ট্ বোভের মতে সাহিত্যসমালোচনা "should ameliorate society by restoring morals, by promoting healthy tastes and by cultivating the best tradition." এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—সমালোচককে শুধু বিচারকের ভূমিকায় নয়, বিধানদাতার বেদীতে স্থাপনের ইঙ্গিত এই উক্তির নিহিতার্থ। সমালোচক সাহিত্যের মূল্য বিচার করবেন। লেখকের দোষগুণ অনুসারে কখনও তর্জন করবেন, কখনও অভিনন্দিত করবেন। সমাজের কতটুকু কল্যাণ হল, সাহিত্যিক কী পরিমাণে জগতের প্রতি উপচিকীর্ষু হতে পেরেছেন, মূঢ় পাঠক মুগ্ধ বিস্ময়ে হীরের দরে বেলোয়ারী মাল খরিদ করছে কিনা, ইত্যাকার দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য তাঁর উপর অর্পিত হয়, অথবা তিনি নিজেই এই পবিত্র (কখনও বা কিছু অপ্রীতিকর) কর্তব্যের গুরুভার স্কন্ধে তুলে নেন। তখন তিনি দক্ষিণে লেখকের ত্রুটির প্রতি সজাগ হন, বামেও পাঠকের রুচির দরজায় চাবি নিয়ে অপেক্ষা করেন। রিচার্ডস্ যাকে 'judge of values' বলেছেন, সমালোচকের এটাই হল সামাজিক কর্তব্য। জনসনও এই সাহিত্যবিচারকদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ উক্তি করে বলেছেন, "Nature and learning had qualified for judge." স্বাভাবিক শক্তি ও শিক্ষাদীক্ষার বলে সমালোচকের রসবিচারের অধিকার জন্মায়। তখন সমালোচকেরা "discover the purpose, judge its worth, criticize the technique." (Abercrombie) একদা সমালোচকের স্থান শিল্পীরও ওপরে ছিল, তাঁরাই লেখককে নির্দেশ দিতেন এবং পাঠকের রুচি শাসন করতেন—এখনও যে তাঁরা সেই সিংহাসন থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তা নয়।

কিন্তু সব কিছুরই প্রতিক্রিয়া আছে। সমালোচনায় বিচারকের ভূমিকা লেখক-পাঠক কারো ভাল লাগবার কথা নয়। যদি সমালোচক সদম্ভে বলে ওঠেন, "We undertake, therefore, to create a poet" (Scaliger)[১], তাহলে যুবক গ্যয়ঠেকে তীব্র ভাষায় বলতে হয়, "Kill the dog, he is a reviewer." পেশাদার সমালোচকের অসহ্য গুরুগিরি সহ্য করতে না পেরে ফ্লোবেয়ার যদি বলে ওঠেন "what droll creatures these College professors are whenever they talk about art", তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

এর প্রতিবাদ ওঠা স্বাভাবিক। সমালোচনা কি দণ্ডদান, বিধিনিষেধের সংহিতাশাসন? সমালোচকের কাজ শুধু প্রসাদ বিতরণ আর তর্জন, শাসন আর সোহাগ? প্রতিবাদটা পাঠকের পক্ষ থেকে যতটা উঠল, তার চেয়ে বেশি উঠল স্বয়ং শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষ থেকে। শিল্পী সমালোচককে মিত্ররূপে পেতে চান, শাস্তারূপে নয়। সুতরাং শিল্পীরাই ঘুরিয়ে বললেন, "to judge of poets is only the faculty of poets." (Johnson) কবিরাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক, কাব্যসমালোচনার জন্য কবিপ্রতিভার প্রয়োজন। সমালোচকের স্থান শিল্পীর নীচে, ওপরে নয়। এ কথা অবশ্য সত্য যে, সৃষ্টিশীল শিল্পপ্রতিভার চেয়ে শিল্পবিচারের প্রতিভা কিছু ঊনার্থক। কে না জানে 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' জিনিসের দাম নতুনের চেয়ে অনেক কম? সৃষ্টিকর্ম ব্যাখ্যাই যদি সমালোচকের প্রধান কর্তব্য হয়, তা হলে সমালোচনা যে সাহিত্যকর্মের খিদমতগারের ভূমিকা গ্রহণ করবে, তা বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হয়। আনাতোলা ফ্রাঁস বলেছিলেন, সমালোচক তো কোতল করার মালিক নন যে, কসুর দেখলেই শিল্পীর গর্দান নেবেন। তিনি হবেন "a sensitive soul detailing his adventures among masterpiece".

১ Joseph Justus Scaliger (1540-1609)—উল্লিখিত উক্তিটি ফরাসীদেশের আজেন শহরের অধিবাসী প্রসিদ্ধ ক্লাসিক-সাহিত্যবিশারদ স্কালিজারের।

বিমুগ্ধ আত্মার শিল্পকাননে মানসাভিসারই হল সমালোচনার সারকথা।

তৃতীয় পর্যায়ের সমালোচনা হয়ে উঠল বিচারকের দায়রা বিচার নয়—রসোপভোগ, শিল্পীর সঙ্গে সমালোচকের 'ইষ্টগোষ্ঠী'। সমালোচক গ্রন্থের মধ্যে অবাধ বিহার করে যে মণিমাণিক্য সঞ্চয় করেন, তা উজাড় করে পাঠককে উপহার দেন। তাঁর ব্যক্তিগত কথা, ভাললাগা, মন্দলাগা পাঠকের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। এইজাতীয় সমালোচনায় কোন তত্ত্ব নেই, বিচারকসুলভ দণ্ডদানের প্রশ্ন নেই। সেখানে সমালোচক এক ফরাসী লেখকের মতো বলবেন, "I judge nothing ; I only say what I feel."[২] সমালোচনা থেকে তখন বিষয় ও বিষয়ী—দুই-ই গৌণ হয়ে পড়ে। সমালোচক বিশেষ গ্রন্থ পরিক্রমা করে কী উপলব্ধি করলেন, কোন্ রস ভোগ করলেন—সে কথাটা বলা হলেই তাঁর কাজ শেষ হল। সেখানে সজাগ বুদ্ধির প্রহরী ঘুমিয়ে পড়ে, নীতিবোধের সতর্ক পিঞ্জর খুলে যায়, প্রয়োজনের ঊর্ধ্বশ্বাস তাড়না কখন যে অযাচিত প্রাপ্তির প্রাচুর্যে ভরে ওঠে তা সমালোচক বুঝতেও পারেন না। সমালোচকের শেষ কথা—রসোপভোগ, appreciation। বিচার-বিশ্লেষণ সেখানে লজ্জাতুর গোপনীয়তা অবলম্বন করে; তখন সমালোচনা সৃষ্টিকর্মের মতো আর একটা শিল্প হয়ে ওঠে।

অবশ্য এর বাহুল্যটা পরিহার্য। সমালোচক যদি আলোচনার বস্তুগত ভিত্তি ত্যাগ করে আবেগের জোয়ারে ভেসে যান, তা হলে সমালোচনার নামে তিনি যা সৃষ্টি করবেন, তা হবে তাঁরই মানসসৃষ্ট আরেক বস্তু—যার হয়তো মূল রচনার সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক থাকবে না। সমালোচক কি লেখক-পাঠকের মধ্যে ঘটকালি করেন, না বিচারকের মতো সাহিত্যের দোষগুণ তৌল করেন, অথবা

---

২ J. E. Spingarn রচিত *Creative Criticism*-এ উল্লিখিত।

সস্মিত বন্ধুর মতো শিল্পীর সঙ্গে সহৃদয় সম্পর্ক স্থাপন করেন? বোধ হয় আদর্শ সমালোচনার এই তিনটি লক্ষণই থাকা প্রয়োজন।

পোপ বলেছিলেন :

Both must alike from Heaven derive their light,
These born to judge, as well as those to write.

স্বর্গ থেকে আলো পড়বে যাঁরা শিল্পরসিক এবং যাঁরা স্বয়ং শিল্পী—দুজনেরই ওপর। সমালোচক, শিল্পী ও পাঠকের ত্রিধারার ত্রিবেণী রচনা করতে পারলে সৃষ্টিক্ষম সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের ভাষ্যকার উভয়ের সম্পর্ক হবে আদানপ্রদানের—উত্তমর্ণ-অধমর্ণের নয়।

দুই

॥ সাহিত্যবিচারের বিভিন্ন রীতি ॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "যত মত তত পথ।" ঈশ্বরের মন্দিরে যাবার অসংখ্য পথ—যত মানুষ, তত পথ। প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রবণতা অনুসারে পথ ও পাথেয় বেছে নেয়। কেউ মোক্ষলাভের স্বল্পতম পথ খুঁজে নেয়, কেউ বা প্রেমভক্তির রসে স্নাত হয়ে দীর্ঘ পথ অতিবাহন করে পথের প্রান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করে। হেরাক্লিটাস দুবার একই নদীতে স্নান করতে পারেন নি।[১] পৃথিবীতে একচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট দুটো লোক পাওয়া যায় না। আকারে আয়তনে মানুষ নামক জীবের দেশকালভেদে খুব কিছু একটা পার্থক্য নেই, কিন্তু মানুষের মন অতি বিচিত্র জটিল; এক মনের সঙ্গে অপর মনে বিশেষ ধর্মে অশেষ পার্থক্য, যদিও সামান্য ধর্মে নানা মনের সাদৃশ্যবোধক নিম্নতম মাপকাঠি আবিষ্কার করা দুরূহ নয়।

তত্ত্বের কোন একটা মানবিক রূপ নেই; ব্যক্তিনিরপেক্ষ তত্ত্ববাদ বৈজ্ঞানিক সত্যের মতো। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ তত্ত্বরূপে প্রত্যেক বিশেষজ্ঞের কাছেই সমান মূল্যবাহী। বুদ্ধির সঙ্গে যার যোগ, আবেগের উদ্দাম স্রোত তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

তবু নির্বিকল্প তত্ত্বকে মানুষ বিকল্পাত্মক জগৎ-প্রতীকের সাহায্যে ধরবার চেষ্টা করে; তখন তত্ত্বের নির্বিকল্প রূপ মুছে গিয়ে জেগে

---

১ Heraclitus (536-470 B. C.)—প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক যিনি গতিবাদ (*Panta-rhei*—eternal flux) প্রচার করেন। তাঁর উক্তি: I cannot bathe in the same river twice. তাঁর মতে গতিই একমাত্র সত্য, সবই অস্থির, চলমান। অস্থিরতার অর্থ হল ধ্বংস। দেবতাদেরও এই গতি অর্থাৎ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা নেই। তিনি বিশ্বাস করতেন —সৃষ্টিচক্রের মূল কথা আগুন। আগুনই জলে পরিণত হয়, জল মাটিতে রূপান্তরিত হয়, আবার মাটি থেকে জল, জল থেকে আগুন—এইভাবে সৃষ্টিচক্র নিয়ত আবর্তিত হচ্ছে।

ওঠে দেশকাল ও পাত্রের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন একটা বিশেষ আয়তন। এক-একজনে তত্ত্বকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখে। 'অদ্ভুত-রামায়ণে' বর্ণিত সহস্রস্কন্ধ রাবণের মতো একতত্ত্ব তখন সহস্রমুখা হয়ে ওঠে। স্বয়ংবরসভায় দময়ন্তী প্রেমের দিব্যদৃষ্টির ফলেই নলের আকারধারী ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যমকে ত্যাগ করে আসল নলের গলে বরমাল্য অর্পণ করেছিলেন। আবার অপর দিকে পঞ্চভর্তৃকা পাঞ্চালী পঞ্চপাণ্ডবকে নিয়ে বিশেষ বিড়ম্বনা বোধ করেন নি। সমালোচনা কৃষ্ণার মতো নানা মত ও পথকে স্বীকার করে নেয়, দময়ন্তীর মতো শুধু একটি বিশেষ অভিমতকে মাল্যদান করে না।

সমালোচনার রীতি, প্রকৃতি ও প্রকরণ বহুমুখী; কোন এক যুগে বিশেষ মনীষী, রসিকগোষ্ঠী বা অ্যাকাডেমির প্রচেষ্টার ফলে সাহিত্যবিচারের নানা প্রক্রিয়া জনপ্রিয় হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি সামান্য লক্ষণে সমালোচনার তিনটি বিশেষ রীতি আছে।[২] বর্তমান প্রসঙ্গে সামান্য লক্ষণ ছেড়ে বিশেষ লক্ষণ ধরে সাহিত্য-বিচারের অনেকগুলি মত ও পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। এর মধ্যে কোন্ মতটি সমালোচনার আদর্শ পথ, তা বলা দুষ্কর। যুগভেদে সাহিত্যের জিজ্ঞাসা ও তার উত্তরের প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনশীলতা জীবধর্ম; জীবন থেকে জন্মলাভ করে যে সাহিত্য—তারও ধর্ম। সুতরাং কোন একটি বিশেষ মতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে সংক্ষেপে বিভিন্ন রীতির সাহিত্যবিচার পদ্ধতির পরিচয় নেওয়া যাক।

ব্যক্তিপন্থী সমালোচনা

এই সমালোচনায় সাহিত্যবিচারপদ্ধতিতে সমালোচকের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা প্রধান হয়ে ওঠে। গ্রন্থপাঠের পর সমালোচকের মনে যে সমস্ত অনুভূতির সৃষ্টি হয়, নানা ভাবানুষঙ্গ সঞ্চরণ করে, সেইগুলিকে ব্যক্তিপন্থী সমালোচক বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে

২ মুখবন্ধের 'মূল্যাবধারণের স্বরূপ' দ্রষ্টব্য।

থাকেন। যাকে বলা হয়েছে "the adventure of soul among masterpiece"—মহৎ গ্রন্থের মধ্যে দুঃসাহসিক অভিযান; অর্থাৎ একটি মহৎ গ্রন্থ পাঠ করে সমালোচকের চেতনায় কতকগুলি ব্যক্তিগত অনুভূতি ও চিন্তার উদয় হয়। সেই ব্যক্তিভাবরঞ্জিত অনুভূতিকে রূপ দেওয়া সমালোচকের কর্তব্য অর্থাৎ গ্রন্থপাঠের ফল impression, এবং তাকে প্রকাশ করার কামনা বা expression। গ্রন্থের সাহায্যে সমালোচকের মুগ্ধ মনে জাগে ভাবানুষঙ্গ এবং সেই ভাবানুষঙ্গের আত্মপ্রকাশই হল ব্যক্তিপন্থী সমালোচকের প্রধান কথা। এই ধরনের সমালোচনা কিন্তু আধুনিক কালের সামগ্রী। রোমান্টিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং আধুনিক আত্মচেতনা, ব্যক্তিপন্থী সমালোচকের ব্যক্তিগত উপলব্ধিকেই প্রধান করে তোলে। আবার অন্যদিকে সমালোচক যতই বস্তুগতভাবে সাহিত্যবিচার করুন না কেন, নিজের মন ও হৃদয়কে একেবারে দূরে সরিয়ে রেখে সাহিত্য-বিচার দার্শনিকের দ্বারা সম্ভব হলেও সাহিত্যবিচারকের দ্বারা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং সাহিত্যবিচারে বিচারকের মনোভাবের প্রভাব কিছুটা পড়বেই। কারণ সাহিত্য হল বাঙ্ময়, কিন্তু মানসিক সৃষ্টি। তাই যিনি বিচার করেন, তাঁর মানসিক প্রবণতার কিছু কিছু ছাপ পড়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতা বিশ্লেষণ করে কেউ কেউ দেখেছেন—এর মধ্যে স্বতোবিরোধিতা আছে। কিন্তু ব্যক্তিপন্থী সমালোচক এই কবিতাকে প্রধানতঃ তাঁর ভাল লাগার মারফতেই গ্রহণ করবেন, কল্পনার ভারসাম্য কোথায় বিচ্যুত হয়েছে তার কুলজী রাখার তাঁর অবকাশই হয় না। এই সমালোচনাকে আমরা বৈষ্ণব রসতত্ত্বের পরিভাষা অবলম্বন করে বলতে পারি 'রাগানুগা' আলোচনা, অর্থাৎ যে সমালোচনায় সমালোচকের অনুরাগটাই মুখ্য মাপকাঠি।

অবশ্য এজাতীয় সমালোচনাই কি শ্রেষ্ঠ সমালোচনা? যেখানে সাহিত্যমূল্য নির্ণীত হয় সমালোচকের ব্যক্তিগত প্রবণতার দ্বারা, সেখানে সর্বজনগ্রাহ্য কোন বিচারপদ্ধতি গড়ে তোলাই দুঃসাধ্য।

এই রকম বিচারপদ্ধতিতে বক্তব্য বিষয় গৌণ হয়ে পড়ে, বক্তার স্বগতোক্তিটাই 'সূক্তি'-র স্থান গ্রহণ করে। অবশ্য ব্যক্তিপন্থী সমালোচনা একপ্রকার প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত; নীতিনিয়মের নাগপাশে যখন সাহিত্যবিচারের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে, পুঁথির বচন যখন অমোঘ দৈববাণীর স্থান লাভ করে, তখন তার বিরুদ্ধে দেখা দেয় বিদ্রোহ। অস্কার ওয়াইল্ড্ বলেছেন, "The artist is the creator of beautiful things········The critic is he who can translate into another manner or a new material his impressions of beautiful things." সুতরাং সমালোচকের 'impression'-ই ব্যক্তিপন্থী সমালোচনার মূল কথা।

আপেক্ষিক সমালোচনা

মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এইজাতীয় সমালোচনা আধুনিক কালে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সাহিত্যবিচারের কোন বাঁধাধরা নিয়মতান্ত্রিক মাপকাঠি নেই; একটি কবিতা বিচারের জন্য যে নিয়ম প্রয়োগ করা হবে, ছোটগল্প বিচারে সে নিয়ম প্রায়শঃই খাটবে না। তাই এই সমালোচনা আপেক্ষিক, relativistic। বিভিন্ন সমালোচকের বিচিত্র মনোভাব অনুসারে একগ্রন্থ নানা জনের কাছে নানাভাবে প্রতিভাত হতে পারে। কার মতটা ঠিক, তা কি নিক্তির ওজনে বিচার করা যায়? সাহিত্যবিচারের সবটাই প্রায় এই রকম আপেক্ষিক। তা নইলে একই গ্রন্থ নানা যুগে নানাভাবে পাঠকসমাজে গৃহীত হয় কেন? ড্রাইডেন উনিশ-শতকী নব্য রোমান্টিকতার ধাক্কায় বিস্মরণীর পরপারে নির্বাসিত হয়েছিলেন; এলিয়ট এসে আবার নতুন করে তাঁকে বিচার করলেন, শ্রদ্ধা করলেন। এই যে যুগে যুগে সাহিত্যবিচারের নতুন ব্যাখ্যা, পুরাতন মত ও মন্তব্য প্রত্যাহার করে অন্তদৃষ্টি দিয়ে সাহিত্য মীমাংসার চেষ্টা,—এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে, সাহিত্যবিচারের

কোন চিরজীবী এবং চিরজয়ী আদর্শ নেই।[৩] আধুনিক কালের পাঠকের কাছে যা বিশেষ মূল্যবান মনে হচ্ছে, হয়তো আগামীকাল তার কানাকড়ির মূল্যও থাকবে না। এমন কি, মূল্য সম্বন্ধে মোটামুটি একমত হলেও মূল্য নির্ণয়ের মাপকাঠি দু-যুগে দু-রকম হতে পারে। মিলটনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' এখনও পর্যন্ত মহৎ শিল্প বলে প্রশংসনীয় স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু দু-যুগের সমালোচকের কাছে এই মহাগ্রন্থ দু-ভাবে গৃহীত হয়েছে। অ্যাডিসন অ্যারিস্টট্‌লের *Poetics*-এর সূত্র ধরে এই মহাকাব্য বিচার করে দেখিয়েছিলেন যে, *Poetics*-এ বর্ণিত কাহিনী, চরিত্র, ভাষা ও রস—এই চতুর্বিধ আইনের দ্বারা মিলটনের সৃষ্টিকে প্রশংসা করা যায়। পরবর্তী যুগে ম্যাথু আর্নল্ড্ মিলটনকে ধ্রুপদী ক্লাসিক আদর্শের দ্বারা বিচার না করে দেখালেন যে, মহাকবির সৃষ্টির মধ্যে 'high seriousness of absolute sincerity' আছে বলেই তিনি কালজয়ী হয়েছেন; মিলটন অ্যারিস্টট্‌লকে কতটা অনুসরণ করেছেন, বা করেন নি—সে কথা সম্পূর্ণ অবান্তর; তাঁর কাব্যে জীবনবোধের যে গভীরতা ও আন্তরিকতা আছে, তাই আর্নল্ডের কাছে শ্রদ্ধা পেয়েছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে একই গ্রন্থ যুগভেদে, ব্যক্তিভেদে—এমন কি স্থানভেদে ভিন্ন মূল্য দাবি করতে পারে। সুতরাং সাহিত্যবিচারের আপেক্ষিক মূল্য আছে, চূড়ান্ত মূল্য নেই।

বৈধী সমালোচনা

বৈষ্ণব রসতত্ত্বে যে 'বৈধী ভক্তি'র উল্লেখ আছে, সেই বৈধী শব্দের দ্বারা আর একপ্রকার সমালোচনার অভিধা নির্দিষ্ট হতে পারে। যে ভক্তি পুঁথি-শাস্ত্র-সংহিতায় উল্লিখিত নির্দিষ্ট বিধি বা নিয়মকানুন মেনে নিয়ে থাকে, তাকে 'বৈধী ভক্তি' বলে। অনুরূপ

৩ এ বিষয়ে এলিয়টের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'From time to time, every hundred years or so, it is desirable that some critic shall appear to review the past of our literature, and set the poets and the poems in a new order.'

ভাবে আমরা বলতে পারি, যে সমালোচনায় নিয়মানুগত্য অধিক, অনড় বিধানকে যেখানে চূড়ান্ত (absolute) বলে মনে হয়, সেখানেই সমালোচনা হয় বৈধী—ঠিক যেন ব্যক্তিপন্থী সমালোচনার বিপরীত। এই ধরনের সমালোচনায় পূর্বনির্দিষ্ট কতকগুলি অচল নিয়মের সাহায্য নেওয়া হয় এবং সে নিয়মের কোনক্রমেই ব্যতিক্রম হতে পারে না। বৈধী সমালোচক মনে করেন যে, সমালোচনায় ধ্রুপদী বিধান না মানলে সাহিত্যজগতে অরাজকতা শুরু হয়ে যাবে। দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যবিচারকগণ শিল্পদৃষ্টি এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টির বলে সাহিত্যের মূল্যাবধারণ সম্পর্কে যে সমস্ত 'অনুজ্ঞা' নির্মাণ করেছেন, ইহুদী পুরাণের 'দশ অনুজ্ঞা'র মতো তা অলঙ্ঘনীয়। ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর য়ুরোপের অ্যারিস্টট্‌লপন্থী ধ্রুপদী সমালোচকেরা মনে করতেন যে, পুরাতনী সমালোচনার আদর্শই হল সাহিত্যবিচার ও আদর্শের একমাত্র অবলম্বন। যেমন বেন জনসন একনিষ্ঠ ভক্তের মতো মনে করতেন যে, সাহিত্যসৃষ্টি ও শিল্পবিচারে অ্যারিস্টট্‌লকে ছাড়িয়ে যাওয়া আর আত্মহত্যা একই প্রকার। বেন জনসনের মতো অনেক সমালোচক সাহিত্যবিচারে পুরাতন পন্থার পুনরাবৃত্তি দেখতে চান। আমাদের দেশে এখনও কেউ কেউ অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারী ভাবের দ্বারা আধুনিক সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করতে চান।

অবশ্য এমন অনেক সমালোচক আছেন যাঁরা পুরাতন সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও তাকে বুদ্ধিবিচারের দ্বারা পরখ করে নিতে পরাঙ্মুখ হন না। প্রসিদ্ধ জার্মান ক্লাসিসিস্ট্ উইঙ্কল্‌ম্যান[৪]

---

৪ Johann Joachim Winckelmann (1717-68)—ইনি বাল্যবয়সেই গ্রীক সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন ; গ্রীক শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্বের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অসাধারণ, ইতালির প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি গ্রীক সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে যে মৌলিক গবেষণা করেছিলেন তা অনেক খণ্ডে প্রকাশিত হবার পর ক্লাসিক সাহিত্য ও শিল্পের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি খুলে যায়। তাঁর ছোট বইখানিতে (*Gedanken*) তাঁর মৌলিক গবেষণা সংক্ষেপে সুন্দর করে বলা হয়েছে। তিনি জার্মানিতে গ্রীক সাহিত্য পঠন-পাঠনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন—যার ফলে ওদেশে ক্লাসিক সাহিত্য অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি গ্রীক সাহিত্যের প্রচারক হলেও তার প্রতি তাঁর অন্ধ ভক্তি ছিল না।

গ্রীক ক্লাসিক পন্থার প্রতি বিশ্বাস রেখেও বুদ্ধি দিয়েই সব কিছু বিচার করেছেন, পুঁথির প্রতাপ সর্বদা স্বীকার করেন নি।

মুখের সঙ্গে মুখোশের পার্থক্য কোথায়? মুখে আছে অনন্ত বৈচিত্র্য; অন্তরের নানা ভাব মুখের রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে, মুখোশের কোন বৈচিত্র্য, চাঞ্চল্য বা পরিবর্তন নেই, ভাষা নেই অপলক চোখে। সাহিত্যসমালোচনা নীতিনিয়মের বড় বেশি দাসত্ব করলে মুখোশের মতো তার কোন প্রাণের লক্ষণ থাকে না; একটা অপরিবর্তনীয় মরণফাঁস সমালোচনার শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলে। কাব্যের অলঙ্কার নিয়ে যখন ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা অত্যন্ত মাতামাতি করছিলেন, তখন ধ্বনিবাদীরা এসে সাহিত্যজিজ্ঞাসাকে ব্যঞ্জনার সাহায্যে নতুন পথে নিয়ে চললেন। এমনি করে যুগে যুগে সাহিত্যবিচারে নিয়মের পাঁচিল ডিঙিয়ে অনিয়ম প্রবেশ করেছে।

অবশ্য অনিয়ম বলতে অনিয়ন্ত্রণ নয়। সাহিত্যবিচারের জন্য কতকগুলি সূত্র নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু যুগভেদে সে নিয়মের পরিবর্তন হয়। এই সত্যটি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে সমালোচকের পুঁথিগত বিদ্যাই একমাত্র অবলম্বন হয়ে পড়ে এবং “তাহারা সারস্বত প্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জনগর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে— অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই।……তাহারা পোষাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের নাই।” রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য কিছু তীব্র হলেও অযথার্থ নয়।

ভাষ্যমূলক সমালোচনা

বাইরের দিক থেকে অর্জিত নিয়মকানুনের সাহায্যে সাহিত্য-বিচার হতে পারে, আবার সমালোচকের নিজস্ব প্রবণতা, তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সমালোচনায় প্রধান স্থান অধিকার

করতে পারে। এর দু পন্থাতেই শিল্পসৃষ্টি বড় নয়, একটিতে নিয়মের আনুগত্য, আর একটিতে সমালোচকের ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য—মূল গ্রন্থের গুণাগুণ-বিচার গৌণ। কিন্তু ভাষ্যমূলক সমালোচনা অন্যপ্রকার। এই বিচারপদ্ধতিতে বিচার্য গ্রন্থই সমালোচকের পন্থা নির্দেশ করে। রসপ্রমাতা বাইরের কোন নীতিনিয়ম দিয়ে সাহিত্যবিচার করেন না, বা তাঁর নিজস্ব ভালমন্দবোধকেই সাহিত্যবিচারের একমাত্র মানদণ্ড বলে মনে করেন না। হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে যেমন 'হ্যামলেট' নাটকের আলোচনা হতে পারে না, তেমনি বিচার্য গ্রন্থকে বাদ দিয়ে অন্য কোন নীতি-নিয়মের দ্বারা সে বিচার সুচারুভাবে সমাধা হতে পারে না। সমালোচনা এখানে হবে ব্যাখ্যা, ভাষ্য, বিশ্লেষণ। সমালোচককে এরূপ স্থলে অনেক সময় টীকাকারের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। "He is the interpreter to less appreciative readers."[৫] রসভোগে যাঁদের কিছু ন্যূনতা আছে, তাঁদের কাছে শিল্পীর শিল্পকর্মের ব্যাখ্যা করাই হল ভাষ্যমূলক সমালোচনার প্রধান কর্তব্য। সংস্কৃত সাহিত্যের মল্লিনাথের দল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পন্থা ধরেছেন।

ভাষ্যমূলক সমালোচনায় বিষয়টাই প্রধান; সমালোচকের কাজ—শুধু ব্যাখ্যার প্রদীপ জ্বেলে সাহিত্যশিল্পের আরতি করা। তখন তিনি সাহিত্য বা গ্রন্থকারের সামনে দণ্ডপাণি নন, যুক্তপাণি। লেখকের রচনাকর্মের মধ্যে প্রবেশ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করা এবং কাব্যজিজ্ঞাসুকে সাহিত্যতাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়া এইজাতীয় সমালোচনার প্রধান কাজ। এই সম্পর্কে ম্যাথু আর্নল্ডের মতটি আলোকবর্তিকার কাজ করবে: "Its business is, as I have said, simply to know the best that is known and thought in the world, and by in its turn making this known to create a current of true and just ideas."

৫ H. J. C. Grierson—*Criticism and Creation*

এইজাতীয় সমালোচনা কোন কোন দিক দিয়ে অতিশয় নিরাপদ; সমালোচকের ব্যক্তিগত ভাবনা-কামনা বক্তব্য-বিষয়কে অস্বচ্ছ করে দেয় না, অথবা সমালোচনা রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের নীতিবাক্যে পর্যবসিত হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসে যা ক্লাসিক বলে গণ্য হয়েছে, তার সঙ্গে সমালোচকের একটা নিঃস্পৃহতার যোগাযোগ থাকে। যাকে সমালোচক "disinterested endeavour" (Arnold) বলেছেন, সেই নিরাসক্ত ভাবদৃষ্টি ভাষ্যমূলক সমালোচনার পাথেয়। বৃহৎ শিল্পকর্মের সামনে দাঁড়িয়ে সমালোচক মুগ্ধ-বিস্ময়ে তার বিরাট স্বরূপ বুঝবার চেষ্টা করেন, তার কলাকৃতি ও বক্তব্যবিষয়ের বিচিত্র ঐশ্বর্য ব্যাখ্যা করে ধন্য হন, পাঠকের সঙ্গে মহৎ সাহিত্যের পরিচয় করিয়ে দিয়ে পবিত্র কর্তব্য সমাধা হল বলে মনে করেন।

এই শ্রেণীর সাহিত্যবিশ্লেষণের একটা দুর্বলতা আছে; এতে ভক্তিভাবমুগ্ধতা অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে—যার ফলে সমালোচক ও পাঠক উভয়ের বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলতে পারে। সাহিত্যসমালোচনা সর্বোপরি মানবমনের রসোপলব্ধি—"The merit of a work of art is judged by one single standard—the appreciation of mankind."[৬] কিন্তু এই 'appreciation' বা রসভোগ যদি বুদ্ধির দ্বারা বিচার্য না হয়ে প্রশংসার বিল্বদলে অভিষিক্ত হয়, তা হলে সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য, শিল্পকৃতির মূল্যাবধারণ—তার বিশেষ খর্বতা ঘটবে।

যুক্তিপন্থী সমালোচনা

যুক্তিপন্থী সমালোচনাকে আমরা আরোহী পন্থা বা Inductive process বলতে পারি। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, বৈধী সমালোচনায় নীতিনিয়মের বাড়াবাড়ি; পূর্বকল্পিত আইনের দ্বারা সাহিত্যবিচারের চেষ্টা এই রীতির মূলকথা। বলা বাহুল্য, এই

৬ W. Basil Worsfold—*Principles of Criticism*

বৈধী সমালোচনা আধুনিক কালে গ্রহণযোগ্য হবে না। সাহিত্যের যদি কোন অর্থ ও তাৎপর্য থাকে তবে তাকে সাহিত্যের মধ্যেই খুঁজতে হবে, বিচারকের কৃত্রিম ন্যায়নীতির আদর্শ দিয়ে সাহিত্য-বিচার সম্ভব নয়।

অধুনা এর প্রতিযুক্তি হিসাবে যুক্তিপন্থী সমালোচনা বা Inductive criticism-এর উদ্ভব হয়েছে। Inductive process বা আরোহী পন্থা হল বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, দৃষ্টান্ত থেকে তত্ত্বে, পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সিঁড়ি বিশেষ। একটি দুটি তিনটি করে পরীক্ষা করে দেখলাম, সব মানুষই মরণশীল। অতএব সিদ্ধান্তে আসা গেল: সব মানুষই মরণশীল। তেমনি যে সমালোচনা এই 'আরোহী' যুক্তিবাদ অনুসরণ করে, তাকে আমরা উপস্থিত ক্ষেত্রে যুক্তিপন্থী সমালোচনা (Inductive criticism) বলতে পারি। অর্থাৎ বাইরের কোন নীতিনিয়ম তৈরি না করে নানা গ্রন্থ পাঠ করে সেখান থেকেই সাহিত্যবিচারপদ্ধতি উদ্ভাবন করা যুক্তিপন্থী সমালোচনার মূল লক্ষ্য। শেক্সপীয়র বিচারে অ্যারিস্টটল বা গ্রীক নাট্যকারদের রীতিনীতি অবলম্বন না করে শেক্সপীয়রের নাটক থেকেই তার স্বরূপ নির্ধারণ করা কর্তব্য। এটাই হল সাহিত্যবিচারের আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতি। বিজ্ঞান কোন মনগড়া থিয়োরি খাড়া করে না, বরং বহু বিশেষের পরীক্ষানিরীক্ষার পর তা থেকে নির্বিশেষ তত্ত্ববাদ আবিষ্কার করে। নিউটন একটি দুটি তিনটি আপেল পড়তে দেখে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব পূর্ব থেকে তাঁর মধ্যে আরোপিত হয় নি; তেমনি যুক্তিপন্থী সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক রীতির সাহায্যে সমালোচক নানা গ্রন্থ পরীক্ষা করে তবে একটা বিচারপদ্ধতি গড়ে তোলেন। আধুনিক যুক্তিবাদের যুগে এই রীতিটি যে বিশেষ জনপ্রিয় হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? অবশ্য ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরাও মাঝে মাঝে এই পন্থা নিতেন। ধ্বনিবাদীরা যখন প্রচার করলেন যে, বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনাই কাব্যের আত্মা,

তখন সেদিনের বৈধী সমালোচকের দল নানা আপত্তি তুলেছিলেন; তাঁরা বলেছিলেন, ব্যঞ্জনা আবার কি? ও হল শব্দার্থ ও অলঙ্কার— কাব্যশরীরের অঙ্গীভূত। কিন্তু ধ্বনিবাদীরা দেখিয়েছিলেন যে, তাঁদের অভিনব মত (ধ্বনিতত্ত্ব) বাইরে থেকে আরোপিত একটা কৃত্রিম কৌশল নয়, শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় এই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা বহু স্থলেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই সমস্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে ধ্বনিবাদীরা ব্যঞ্জনাতত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হন, সেই তত্ত্বের মধ্যে দুর্নীতি ও সুনীতি, প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন, উপকার বা অপকার —কী আছে, তা জানবার জন্য ব্যস্ত হন না। আণবিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেই তাঁর কাজ শেষ হল। তার দ্বারা যদি পাহাড় না ভেঙে মানুষের মাথা ভাঙা হয়, তবে তার দায় বৈজ্ঞানিকের নয়। বৈজ্ঞানিক বৈদান্তিকের মতো সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। যুক্তিপন্থী সমালোচনা কতকটা এই জাতের। গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নির্দেশই তার লক্ষ্য; তার নৈতিক মূল্যমান কি রকম, কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাকে লাগানো যায় কি না সে সমস্যা সমালোচকের নয়। তাঁর কাছে 'সল' এবং 'পল',[৭] চণ্ডাশোক ও ধর্মাশোক—সকলের এক দর; গ্যয়ঠের *Venezianische Epigramme*[৮] ও *Faust*-কেও তিনি একই দৃষ্টিপাতের দ্বারা বিচার করেন। সাহিত্যের চেয়ে বিজ্ঞানের দিকেই সমালোচনার অধিকতর পক্ষপাত। ভাললাগা মন্দলাগা, নীতি দুর্নীতি, সুন্দর অসুন্দর—যুক্তিপন্থী সমালোচনায় এদের মূল্যান্তর নেই। এই শ্রেণীর সমালোচনায় বিজ্ঞানের নিঃস্পৃহতাটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গ্রন্থের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য (qualities) আছে, তার যৌক্তিক উপস্থাপনার পর এই

৭। ভক্ত সেণ্ট পল। ইনি ইহুদি বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর হিব্রু নাম হল সল (Saul)। গ্রীক রোমানে তার রূপান্তর হয় 'পল' (Paul)। খ্রীষ্টান মতের প্রতি এঁর প্রথম দিকে অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। পরে তিনি নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টভক্ত হন এবং পল নামে সর্বত্র বিখ্যাত হন। ইনি আনুমানিক ৬৭ খ্রীঃ অব্দে রোমে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন।

৮। এটি গ্যয়ঠের একখানি অশ্লীল গ্রন্থ।

সমালোচনার আর কোন কাজ নেই। বিজ্ঞানের আর পাঁচটা শাখার মতো সাহিত্যকেও এই বিচারপদ্ধতি বিজ্ঞানের এক্তিয়ারের মধ্যে এনে ফেলে। যেমন জীববিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, সমাজনীতি —তেমনি সাহিত্যসমালোচনাও নিছক Inductive argument বা আরোহী যুক্তিক্রম অনুসরণ করে।

তুলনামূলক সমালোচনা

তুলনামূলক সমালোচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিচারপদ্ধতি। 'চার অধ্যায়ে'র এলা চসার ও মঙ্গলকাব্যের তুলনামূলক গবেষণা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েও সর্বনাশা ঝড়ো হাওয়ার মুখে ভেসে গেল। তার মনে অতীনের ঝড় না উঠলে সে হয়তো এই দুই বিপরীত ধরনের সাহিত্যের মধ্যে খানিকটা আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারত। সে যাই হোক, এক দেশের সাহিত্যের সঙ্গে অপর দেশের অনুরূপ সাহিত্যের তুলনা দিয়ে সাহিত্যসমালোচনা আধুনিক কালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। আজ দেশ ও কালের সীমা সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে, এক দেশের অঙ্গনে অন্য দেশের সাহিত্য ভিড় করছে, সুতরাং একের দ্বারা অন্যে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। কিন্তু প্রাচীন যুগে দেশ-কালের সীমা যখন দুর্লঙ্ঘ্য ছিল, তখন একদেশের সঙ্গে অন্যদেশের সাহিত্যের বিকিকিনি হয়তো চলত না, সুতরাং প্রভাবের কথা উঠতেই পারে না। কিন্তু মানবচিত্ত মোটামুটি এক রকম; ভূগোলের ব্যবধান সত্ত্বেও বিভিন্ন মানুষের মানসিক সাদৃশ্য আবিষ্কার এমন কোন দুরূহ ব্যাপার নয়। এলা চসার ও মঙ্গলকাব্যের ওপর থীসিস লিখতে চেয়েছিল। অবশ্য নিশ্চিন্ত হয়ে লিখতে পারলে সে একটা পরিপুষ্ট 'ডক্টরেট' ডিগ্রী পেয়ে যেত নিশ্চয়। কিন্তু সে একটু চেষ্টা করলেই দেখতে পেত, মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে চসারের ততটা সাদৃশ্য নেই, যতটা আছে 'Edda', 'Saga' ও 'Scald'-এর।[৯]

৯। Edda—আইসল্যাণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় ১২শ শতকের আগে থেকেই লোকমুখে এক রকম বীরত্বব্যঞ্জক গল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল। ১৭শ শতাব্দীর দিকে আইসল্যাণ্ডের গবেষকগণ ওই Edda-গুলিকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন।

আরব্য উপন্যাস ও পঞ্চতন্ত্র, *Decameron*[১০] ও দশকুমারচরিত, চৈনিক গীতিকবি লি পো এবং ইতালীর মহিলাকবি সাফো, গ্রীক নাটক ও ও সংস্কৃত নাটক, ইংরেজী Miracle-Morality play ও বাঙলার যাত্রাভিনয়, বাল্মীকি-ব্যাস ও হোমর-ভার্জিল, *Poetics* ও 'নাট্যশাস্ত্র', শেক্সপীয়রের ফলস্টাফ এবং শূদ্রকের শকার—এদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করে একটির সাহায্যে অপরটিকে বোঝা যায়, এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের চরিত্রগত সাদৃশ্য বা বৈপরীত্যও লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তুলনার জন্য উভয়ের মধ্যে সামান্যধর্মের ঐক্য চাই, বিশেষ ধর্মের নাই বা মিল হল। গোত্র-বিচারে বা বিষয়বস্তুতে যাদের মধ্যে মোটামুটি ঐক্য নেই, তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা চলতে পারে না।

সমালোচকের প্রবণতা অনুসারে দুই দেশের গ্রন্থের মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপিত হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলা, মিরান্দা ও ডেসডিমনার মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আবিষ্কার করেছিলেন। আবার রবীন্দ্রনাথ ঐ চরিত্র নিয়ে আলোচনা করলেও ঠিক বঙ্কিম-চন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর হুবহু অনুসরণ করেন নি—নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। অ্যাডিসন *Spectator*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে মিলটনকে নব্যক্লাসিকতার পক্ষ থেকে বিচার ও প্রশংসা করেছিলেন ; অপর দিকে বায়রন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীট্‌স ও শেলী মিলটনের মধ্যে

Saga—৯ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নরওয়ে থেকে কিছু অভিজাত ও বীরপুরুষ রাজনৈতিক কারণে আইসল্যাণ্ডের শীতার্ত অঞ্চলে বসবাস করেন। তাঁদের মধ্যে গদ্যে ইতিহাসের ছায়াতলে মহাকাব্যের কাহিনী রচিত হয়। এগুলি মুখে মুখেই চলত। ১০ম-১১শ শতাব্দীতে আইসল্যাণ্ডে খ্রীষ্টধর্মের অনুপ্রবেশের পর এই Saga কাহিনীগুলি লেখার মধ্যে স্থান পায়।

Scald—আইসল্যাণ্ড থেকে নরওয়ের রাজসভাতে কিছু কিছু কবি গিয়েছিলেন। তাঁরা রাজা-মহারাজা আর সেনাপতিদের বীরত্বকাহিনী অবলম্বন করে এই Scald কাব্য রচনা করেন। ৯ম শতাব্দীতে এই কাব্যের প্রচলন ছিল, অবশ্য মৌখিক আকারে। ১২শ-১৩শ শতকে Scald কাব্য মৌখিক রূপ ত্যাগ করে লেখার আশ্রয় গ্রহণ করে।

১০ ইতালীয় কবি ও গল্পলেখক বোকাচিও (Giovanni Boccaccio—1313-75 A. D.) *Decameron* গ্রন্থে একশটি গল্প লিখেছিলেন। এতে বাস্তবধর্মিতা, হাস্যপরিহাস, সমাজচিত্র ও অশ্লীল বর্ণনা আছে। তিনি নব্য রেনেসাঁসের অন্যতম উদ্‌গাতা। তাঁর এই গ্রন্থটি পরবর্তিকালে সমগ্র য়ুরোপে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

রোমান্টিকতা দেখতে পেয়ে তাঁর জয়ধ্বনি করেছেন।[১১] কোলরীজ যেভাবে শেক্সপীয়রের বিচার করেছেন, উইসন নাইট সেই পথ বর্জন করেছেন। রডারিক বেনেডিক্স নামক একজন স্থূলবুদ্ধি জার্মান সমালোচক শেক্সপীয়রকে বরদাস্ত করতে পারেন নি, 'Shakespeare-mania'-র বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। বস্তুতন্ত্রবাদী এঙ্গেলস ১৮৭৩ সালে কার্ল্ মার্কস্‌কে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে শেক্সপীয়রের প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন এবং রডারিক বেনেডিক্সকে বিদ্রূপ করেছিলেন।[১২] যাই হোক, তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা নানাদেশের সাহিত্য ও রচনাকারের অপরিচয়ের ব্যবধান ঘোচানো যায়, তাতে সন্দেহ নেই। মানসিক সঙ্কীর্ণতা দূর করবার জন্য আধুনিক কালে তুলনামূলক সমালোচনার প্রভাব বর্ধিত হচ্ছে। এর ফলে একদেশের পাঠক অন্যদেশের ভাষা শিখতে প্রলুব্ধ হবে, অপরের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব হ্রাস পাবে। তাই আজকাল তুলনামূলক সাহিত্যপাঠ ও মূল্যবিচার মার্জিত রুচির লক্ষণ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে।

ঐতিহাসিক সমালোচনা

ঐতিহাসিক সমালোচনায় সমালোচকের দৃষ্টি প্রধানতঃ ইতিহাস ও পটভূমিকার প্রতি নিবদ্ধ থাকে। সাহিত্যবিচার করতে গেলে সর্বপ্রথম তার ভূমিবিচার প্রয়োজন। ইতিহাস, সমাজ ও জীবনধারার প্রভাবে সাহিত্যের বিষয়বস্তু, রূপ ও রীতির পরিবর্তন হয়। এগুলিকে এক কথায় ইতিহাস বলে নির্দেশ করা যায়। দেশ ও কালের মধ্যে ঘটনার আবর্তন ইতিহাস নামে পরিচিত। সুতরাং ইতিহাস বলতে দেশের কথা ও কালের কথা—উভয়কেই বোঝায়। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী সমালোচক এডল্‌ফ টেইন ফরাসী ভাষায় *Histoire de la litterature anglaise* নামক ইংরেজী

১১। দ্রষ্টব্য: *Theory of Literature*—Wellek & Warren

১২। *Literature and Art*—Marx and Engels. (Current Book House, Bombay)

সাহিত্যের যে ইতিহাস (পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ) রচনা করেন, তাতেই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক সমালোচনার প্রতি আনুগত্য দেখা যায়। টেইন ইংরাজ জাতির ইতিহাস ও সমাজের মধ্যেই ইংরাজী সাহিত্যের উৎপত্তিরহস্য খুঁজেছেন। এই মতে ইতিহাস, সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও জীবনযাপনপ্রণালী সাহিত্যের গতিপথ নির্দেশ করে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের সংঘর্ষমুখর প্রত্যক্ষ জীবনবাদ, তিমিরাভিসারী স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রহস্যভারাতুর ব্যঞ্জনা, প্রাচ্যসাহিত্যের 'বিলাস-কলাকুতূহলা', গ্রীক ট্র্যাজেডির সান্ত্বনাহীন ক্ষোভ—এ সমস্তের পশ্চাৎপটে একটা বিশেষ দেশ ও কালের প্রভাব রয়েছে।

ঐতিহাসিক সমালোচকের অবলম্বিত রীতি নানাদিক দিয়ে মূল্যবান। সাহিত্যবিচারে ও সাহিত্যের উৎপত্তিরহস্য-বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাহিত্য চিত্তলোকের ব্যাপার হলেও তার একটা অবস্থানভূমি তো আছেই। সেই অবস্থানভূমি হল ইতিহাস ও সমাজ। অগাস্টাস যুগের রোমক সাহিত্য, এলিজাবেথীয় যুগের ইংরাজী সাহিত্য, গুপ্তযুগের সংস্কৃত সাহিত্য, চৈতন্যযুগের বাঙলা সাহিত্য—এর অন্তরালে আছে তৎকালীন দেশ ও সমাজের বিশেষ প্রভাব।

আধুনিক কালের দ্বান্দ্বিক বস্তুদর্শনের (Dialectic Materialism) সাহায্যে শিল্পকর্মের মূল্যবিচারের চেষ্টা চলেছে। এই মতে দেখা যাচ্ছে, সাহিত্য একটা বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে সৃষ্ট ; সে সামাজিক প্রয়োজন হল মানুষের অবিরত শ্রেণীসংগ্রাম। সাহিত্য এই শ্রেণীসংগ্রামেরই আত্মপ্রকাশ ও হাতিয়ার। তাই সাহিত্য ও শিল্পকলার মূলে আছে এক প্রকার বাস্তব প্রয়োজন-বোধের তাড়না।

এই সমস্ত মত ও মন্তব্যের পিছনে কিছু কিছু সত্য নিশ্চয় আছে। কিন্তু ইতিহাস ও বস্তুবাদী দর্শনকে একমাত্র নিদান হিসাবে গ্রহণ করলে সাহিত্যবিচারে একদেশদর্শিতা দেখা দিতে পারে। ইতিহাস সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করে নিশ্চয় ; কিন্তু

সাহিত্য সর্বোপরি একক মানসের বাঙ্ময় নির্মিতি, যে মানস ইচ্ছা করলে চারিদিকের পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। অনেক গীতিকবি 'সমাজ সংসার মিছে সব' বলে আপনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন। সুতরাং ইতিহাস সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সাহিত্য স্বচ্ছন্দে ইতিহাসের কালিক প্রভাব এড়াতে পারে। আর তা ছাড়া সমস্ত ঐতিহাসিক কালক্রম ও ঘটনাপঞ্জী সর্বদা সাহিত্যের দিকনির্দেশক নাও হতে পারে। ঐতিহাসিক কালপর্যায়ে বিধৃত ঘটনার মধ্যে যেগুলি মানবমনে বিস্ময়রস সঞ্চার করে, সেগুলিই শুধু শিল্পসৃষ্টিতে সার্থক হয়। অবশ্য ইতিহাসের কোন্ অংশটুকু সাহিত্যের পঙক্তিভোজে আহূত হবে, আর কোন্‌টি হরিজনের মতো বাইরে অনাদরে পড়ে থাকবে, তা বলা মুশকিল। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, ঐতিহাসিক সমালোচনার দ্বারা সাহিত্যের বস্তুগত ভিত্তি চিনে নেওয়া সহজ—যদিও এতে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দুরকম ত্রুটি ঘটাই সম্ভব।

এ ছাড়াও সমালোচনার আরও নানা প্রকরণ থাকতে পারে। যেমন জীবনীমূলক সমালোচনা। লেখকজীবনীর মধ্যে শিল্পের উৎপত্তিরহস্য অনুসন্ধান এই মতের প্রধান লক্ষণ। ঐতিহাসিক সমালোচনায় যেমন সাহিত্যের বহির্ভূত ঐতিহাসিক পরিবেশের মধ্যে সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান করা হয়, সেই রকম জীবনীমূলক সমালোচনায় লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই তাঁর সারস্বত জীবনের উৎস সন্ধান করা হয়। গ্যয়ঠে ও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই তাঁদের শিল্পকৃতির জন্মরহস্য নিহিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আস্তিক্যবাদী জীবনের দিব্যবাণী বর্তমান এবং মহাকবি গ্যয়ঠের প্রাকৃতজীবনবিলাসী নর্মলীলার উচ্চাবচতা তাঁর সাহিত্যেও আরেক প্রকার প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে এ বিষয়ে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। লেখকের দুটি জীবন থাকে ; একটি তার

প্রয়োজনের দৈনন্দিন জীবন, আর একটি তার শিল্পজীবন। অবশ্য এ দুটি জীবন পরস্পর পৃথক্ নয়। সাহিত্যে শিল্পীর মর্ত্যজীবন বা ভাবজীবন—উভয়েই প্রভাব বিস্তার করতে পারে বা কোন একটি প্রধান হতে পারে। অবশ্য সাহিত্যের জন্মলগ্ন শিল্পীর মধ্যে ঘনায়িত হলেও তার চার পাশের আলোবাতাস পরিবেশ সদ্য-জাত সাহিত্যকে বর্ধিত করে। সুতরাং কেবলমাত্র কবিজীবনী হতে কবিতার যথার্থ স্বরূপ সদাসর্বদা লাভ করা যায় না।

এ ছাড়া আরও নানা প্রকার সমালোচনা হতে পারে। যেমন ধরা যাক ভাষাতাত্ত্বিক সমালোচনা। এখানে সমালোচক প্রধানতঃ বৈয়াকরণ ও ভাষাতাত্ত্বিক। চসারের ইংরেজী, বড়ু চণ্ডীদাসের বাঙলা, বিদ্যাপতির মৈথিলী এবং তুলসীদাসের পূরবীয়া হিন্দীর ভাষাগত আলোচনা ঘিরে সাহিত্যবিচার হতে পারে। তবে এই জাতীয় আলোচনায় ভাষাতত্ত্বই প্রধান বিচার্য বিষয়, সাহিত্যের স্থান গৌণ; এবং এই ধরনের সমালোচনাকে যথার্থ সাহিত্যবিচার বলা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ এখানে বিষয় বা বিষয়ী কেউ প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়, প্রধান বক্তব্য হল শব্দতত্ত্ব, বাঙ্-নির্মিতির কঙ্কালতত্ত্ব। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের অনেক আলোচনাই শুধু শব্দের ব্যায়াম, অলঙ্কারকৌশল ব্যাখ্যানের বৈয়াকরণ আনন্দ। সাধারণতঃ প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনায় এই রীতি অনুসৃত হয়। অ্যাংলো-স্যাকশন সাহিত্য, প্রাচীন প্রোভেন্সাল ভাষায় লেখা 'ত্রুবেদুর'দের কবিতা, বাঙলা চর্যাগীতিকা প্রভৃতির ভাষাতত্ত্বগত আলোচনা মূল্যবান হতে পারে এবং সাহিত্যের ইতিহাস নির্ণয়ে সে আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তবে একে ঠিক সমালোচনা বা সাহিত্যবিচার বলা যায় না; যাতে রসবিচার নেই, গুণকলা বিশ্লেষণ নেই, তাকে সাহিত্যবিচারের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যায় কি? ভাষাতাত্ত্বিক বিচারও মূল সাহিত্য-সমালোচনাকে নানা দিক থেকে সাহায্য করে—এ কথা স্বীকার

করেও বলা যায় যে, লাশকাটা ঘরে শারীর বিশ্লেষণ আর স্টুডিয়োর মধ্যে শিল্পনির্মাণ এক ব্যাপার নয়।

এখানে আমরা সাহিত্যবিচারের বিভিন্ন প্রকরণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। সমালোচকের রীতিপ্রকৃতি, প্রবণতা ও শিক্ষাদীক্ষা অনুসারে সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি সম্পূর্ণ ভিন্নতর হতে পারে। যত সমালোচক—তত সমালোচনার পদ্ধতি। তবু সমালোচনার জনারণ্যে পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা আলোচনা করে দেখা গেল। অবশ্য এ ধরনের আলোচনায় *a posteriori* রীতি অনুসৃত হতে বাধ্য। পূর্ব থেকে কতকগুলি রীতি উদ্ভাবন না করে বরং যে সমস্ত সমালোচনা পাওয়া যায় তাকে অবলম্বন করেই কার্য থেকে কারণে যাবার চেষ্টা করা গেল। কারণ সাহিত্যে *a priori* রীতি অর্থাৎ কারণ থেকে কার্য নির্ণয় বড় একটা চলে না—সাহিত্য তো বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়। সাহিত্য সৃষ্টির পরে সাহিত্য আলোচনা। অ্যারিস্টট্ল তদানীন্তন গ্রীক গ্রন্থ পড়ে পড়ে সাহিত্যতত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, মন থেকে তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন নি। তিনি এখন জীবিত থাকলে তাঁর *Poetics*-এর খোলনলচে হয়তো বিলকুল বদলে ফেলতেন।

তিন

॥ সমালোচকের শ্রেণীভেদ ॥

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা সমালোচনার বিভিন্ন রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সমালোচকের মানসিক প্রবণতা অনুসারে একজন সাহিত্যবিচারকের সঙ্গে অপর জনের রীতিমত পার্থক্য হতে পারে। দুষ্মন্তের বিদূষক পিণ্ড খর্জুরের মিষ্টরসে কোন কোন সময় বীতরাগ হয়ে অম্লাক্ত তিন্তিড়ীরসের দ্বারা জিহ্বার অসাড়ত্ব ঘোচাতে চাইতেন। সাহিত্যরসের পঙ্‌ক্তিভোজে কটু-তিক্ত-কষায়-লবণ-অম্ল-মধুর—ষড়্‌রসেরই আয়োজন। সেই বিভিন্ন আস্বাদন বিভিন্ন মানুষের কাছে যেমন পৃথক স্বাদ পরিবেশন করে, ঠিক তেমনি যাঁরা সেই রসের ভাঁড়ারী, সাহিত্যের জহুরী, তাঁদের মাপকাঠির পরিমাপ এক নয়; একা কৃষ্ণের ষোলশ গোপিনী, এক সাহিত্যের বিভিন্ন ধরনের সমালোচক। সাহিত্য মূলতঃ মানসিক সৃষ্টি, মানুষের মুখের পার্থক্যের চেয়ে মনের পার্থক্য অনেক বেশি। কাজেই সাহিত্যবিচার ও রসোপভোগে মতপার্থক্য দেখা দেবেই। রবীন্দ্রনাথের ‘শ্রেষ্ঠদান’ কবিতায় ভিখারিনীটি তার শেষ সম্বল পরিধানের একখণ্ড বস্ত্র অনাথপিণ্ডদকে দান করেছিল। বাঙলাদেশের কোন এক সাধুচরিত্রের মনীষী ব্যক্তি এতে বড়ই লজ্জা বোধ করেছিলেন কবিতাটির অন্তর্নিহিত অশ্লীলতার জন্য। একমাত্র সম্বল কাপড়খানা দান করে ভিখারিনী প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে বেরুবে কি করে?

যিনি টলস্টয় পড়ে তৃপ্ত হবেন, তিনি হয়তো জোলা-মোপাসাঁ পড়ে ভ্রূকুঞ্চিত করবেন। শোনা যায় হুগোর *Hunchback of Notredame* পড়ে নাকি গ্যয়ঠে বলেছিলেন, “most abominable

book in the world" সুতরাং মানসিক প্রবণতা অনুসারে সাহিত্যবিচারের মূল্যমানেরও পরিবর্তন হতে পারে। প্রায় প্রত্যেক সমালোচকের বিচাররীতি তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি, রুচি, শিক্ষা দিয়ে গড়া; এই বুদ্ধিরুচি প্রভৃতি সব সময়ে আপেক্ষিক, পরিবর্তনধর্মী ও ব্যক্তিগত। এই সমস্ত স্মরণ রেখে সমালোচকের কত রকম চিত্তপ্রবণতা হতে পারে, তাঁদের অবলম্বিত বিচারপদ্ধতিও কত বিচিত্র হয়, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক।

ভাববাদী ও নীতিবাদী সমালোচক

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই মনে বিশেষ ধরনের ভাব বা idea আছে; এই ভাব পূর্ব থেকে চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট, অথবা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান থেকে প্রত্যয়রূপে আবির্ভূত, তা নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষ মতান্তর আছে। সে জটিল বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে সহজভাবে বলা যায় যে, এমন মানুষ আছেন যিনি চিত্তপ্রবণতা অনুসারে অন্তরস্থিত ভাব বা আদর্শের দ্বারা প্রত্যয়ের মূল্য নির্ণয় করেন। সামাজিক পরিবেশ, বংশগতি, ব্যক্তির দেহমনঘটিত বৈশিষ্ট্য, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতির দ্বারা আমাদের চিত্তধাতু নিয়ন্ত্রিত হয়। সমালোচনায় যিনি ভাববাদী, তাঁর চিত্তেও সাহিত্য-বিচারের পূর্ব থেকে সমাজ, নীতি ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আদর্শ থাকে। সাহিত্যবিচারে তিনি সেই আদর্শ অবলম্বন করেন, আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থের মূল্য না খুঁজে তিনি সেই সমস্ত সামাজিক বা নীতিঘটিত আদর্শের দ্বারা সাহিত্যের মূল্য বিচার করেন। এইজন্য তাঁকে আদর্শবাদী সমালোচকও বলা যায়। যেমন ধরা যাক, আদর্শবাদী সমালোচকের প্রেম সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ ধারণা আছে; তাঁর ধারণা প্রেম হল অজৈব, প্লেটোনিক, আত্মত্যাগমূলক আত্মবিলোপ। তিনি কোন প্রেমের কাহিনীর মধ্যে এই সত্যটি না পেলে সেই আখ্যান বা কবিতাকে শ্রদ্ধা করতে পারেন না। তাঁর ধারণা, মাতৃত্বেই

নারীত্বের চূড়ান্ত বিকাশ; তিনি মনে করেন, সাহিত্য বিশেষ ধরনের জীবননীতি প্রচার করবে—"রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ" —রামের মতো হবে, রাবণের মতো নয়। তিনি এই বাঁধা ছকে সাহিত্যবিচারের চেষ্টা করেন। সাহিত্য যেমন আছে তার দিকে না গিয়ে বরং সাহিত্য যেমন হওয়া উচিত, সেইদিকে তাঁর বিচারবুদ্ধি ধাবিত হয়। আদর্শবাদী সমালোচনা প্রায়শঃই dogma-র গোঁড়ামিতে পর্যবসিত হয়, সমালোচক তখন স্মৃতিকার হয়ে বসেন, সমালোচনার ছলে নীতি বিতরণ করেন।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সমালোচকের একটা আদর্শবোধ থাকা উচিত; কিন্তু সে আদর্শ হবে শিল্পে প্রকাশিত জীবনের আদর্শ—শিল্পজীবন-বহির্ভূত অন্য কোন সামাজিক বা নৈতিক আদর্শ নয়। তখন তিনি ম্যাথু আর্নল্ডের মতো 'ফিলিস্টাইন'দের কোতল করবার জন্য অধিকতর সচেষ্ট হন, আর না হয় প্লেটোর মতো ছলনাময় কবিসাহিত্যিকদের আদর্শ রাষ্ট্র থেকে নির্বাসনের ব্যবস্থা করেন; বাইরের আরোপিত আদর্শের দ্বারা সাহিত্যবিচার করতে হলে সে বিচার যে বহুলাংশে বিচারবিড়ম্বনায় পরিণত হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

নীতিবাদী সমালোচক সাহিত্যবিচারে নীতি ও আদর্শের মাপ-কাঠিকেই একমাত্র বিচার-মান বলে মনে করেন। আদর্শবাদী সমালোচকের চেয়ে নীতিবাদী সমালোচকের পরিধি আরও ছোট, তারও একদেশদর্শী। তিনি মনে করেন, জগৎ ও সমাজের হিত হয়, এমন নীতিপ্রচারই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সাহিত্যবিচারে তিনি সৌন্দর্যকে বাহুল্য বলে মনে করেন। কখনও তাঁর ধারণা হয়, সৌন্দর্যের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করলে নীতি ও উচ্চতর জীবনাদর্শের ক্ষতি হয়। *Vicar of Wakefield* [১]-এর মতো

১ গোল্ড্স্মিথের উপন্যাস; ১৭৬১-৬২ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত এবং ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত। মাত্র ৬০ পাউণ্ডের বিনিময়ে গোল্ড্স্মিথ এই উপন্যাসের কপিরাইট বেচে দিয়েছিলেন। ডাঃ প্রিমরোজ নামক একজন গ্রাম্য ধর্মযাজকের জীবনে কত রকমের ভাগ্য-

নিতান্ত কেজো নীতি বা pragmatic ethics-এর দ্বারা কোন বড় শিল্পবস্তু নির্মাণ করা যায় না। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের শেষাংশে পৌঁছে নীতিবাগীশ সমালোচক যখন দেখেন, "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"—তখন তিনি মনে মনে এই ভেবে আশ্বস্ত হন যে, এই শর্করামণ্ডিত তিক্ত বটিকা সেবনে দুর্নীতির ব্যাধি সমূলে উৎপাটিত হবে। নীতিবাদী সমালোচক সাহিত্যকে সমাজের খিদমতে নিয়োগ করতে চান। তার *জন্য* তিনি সাহিত্যবিচারে কয়েকটি প্রয়োজনীয় নীতির মাপকাঠি ব্যবহার করেন—যা দৈনন্দিন জীবনের পথে অপরিহার্য। শালগ্রাম শিলাকে বাটনাবাটা নোড়াতে রূপান্তরিত করতে না পারলে তাঁর স্বস্তি নেই। আদর্শবাদী সমালোচক তবু জীবন সম্বন্ধে একটা উদার এবং বৃহৎ ভাবাদর্শ বহন করেন; কিন্তু নীতিবাদী সমালোচক সমাজসংস্কার বা চরিত্রগঠনের উপযোগী নীতির দ্বারা সাহিত্যকে বিচার করতে যান এবং মাপে না মিললে তিনি গ্রীক পুরাণের প্রোক্রাসটিস ডাকাতের মতো কখনও সাহিত্যকে ছেঁটে, কখনও বা টেনে লম্বা করে ইচ্ছামতো হ্রস্বদীর্ঘ করতে চান। সমালোচনায় এইটি হল স্থূলতর বিচার-পদ্ধতি—এ পদ্ধতি সম্ভবতঃ প্রাচীনতর। সে যুগে নীতিবাগীশ সমালোচক সাহিত্যবিচারে ধর্মীয় ও চারিত্রনীতির প্রাধান্য দেখতে অভিলাষী হতেন; এ যুগে ঐ পন্থার সমালোচক বিশেষ দলগত রাজনীতি বা সমাজনীতিকে সাহিত্যে জয়যুক্ত দেখতে চান।

সাহিত্যে একটা নীতি অবশ্যই থাকবে, তবে তা সাহিত্য-বহির্ভূত দৈনন্দিন জীবনপরিচালনার প্রয়োজনীয় নীতি নয়, তা হবে সাহিত্যেরই নীতি, যে সাহিত্য মানুষের জীবনের বৃহৎ স্বরূপ প্রকাশ করে। আদর্শবাদী সমালোচক বা নীতিবাগীশ সাহিত্য-

বিড়ম্বনা এসেছিল এবং তিনি কেমন করে আবার পারিবারিক শান্তি ও মানসিক কল্যাণ ফিরে পেয়েছিলেন, তাই এতে বিবৃত হয়েছে। খ্রীষ্টানী ধর্মনীতি ও সাধুজীবনের আদর্শ এতে অনুসৃত হয়েছে।

বিচারক কোন কোন সময়ে বিশেষ কোন 'আইডিয়া' বা নীতিবাদের প্রতি আসক্তির জন্য সাহিত্যবিশ্লেষণে সাহিত্যকে বাদ দিয়ে অন্য কোন আদর্শকে (তা সে যতই মহৎ হোক না কেন) মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

বাস্তববাদী, বস্তুবাদী ও অতিবাস্তববাদী সমালোচক

ভাববাদী সমালোচকের সাক্ষাৎ বৈমাত্র সহোদর হলেন বাস্তববাদী সমালোচক। ভাববাদী সমালোচকের জীবন সম্বন্ধে পূর্ব থেকে বিশেষ ধরনের কতকগুলো সংস্কার থাকে এবং তিনি সেই সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাহিত্যের মূল্যবিচারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বাস্তববাদী সমালোচক সাহিত্যে দৈনন্দিন জীবনের যথাযথ প্রতিফলন দেখতে চান। যদি সাহিত্যে প্রত্যহের বার্নিশহীন জীবন রুক্ষতা ও বিবর্ণতা নিয়ে ফুটে ওঠে, তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। তাঁর কাছে মানুষ পক্ষহীন দ্বিপদ জীবমাত্র ; সাহিত্যে মানুষের সেই অনাবৃত বস্তুজগতের যথাযথ ফটোগ্রাফ চাই। সুতরাং দৈনন্দিন স্থূল জীবনের কালিমা যে সাহিত্যে ফুটে উঠবে, তাকেই তিনি বাস্তবতার দৃষ্টি থেকে অভিনন্দিত করে নেবেন। কাজে কাজেই তিনি 'ফর্ম'-এর চেয়ে বিষয়বস্তুর ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেন। তিনি দেখেন সাহিত্যসৃষ্টির মূলে থাকে কতকগুলি পূর্বহেতু ; লেখক শুধু দুচোখ মেলে দেখবেন আর লিখবেন ; ইন্দ্রিয় কাজ করবে—কিন্তু মন থাকবে অক্রিয়। সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে স্রষ্টার মনের সংযোগ ঘটলে লেখকের বিশেষ চিত্তভাব সূক্ষ্মভাবে শিল্পের সঙ্গে মিশে যাবেই—যা বাস্তববাদী শিল্পী ও সমালোচকের কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। বাস্তববাদী সমালোচক মনে করেন, দেশকালের প্রভাবই শিল্পের গতি নিয়ন্ত্রিত করে, পাত্রও দেশকালের শাসনাধীন অর্থাৎ 'ব্যক্তি' নামক চেতন পদার্থটি অচেতন দেশ ও কালের দ্বারা বিধৃত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত। সুতরাং সাহিত্যবিচারে বাস্তব জীবনের যথাযথ রূপায়ণ হয়েছে কিনা, সর্বপ্রথমে তাই

দেখতে হবে। সাহিত্যবিচারে সমালোচক সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বস্তুগত পটভূমিকার ওপর অধিকতর দৃষ্টি দেবেন। যে সাহিত্যে ঘটমান জীবন অপেক্ষা ঔচিত্যবোধ প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ যা ঘটে তা না বলে যা ঘটা উচিত—তাই প্রচার করে, বাস্তববাদী সমালোচক সে সাহিত্যকে স্বীকৃতি দিতে চান না।

বস্তুবাদী সমালোচক বাস্তববাদী সমালোচকের তথ্যকে পূর্বসূত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যকে অস্বীকার করে চেতনাচেতন সমস্ত কিছুকেই বস্তুর রূপান্তর বলে মনে করেন; যাকে আমরা চেতন মন বলি, তাঁর মতে তাও মস্তিষ্কের একটি জৈব প্রক্রিয়া মাত্র। আদি-অন্ত-সীমা-পরিবর্তনধর্ম দিয়ে গড়া যে বস্তুজগৎ—এর অতিরিক্ত কোন সত্তা নেই। সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকর্মও জড় বস্তু মাত্র—যদিও তা মূলতঃ মানসসৃষ্টি। মানবসমাজ ও মানবচৈতন্য এঁদের মতে কয়েকটা বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর চাহিদা থেকে বিকাশ লাভ করেছে; তার মধ্যে প্রধান হল মানুষের শিশ্নোদরপরায়ণতা যা বিশ্ববিবর্তনকে নিত্য ক্রিয়াশীল করে রেখেছে। সুতরাং মানব-ইতিহাসের মূলকথা—প্রয়োজনতাড়িত ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং সে বিবর্তনের অর্থ নেতি-ইতির অনন্ত পথপরিক্রমা। এঁদের মতে, "We regard economic conditions as the factor which ultimately determines historical development."[২] দার্শনিকতা বাদ দিয়ে আরও স্পষ্ট করে বলা চলতে পারে, ঐতিহাসিক বিবর্তন মূলতঃ অর্থনৈতিক ও 'লিবিডো'কেন্দ্রিক পূর্বহেতুর উপর একান্ত নির্ভরশীল; মানুষের স্থূলসূক্ষ্ম যে কোন সৃষ্টি এইরকম বাস্তব কার্যকারণাত্মক যুক্তি-পারম্পর্যের ওপর ভাসমান। সাহিত্যেরও মূলকথা প্রয়োজনের তাড়না; সে প্রয়োজন কখনও অর্থনৈতিক অভাববোধ, কখনও-বা অবদমিত আকাঙ্ক্ষার দুরন্ত অভীপ্সা।

২ Karl Marx—*Selected Works*, Vol. 1.

বাস্তববাদী সমালোচক অবশ্য সাহিত্যসৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে শিল্পরসিকের সঙ্গে একসুরে বলতে পারেন যে, সৃষ্টিকর্মে মানুষ ও পশুর তফাত আছে। "They (অর্থাৎ পশু) produce only under the domination of immediate physical needs while man produces only when free of these needs."[৩] দেহধারণের বাইরে গিয়ে এই যে শিল্পসৃষ্টি,—জান্তবসত্তার সঙ্গে মানবসত্তার এইখানে প্রধান পার্থক্য। বস্তুবাদী সমালোচক যতই সৃষ্টিকর্মের চিৎসত্তাহীন অস্তিত্বে বিশ্বাসী হন না কেন, সাহিত্য-বিচারে তাঁকে কিয়দংশে 'তৈল-তণ্ডুল-ইন্ধনে'র বাইরে যেতে হবেই।

বস্তুবাদী দার্শনিক যেমন বিশ্বাস করেন, বস্তুর স্থান আগে, তারপরে চেতনা এবং বস্তু থেকেই চেতনার উজ্জীবন, তেমনি বস্তুবাদী সমালোচকও মনে করেন যে, সাহিত্যবিচারে অবিমূর্ত ও নির্ভেজাল বস্তুবাদী যুক্তিপন্থা প্রয়োগ করা উচিত। বস্তুর ব্যতিরিক্ত এমন কোন চিদ্ব্যাপার বা চৈতন্যবোধ নেই যা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে। সুতরাং কবিমানসের পিছনে ব্যক্তিসত্তার চেয়ে বস্তুসত্তাই অধিকতর ক্রিয়াশীল—অর্থাৎ শিল্পীমানস বস্তুবোধের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, বাস্তব সত্তার অতিরিক্ত কোন শিল্পীসত্তা নেই।

আমাদের মনে হয়, অন্ততঃ সাহিত্যবিচারে এইজাতীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সর্বত্র কার্যকরী হতে পারে না। বস্তু হল শিল্পসাহিত্যের উপাদান—বস্তুই শিল্প নয়; এক-একটি বিশেষ মানস এক-এক বস্তুকে নিজ নিজ প্রবণতা অনুসারে গ্রহণ করে, মনের দ্বারা তাকে বাছাই করে, সাজায়, রূপদান করে,—একই বস্তু-উপাদান বিভিন্ন শিল্পীর কাছে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে।

বাঙলা দেশের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' মোটামুটি একই বস্তু-উপাদান নিয়ে রচিত—মৎস্যজীবী

---

৩ Karl Marx & Engels—*Literature and Art* (Published by Current Book House, Bombay).

সম্প্রদায়ের কথা। কিন্তু তিনজন লেখকের প্রবণতা অনুসারে তিনটি উপন্যাস সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের শিল্প হয়ে উঠেছে। একই 'স্কাইলার্ক' নিয়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলী কবিতা লিখেছেন, প্রায় একই বিষয় নিয়ে 'শৃঙ্গারশতক' এবং 'শৃঙ্গারাষ্টক' লিখিত—তবু কত না পার্থক্য। শুধু বস্তু-উপাদান পৃথক হয়ে গেছে বলেই যে এগুলির মধ্যে তফাত ঘটে গেছে, তা নয়—যে-মনগুলি এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করছে, প্রকাশ করছে, তারাও পৃথক। আর তা ছাড়া সম্প্রতি য়ুরোপে ভবিষ্যদ্বাদ (Futurism), অতিবাস্তববাদ (Surrealism), 'ডাডা'বাদ (Dadaism) প্রকাশবাদ (Expressionism), অস্তিত্ববাদ (Existentialism) প্রভৃতি নব্য সাহিত্যবিচারপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে বস্তুবাদী আলোচনাকে ন্যায়ের ভাষায় 'অব্যাপ্তি'-দোষদুষ্ট মনে হবে। পরের আলোচনার দ্বারা আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে য়ুরোপ সাহিত্যবিচারে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুসত্তার অতীত স্বপ্নানুষঙ্গ ও তদবস্থ প্রতীককল্পনাকে নানা আকারে গ্রহণ করেছে।

ভবিষ্যদ্বাদ বা Futurism[৪] 'কিউবিজম্'-এর মতো মূলতঃ শিল্পকলার দিকনির্দেশক হলেও সাহিত্যবিচারেও এ পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে। এই মতে শব্দের অর্থপ্রতীকের বন্ধনমোচন সবচেয়ে বড়

---

৪ ১৯০৯ সালে ইতালীয় কবি ফিলিপ্‌পো তোম্‌মাসো মারিনেত্তি (Filippo Tommaso Marinetti) এই শিল্পরীতির উদ্ভাবন করেন। অল্পকালের মধ্যেই 'ফিউচারিজম্' শিল্প ও সঙ্গীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ১৯১১ সালে মারিনেত্তি *Le Futurisme* গ্রন্থে তাঁর মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। তিনি এবং তাঁর শিষ্যেরা নিয়মানুগ শিল্পসৃষ্টি ও বিচারপদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে প্রচার করেন যে, আধুনিক যান্ত্রিকতা ও বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার আমাদের পূর্বতন রূপকল্প ও চৈতন্যকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। সুতরাং আগামী কালের সাহিত্য হবে ব্যাকরণের 'শাসন-নাশন' ছন্দস্পন্দহীন বাক্‌পুঞ্জ। পূর্ব যুগের রোমান্টিকতা, আবেগব্যাকুলতা প্রভৃতিকে অস্বীকার করে এঁরা সদম্ভে ঘোষণা করলেন, "*Uccidiamo il chairo di luna*"—অর্থাৎ আমরা চাঁদনী রাতকে বানচাল করব। সুতরাং এঁদের সাহিত্যে গণিতের ফর্মুলা থেকে শুরু করে দ্রুতলিপির সঙ্কেত পর্যন্ত শিল্প-ও সাহিত্য-সৃষ্টির মর্যাদা পেল। ১৯১৯ সালের পর মারিনেত্তির দলবল তাঁকে ছেড়ে গেলেও গদ্যে এবং নাটকে এঁর প্রভাব পড়েছিল। পিরানদেল্লোর নাটক তার প্রধান সাক্ষ্য।

কথা—*Parole in liberta* অর্থাৎ শব্দের স্বাধীনতা এর বেদমন্ত্র। আদর্শের দিক থেকে এই মত শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিবাদের সেবক হয়ে পড়েছিল। সে যাই হোক, এই বিচারপ্রণালী শব্দানুষঙ্গ ও ভাব-প্রতীকের মধ্যবর্তী অন্বয়বন্ধন যেমন ভেঙেছে, তেমনি ঈষৎ পরবর্তিকালে আবির্ভূত 'ডাডাবাদ' থেকে 'অস্তিত্ববাদ' পর্যন্ত সাহিত্য ও শিল্পবিচারের নানা পদ্ধতিকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত করেছে।

প্রকাশবাদের (Expressionism)[৫] সঙ্গে Futurism-এর কিছু সংযোগ আছে। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে কাব্যরচনায় Impressionism-এর বিশেষ প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। এই মতে বিশ্বাসী কবিরা কল্পনাকে যথাযথভাবে ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। তাঁরা মনে করতেন—সংহত, সুবিহিত, সুপরিকল্পিত শব্দকল্পের সাহায্যে কল্পনাবাসী চিত্রকল্পকে যথার্থতঃ ফুটিয়ে তোলা যায়। এই মতেরই প্রতিক্রিয়ার আকারে প্রকাশবাদ বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। এই মতবাদে বিশ্বাসী শিল্পী ও সমালোচকেরা মনে করেন যে, বস্তুধর্ম ও যৌক্তিকতার বাঁধাগতের সাহায্যে আমাদের যে প্রত্যয় গড়ে উঠেছে, তা প্রকৃতপক্ষে বস্তুর যথার্থ ভাবরূপ বা আইডিয়াকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। তাই এঁরা আসল বস্তুস্বরূপ (কাণ্টের

---

৫ প্রথম মহাযুদ্ধের একটু আগে জার্মানিতে এই প্রকাশবাদী (Expressionism) সাহিত্য ও সমালোচনার আবির্ভাব হয় এবং প্রায় ১৯২৪ সাল পর্যন্ত এই মতের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফিউচারিজম্ থেকেই এর উৎপত্তি। ১৯০১ সালে হার্ভে (Hervo) নামক এক চিত্রশিল্পী সর্বপ্রথম Expressionism শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তারপর ১৯১৪ সালে হেরমান বর (Hermann Bahr) নামক একজন অস্ট্রিয়ান লেখক সাহিত্যে এই শব্দটি ব্যবহার করেন। বার্গসঁয়ের দর্শন (*elan vital*), স্ট্রীণ্ডবার্গের মানবাত্মা সম্বন্ধে গভীর অনুভূতি, ফ্রয়েডের অবচেতন মন সম্পর্কে প্রতীকী গবেষণা এই প্রকাশবাদের তত্ত্বকথাকে ত্বরান্বিত করেছে। শেষের দিকে প্রকাশবাদ তিনটি মূর্তি গ্রহণ করে। একটি হল বুদ্ধিমার্গীয় আদর্শ, আর একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ববাদ এবং সর্বশেষেরটি ঈশ্বর-বিষয়ক। কাব্য, ছোট গল্প ও উপন্যাসে Expressionism-এর প্রভাব পড়েছে বটে; কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রভাব নাটকেই লক্ষ্য করা যায়। স্ট্রীণ্ডবার্গের নাটক তার প্রধান দৃষ্টান্ত। ১৯২৪ সালের দিকে জার্মানির অবস্থা শান্ত হয়ে এলে এই মতবাদও ক্ষীণবল হয়ে পড়ল। যুদ্ধের সময় নাজিবাদ এই মতকে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছিল।

ভাষায় Thing-in-itself) সন্ধান করেন। সেই জন্য এঁদের ভাষা বাহ্যতঃ অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি বলে মনে হয়; কারণ এঁরা দেখেছেন, পরিদৃশ্যমান বস্তু এবং মনোজগতে-জাত তার চেতনার মধ্যে কোন যৌক্তিক পারম্পর্যের যোগ নেই। এঁদের দৃষ্টিতে প্রকৃতি হয়ে ওঠে জীবন্ত, মানুষ হয়ে পড়ে প্রাণহীন। আসলে এঁরাও বস্তুর স্বরূপসন্ধানী এবং বস্তুর মৌল চেতনাকে বিকল্পাত্মক জগৎ থেকে মুক্তি দিতে অভিপ্রয়াসী। যা অধরা সোনার হরিণ, তাকেই তাঁরা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত চেতনার দ্বারা ধরতে বদ্ধপরিকর।

প্রকাশবাদের ছায়াতলে প্রায় সমকালে (অর্থাৎ বিশ শতকের গোড়ার দিকে) 'ডাডা'বাদ ('Dada'ism) এবং 'ডাডা'বাদের প্রভাবে এবং কিছুটা প্রতিক্রিয়ায় অতিবাস্তববাদ (Surrealism) য়ুরোপে সাহিত্য, শিল্প ও শিল্পবিচারপদ্ধতিতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

'ডাডা'বাদও (Dadaism)[৬] বস্তুস্বরূপের প্রকাশরীতি সম্বন্ধে এক উৎকট পরীক্ষা। প্রকাশবাদে যেমন দেখা গেছে চিন্তা ও চিন্তার প্রকাশের মধ্যে প্রতীতিগম্য যৌক্তিকতা নেই, তেমনি ডাডাপন্থীরাও এই পথ ধরে আরও পিছল প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁদের মতে বাইরের বস্তুস্বরূপ, মনোজাত বস্তুচৈতন্য এবং তাকে প্রকাশ করবার ভাবানুষঙ্গ ও ভাষাপ্রতীক—এদের কারো সঙ্গে কারো কোন সম্পর্ক নেই। যুক্তিবাদ এ মতে ছেঁড়া কাগজের মতো পরিত্যাজ্য। শিশুর অসম্বদ্ধ আধো আধো শব্দের কি কোন অর্থ আছে? শিশু যখন কথা বলতে শেখে, তখন 'ডা' 'ডা' প্রভৃতি অর্থহীন ধ্বনি উচ্চারণ করে। এই শিশু-কণ্ঠোচ্চারিত 'ডা' 'ডা' থেকে ডাডাবাদের নাম পরিকল্পিত হয়েছে। এঁরা তাই বললেন যে. চিন্তা ও তার প্রকাশ, বস্তু ও তার

---

৬ প্রথম মহাযুদ্ধের একটু পরে ১৯১৭ সালের দিকে Tristan Tzara, Hans Arp, Andre Breton, Louis Aragon প্রভৃতি লেখকদের চেষ্টায় জুরিখে এই দল গড়ে ওঠে। ১৯২০ সালের দিকে Tzara ও Breton-এর মধ্যে মতভেদ হয়ে যায়, যার ফলে ১৯২৪ সালে Andre Breton-এর নেতৃত্বে ডাডাবাদ-পরিত্যাগী 'সাররিয়ালিস্ট' দল নতুন আদর্শ ঘোষণা করেন।

রূপকল্প—এদের মধ্যে যৌক্তিকতার কিছুমাত্র যোগাযোগ নেই। এই মতাবলম্বীরা শিল্পসৃষ্টি ও শিল্পবিচারে নৈরাজ্যবাদী 'নিহিল' মত ধরলেন। এঁরা বললেন, শিল্পের ক্ষেত্রে 'ফর্ম' ও 'কনটেণ্টের' সঙ্গে কোনরূপ পারম্পর্য নেই। যা এই চিন্তা ও প্রকাশকে অভ্রান্ত ও অবশ্যম্ভাবী যুক্তিজালে বাঁধতে চায়, সেই সমস্ত পুরাতন সংস্কারকে এঁরা বিদ্রূপ করতে লাগলেন, তীব্র পরিহাসে পুরাতন মূল্যমানকে ধিক্‌কৃত করলেন। বলা বাহুল্য, প্রকাশবাদীদের চেষ্টা কিয়দংশে অস্তিবাচী, কিন্তু ডাডাবাদীরা প্রায় নাস্তিকের পথ ধরলেন।

ডাডাবাদের উৎকট আতিশয্য থেকে অতিবাস্তববাদের (Surrealism)[৭] উৎপত্তি হয়। যাঁরা ডাডাপন্থী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল, এবং তাঁদের কয়েকজন এই নতুন দল গঠন করলেন। হার্বাট রীড এই মতের ব্যাখ্যা করেছেন সংক্ষেপে। অতিবাস্তববাদের লক্ষ্য হল : "Breaking down the barriers both physical and psychical, between the conscious and the unconscious, between the inner and the outer world, and to create a super-reality in which the real and the unreal, meditation and action, meet and mingle and dominate the whole life." বস্তুজগৎ ও মনোজগৎ, চেতন ও অচেতন, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ—

৭ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী দেশে শিল্প, ভাস্কর্য ও সাহিত্যবিচারে অতিবাস্তববাদী পন্থার উদ্ভব হয়। ১৯১৮ সালে Guillaume Apollinairo সর্বপ্রথম *Super-realism* শব্দটি ব্যবহার করেন। ডাডাবাদে ফাটল ধরলে Andre Breton সে মত ত্যাগ করে তাঁর দলবল সহ ১৯২৪ সালে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করে এই মত প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘোষণা **'First Surrealist Manifesto'** নামে পরিচিত। ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র (**Second Surrealist Manifesto'**) প্রচারিত হয়। সেই ঘোষণাপত্রেই অতিবাস্তববাদের সংজ্ঞা নির্ধারিত ও ব্যাখ্যা প্রচারিত হয়। শিল্পে পিকাসো কিছুকাল সাররিয়েলিজম' ধারা অনুসরণ করেছিলেন। **Andre Breton** এবং **Paul Eluard** সাহিত্যে এই মতের প্রধান প্রবক্তা। পরে মার্কস্‌বাদের সঙ্গে অতিবাস্তববাদের ঘনিষ্ঠতা ঘটে। প্রথম দিকে এই মত বিশুদ্ধ শিল্প ও সাহিত্য তত্ত্ববিষয়ক হলেও ১৯৩০ সালের পূর্বে এতে উগ্র রাজনীতি প্রবেশ করে এবং কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সঙ্গে এর নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অবশ্য ১৯৩০ সালের পর এই সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেছে।

এদের সীমাবন্ধনকে অস্বীকার করে এমন একটি বাস্তবাতিচারী চৈতন্য (Super-reality) সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, চিন্তা ও কর্মসংবেগ—পরস্পরে একাত্ম হয়ে উঠবে।

অতিবাস্তববাদী সমালোচক মনে করেন যে, প্রত্যহ আমাদের যে-চৈতন্য বস্তুজগতের সঙ্গে কারবার করে, ভাষার সাহায্যে বস্তুর ভাবপ্রতীক গড়ে তোলে, সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যবিচারে তা যথেষ্ট নয়। এই মতে বস্তুচৈতন্যে স্বপ্নানুষঙ্গ ও অবচেতন সত্তার অধিকতর প্রাধান্য, এবং বাস্তব ভাবপ্রতীকের সাহায্যে বস্তুস্বরূপ প্রকাশ করা যায় না; বস্তুর সেই আসল 'বস্তুস্বরূপ' প্রকাশের জন্যই স্বপ্নপ্রতীকের প্রয়োজন। বাস্তবগ্রাহ্য যুক্তিপরম্পরা বস্তুর স্বধর্মকে কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারে না। রোমান্টিকতার সঙ্গে অতিবাস্তববাদী সমালোচকের সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয়; রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী যেমন পরিদৃশ্যমান বস্তুচেতনায় সৌন্দর্য ও সুদূরের ব্যঞ্জনা যোগ করে দিয়ে ইন্দ্রিয়জ চেতনাকে আরও একটা নতুন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, তেমনি অতিবাস্তববাদী সমালোচক সাহিত্য-বিচারে অবচেতন মনের অধিকতর সাহায্য গ্রহণ করেন এবং ভাবানুষঙ্গ বিচারে সুস্পষ্ট চিত্রের চেয়ে অস্পষ্ট প্রতীকের দিকে বেশি আকৃষ্ট হন। রিচার্ড সাহিত্যবিচারে চেতন মনের মূল্য-বোধের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু হার্বাট রীড, আন্দ্রেঁ ব্রেটন, পল এলুয়ার্ড প্রভৃতি অতিবাস্তববাদী সমালোচক ও শিল্পী বহির্জগতের যুক্তিপরম্পরাবলম্বী যাবতীয় বস্তু-অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কার করতে চান। এঁরা 'Automatic writing' বা স্বয়ংক্রিয় লেখনের সাহায্যে শিল্পসৃষ্টির অভিনব প্রকরণ আবিষ্কার করেছেন। কোন লেখককে সম্মোহনবিদ্যার সাহায্যে মোহাচ্ছন্ন করে তার দ্বারা লিখিয়ে নেওয়াকে 'Automatic writing' বলে। এঁদের মতে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির মনের চারদিক থেকে যখন সংস্কারে-গড়া বস্তুচেতনার কৃত্রিম বাঁধন শিথিল হয়ে যায়, তখনই যথার্থ শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়। :

এই প্রসঙ্গে অস্তিত্ববাদের (Existentialism)[৮] কথা উল্লেখ করা চলতে পারে। এই মত বহু পূর্ব থেকে দার্শনিক মহলে সুপ্রচলিত থাকলেও সাহিত্যক্ষেত্রে জাঁকিয়ে উঠেছে অতি সম্প্রতি— অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন মানুষের আদর্শের মূল্যবিভ্রাট এবং চৈতন্যের অবক্ষয়ী বিকার শুধু সান্ত্বনাহীন যন্ত্রণার নিরন্তর জন্মদান করছে—তখন। এই মতে মানুষের অস্তিত্ব *a priori* অর্থাৎ কার্যকারণাত্মক নয়, মানুষ শুধু 'সৎ' (exists) এবং 'ঘটমান' (becoming); অর্থাৎ মানুষ কতকগুলো পরিবেশের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। মানুষ আত্ম-এষণার বশে এই পরিবেশের বাইরে গিয়ে নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

অস্তিত্ববাদী চেতনা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে, একটি হল নিরীশ্বরবাদী—সার্ত্র যার প্রচারক। এর তাৎপর্য—মানুষ নিদারুণ পীড়ন ভোগ করলেও তার ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা আছে। এর আরেকটি শাখা ঈশ্বরবাদী—গাব্রিয়েল মারসেল এর প্রচার-কর্তা। নিরীশ্বর মতের আত্ম-এষণা ঈশ্বরবাদী মতেও স্বীকৃত হয়েছে, তবে এঁরা এই এষণাকে ঈশ্বরাভিমুখী করতে চান। সমালোচক যদি অস্তিত্ববাদের দ্বারা সাহিত্যবিচার করতে যান, তাহলে সাহিত্যের উপাদান, প্রকাশরূপ ও মূল্যমানও আমূল পরিবর্তিত হবে। সম্প্রতি এই মত নিয়ে দার্শনিক এবং সাহিত্যিক মহলে প্রচুর আলাপ পরিচয় চলেছে।

---

৮ বিশ শতকের পূর্বেও অস্তিত্ববাদের অনুরূপ দার্শনিক মতের প্রচার ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর Existentialism ফরাসী দেশে এবং সেখান থেকে য়ুরোপ-আমেরিকার সর্বত্র প্রচার লাভ করেছে। দিনেমার ধর্মশাস্ত্রবিদ সোরেন কার্কগার্ড (১৮১৩-৫৫) আধুনিক কালে সর্বপ্রথম এর দার্শনিক ভূমি তৈরি করেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে জার্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং স্পেনে অস্তিত্ববাদের কিছু প্রচার হয়েছিল। ডস্টয়ভস্কি ও জার্মান ঔপন্যাসিক কাফ্কার গ্রন্থে (Franz Kafka ; 1883-1924) এই মতের আভাস দেখা যায়। দার্শনিকতার কথা ছেড়ে দিলে, সাহিত্যক্ষেত্রে এর প্রাধান্য সূচিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক জাঁ পল সার্ত্র (Jean Paul Sartre, 1905-) তাঁর উপন্যাস গল্প ও প্রবন্ধে অস্তিত্ববাদী দর্শনকে সাহিত্যে প্রয়োগ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *L' Etre et le Neatnt*-এ এই মত সর্বপ্রথম সুচারুভাবে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। তাঁর দুখানি অস্তিত্ববাদী নাটক *Morts sans Sepulture* এবং *Huit Clos*-এ মানবজীবনের নিপীড়ন ও নিদারুণ যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ডাডাবাদ, অতিবাস্তববাদ প্রভৃতি তত্ত্ববাদ আলোচনা করে দেখা গেল যে, সংস্কারাচ্ছন্ন বস্তুচেতনা থেকে উদ্ভূত বাস্তব যুক্তি-ক্রমকে অস্বীকার করে এই মতের বিচারকগণ বাহ্যবস্তুর অন্তরালবর্তী আর এক বস্তুলোকের আভাস পেয়েছেন, যা দর্শনের ভাষায় অচিন্ত্য। 'বস্তুবাদ' প্রসঙ্গে এই সমস্ত মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার অর্থ—বস্তুবাদী সাহিত্য ও সাহিত্যবিচারপদ্ধতি যে চূড়ান্ত নয়—তারই কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া।

ব্যবহারবাদী ও সৌন্দর্যবাদী সমালোচক

যাঁরা সমালোচনায় ব্যবহারবাদী, তাঁরা মনে করেন মানুষের প্রয়োজনে লাগাই সাহিত্যের একমাত্র কাজ। আলঙ্কারিক বলেছেন :

চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির্হি কাব্যতো রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবদিত্যাদি-কৃত্যাকৃত্যপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপদেশদ্বারেণ সুপ্রতীতৈব।[১]

কাব্য থেকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তি হয়। রামের মতো হওয়া উচিত, রাবণের মতো নয়, করণীয় অকরণীয়, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রভৃতি উপদেশ দেওয়া কাব্যের লক্ষ্য—সে কথা সকলেই জানে।

সাহিত্যিক বা সমালোচক যখন এ কথা বলেন, তখন তিনি সাহিত্যের প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই মন্তব্য করেন। অর্থাৎ দেশের দশের সেবায় লাগা, গণদেবতার উপাসনা, 'বহুজন-হিতায় চ, বহুজনসুখায় চ', 'greatest good for the greatest number' প্রভৃতি প্রয়োজন দিয়ে সাহিত্যের মূল্য বিচার্য। আধুনিক কালে আমরা প্রয়োজনবাদের জগতে বাস করি; যার সঙ্গে আমাদের জীবসত্তার কোন না কোন দিক দিয়ে যোগ নেই, তাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। শুধু মনের আনন্দ, অবসর-রঞ্জন, "বিলাসকলাকুতূহল"-এর জন্যই সাহিত্য, এ কথা আমরা বিশ্বাস

---

১ সাহিত্যদর্পণ, ১।২

করতে পারি না। প্রয়োজন দিয়ে বিচার করলে 'মেঘদূতে'র চেয়ে *Uncle Tom's Cabin* অধিকতর মূল্যবান মনে হবে। Oscar Wilde-এর চেয়ে Whitman পড়ে বেশি লাভ হয়। এই মতের পাঠক ও সমালোচকের কাছে বিশুদ্ধ সাহিত্য ততটা কৌতূহলোদ্দীপক নয়, যতটা হয় সাহিত্যের ব্যবহারিক দিক। লোকশিক্ষা, রাষ্ট্রের কাজকর্ম এবং আরও নানা উপযোগিতা দিয়ে তাঁরা সাহিত্য বিচার করেন। সুতরাং সাহিত্যের শিল্পকলার চেয়ে তার প্রয়োগের দিকে তাঁদের বেশি আকর্ষণ থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

সৌন্দর্যবাদী সমালোচকের প্রতিভূ Oscar Wilde বলেছেন, "All art is quite useless." তাঁর মতে বাস্তবপ্রয়োজনহীন সৌন্দর্যসৃষ্টি সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য; প্রয়োজনে লাগল কি লাগল না, দেশের উপকার হল কি হল না—এ প্রশ্ন সাহিত্যের নয়, সুতরাং সমালোচকেরও নয়। শিল্পী যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন, সমালোচক তাকেই উপলব্ধি করেন, নতুন করে সৃষ্টি করেন। "The artist is the creator of beautiful things···The critic is he who can translate into another manner or a new material his impression of beautiful things."—Wilde. কান্ট তাঁর *Critique of Judgement* গ্রন্থে সৌন্দর্যচেতনাকে "purposiveness without purpose" বলেছেন, অর্থাৎ যার কোন ক্রিয়ামূলক উদ্দেশ্য নেই—অন্য কথায় যার বাস্তব প্রয়োজন নেই। এই সৌন্দর্যচেতনা হল আনন্দময় আকর্ষণ; ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি এবং মনোজ আবেগের সঙ্গে এর যোগ বেশি। সমালোচক যখন সাহিত্যের মধ্যে অপ্রয়োজনের আনন্দ (purposiveness without purpose) খোঁজেন তখন তাঁকে সাহিত্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে হয়। এলিয়ট বলেছেন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দুটি দিক আছে, একটি তার সৌন্দর্যের দিক, আর একটি তার বিরাট স্বরূপ—যাকে মহৎ সাহিত্য বলে।

সৌন্দর্যবাদী সমালোচককে আবার রূপবাদী (Formalist critic) বলা হয়। এঁরা সাহিত্যে বিষয়বস্তুর চেয়ে তার শিল্পরীতি ও সৌন্দর্যের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হন। ক্রোচে দেখিয়েছেন যে, সৌন্দর্যচেতনা শুধু আত্মপ্রকাশক্ষম নয়, সংক্রামকও বটে। সাহিত্যে যে সৌন্দর্য স্ফূর্তিলাভ করে, সমালোচকের মনে তা সংক্রামিত হয় এবং তিনি সাহিত্যবিচারে সেই সংক্রামিত সৌন্দর্যানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। তাই সৌন্দর্যবাদী সমালোচনা প্রায়শঃই সমালোচকের একান্ত ব্যক্তিগত রসোপভোগে দাঁড়িয়ে যায়। নীতি-দুর্নীতি, সামাজিক-অসামাজিক এই সমস্ত প্রশ্ন সৌন্দর্যবাদী সমালোচকের কাছে নিতান্তই গৌণ।

ভারতের রসবাদী আলঙ্কারিকগণ কতকটা এই মতে বিশ্বাস করতেন। বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাবের দ্বারা পাঠকের মনে যে আনন্দময় সম্বিতের উদয় হয়, অলঙ্কারের পরিভাষায় তাকে রস বলা হয়। রসবাদী আলঙ্কারিকগণ মনে করতেন, রসই কাব্যের একমাত্র ফলশ্রুতি। সৌন্দর্য হল একপ্রকার আনন্দময় ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণ যা শিল্পের বহিরঙ্গ থেকে আসে, অপরদিকে রস হল ভিতরের আনন্দময় অনুভূতি। সৌন্দর্য রসনিষ্পত্তিতে সাহায্য করে। রসবাদে আনন্দদান ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য নেই; সৌন্দর্যবাদে সৌন্দর্যসৃষ্টি ছাড়া সাহিত্যের আর কোন ক্রিয়া নেই।

জীবনবাদী সমালোচক

জীবনবাদী সমালোচক (Vital critic) মানবজীবনের মূল্য ও সত্য দিয়ে সাহিত্য বিচার করতে চান। এঁরা সৌন্দর্যবাদী সমালোচকের বিপরীত। সৌন্দর্যবাদী সমালোচক বলেন, "Art for art's sake", এঁরা বলেন, "Art for life's sake"; সাহিত্য শিল্পকলা—এ সব কিছুর অবলম্বন মানবজীবন, ফলশ্রুতিও মানবজীবন। নীতি নয়, সৌন্দর্য নয়, তত্ত্ব নয়—মানুষের জীবনই

সাহিত্যের একমাত্র বিষয়বস্তু। উনিশ শতকের য়ুরোপে যে মানবতন্ত্রবাদ বা Positivism-এর জনপ্রিয়তা দেখা দেয়, জীবনবাদী সমালোচকও কতকটা সেই মতের দ্বারা পরিচালিত। মানবতন্ত্রবাদের মূলকথা—সত্যনির্ণয় ও মূল্যবিচারের একমাত্র মাপকাঠি—মানুষ। ম্যাথু আর্নল্ডের "criticism of life" কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ হবে। আর্নল্ড কিন্তু বিশুদ্ধ মানববাদের দ্বারা বিচার করেন নি, তাঁর 'high seriousness' শব্দের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি 'মধ্যভিক্টোরীয়' যুগের নীতিনিয়মের শাসনকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। "Criticism of life"-এর জীবন এবং জীবনবাদী সমালোচকের জীবন এক নয়। জীবনবাদী সমালোচক জীবন-বহির্ভূত কোন তত্ত্বের দ্বারা জীবনকে বিচার করেন না। অপরদিকে আর্নল্ড এবং তাঁর শিষ্যেরা সাহিত্যের মধ্যে শিল্পসম্মত জীবনকেই পেতে চান—প্রাকৃত জীবন নয়। শিল্পসম্মত জীবন বলতে জীবনের যথাবস্থিত রূপকে বোঝায় না, ভালমন্দের নির্বাচন বোঝায়। প্রাকৃত জীবনকে সাহিত্যের শোধনযন্ত্রের দ্বারা শিল্পোপযোগী করে নেওয়া ম্যাথু আর্নল্ডের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু জীবনবাদী সমালোচক সাহিত্যে জীবনের ভালমন্দ সবই চান—বাছাই চলবে না। রুক্ষ-কোমল, নীতি-দুর্নীতি, কুৎসিত-সুন্দর, প্রেম-কাম, ত্যাগ-স্বার্থ—এই নিয়ে বিচিত্র জীবনের যে হার্মনি—জীবনবাদী সমালোচক সাহিত্যবিচারে তাকেই গ্রহণ করতে চান।

এই মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠা সম্ভব। শিল্প ও সাহিত্য সর্বোপরি সৃষ্টি—অনুকরণ নয়। সাহিত্যবিচারে সৃষ্টির অর্থ হল এক বস্তুকে অপর বস্তুতে পরিণত করা। অবশ্য 'না-কিছু' থেকে সবকিছু সৃষ্টি করার দুর্লভ ক্ষমতা মানুষের নেই, প্রজাপতি ব্রহ্মার হয়তো আছে। মানুষ শূন্য থেকে সৃষ্টি করতে পারে না; কিছু না কিছু উপাদান চাই—তা সে বস্তুই হোক, আর কল্পনাই হোক। রূপান্তরীকরণ যদি সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বড় কথা হয়, তা হলে রূপান্তর করার জন্য একটা সক্রিয় প্রচেষ্টা চাই এবং প্রচেষ্টার পিছনে মন চাই।

মাটি থেকে কুম্ভকার ঘট তৈরি করে। উপাদান মাটি এবং উপাদানের বিকার যে ঘট—উভয়ের মাঝখানে কুম্ভকার দাঁড়িয়ে আছে। ঘট সৃষ্টির ব্রহ্মা হল কুম্ভকার—অর্থাৎ তার মনের মধ্যে একটি আইডিয়া রয়েছে যাকে ঘটত্ব বলা যেতে পারে। তার মনের মধ্যে ঘট নামক বস্তুর যে চেতনা রয়েছে, মাটি-উপাদান থেকে সে তদনুরূপ একটি বস্তু গড়ে তোলে। তাকে প্রথমে আইডিয়া বাছাই করতে হয়। তার মনে ঘটত্ব ছাড়াও আরও কত ভাব আছে—হাঁড়ি, কলসি, সরা প্রভৃতি। এগুলিরও উপাদান মাটি; কিন্তু নির্মাতা যখন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের বশে (অর্থাৎ ঘট তৈরির ইচ্ছায়) মাটি ছেনে নেয়, তখন বুঝতে হবে যে, সে অসংখ্য 'ইমেজ' থেকে একটিকেই বেছে নিচ্ছে। এই বাছাই বা নির্বাচন না হলে হাঁড়ি-কলসি-সরা—সবই তার মনের মধ্যে এমন ভিড় করবে যে, সে কিছুই গড়তে পারবে না, অথবা দেব গড়তে বানর গড়ে বসবে—হাঁড়ি গড়তে কলসি. তেমনি জীবন সাহিত্যের বিষয় হলেও জন্ম থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সবটাই সব সময়ে সাহিত্যের উপাদান হয় না, লেখকের মেজাজমর্জি মতো জীবনের বিশেষ অংশ বাছাই করে নিয়ে সাহিত্যের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং জীবনবাদী সমালোচকের নির্বিশেষ জীবন নয়, বিশেষ জীবনই সাহিত্যের বিষয়—এবং সে বিশেষ জীবন আবার লেখকের মন নামক চালুনির মধ্য দিয়ে ছেঁকে বেরিয়ে আসে।

বিষয়, রূপ ও রসবাদী সমালোচক

সাহিত্যে বিষয় (content) বড়, না রচনার বিশেষ আকার বা রূপ (form) বড়, দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যে এই তর্কবিতর্ক চলে আসছে। এদেশে এবং ওদেশে সর্বত্রই সমালোচকগণ যথাক্রমে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। একদল মনে করেন, সাহিত্যে বিষয়টাই বড়, তার রীতি, style, শিল্পরূপ, form—এসব গৌণ; আগে দেহ, পরে দেহের লাবণ্য। বিষয়টা যদি বৃহৎ হয়, তবে

তার রচনাশিল্প ও কলাকৃতিতে কিছু ত্রুটি থাকলেও সে সৃষ্টি কালজয়ী হয়। বাল্মীকি ব্যাস হোমর শেকস্‌পীয়র—এঁরা তো বিষয়ের বিশালতা ও গভীরতায় অমরত্ব লাভ করেছেন। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে এই কথাটাই আর একটু স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। একদল আলঙ্কারিক বলেছেন যে, স্বভাবতঃই যা মনোহারী, মহৎ,—"চন্দ্রচন্দন-কোকিলালাপ-ভ্রমরঝঙ্কারাদয়ঃ"—তাই সাহিত্য। সাহিত্যের উপাদান বিচার করতে হলে তার 'বিভাব'-এর প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে। সীতাহরণ রামায়ণের প্রধান ঘটনা ; প্রতিদিন সংবাদপত্রে 'আইন ও আদালতে'র পাতায় অনুরূপ অপরাধ-ঘটিত কত ফৌজদারী মামলাই চোখে পড়ে—কিন্তু তা নিয়ে তো মহাকাব্য লেখা হয় না। অর্থাৎ মহৎ বিষয় হলে তা সাহিত্য হিসাবে সর্বজনশ্রদ্ধেয় হবেই। বিষয়বাদী সাহিত্যবিচারক তাই সাহিত্যের বিষয়-উপাদান বা content-এর ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভেবে দেখলে বিষয়বাদী সমালোচকের কথা একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। জগতের অনেক গ্রন্থ সাহিত্যপদবাচ্য হয়েছে শুধু বিষয়মাহাত্ম্যে। মহৎ বা বৃহৎ কিছু বলার না থাকলে তা যুগে যুগে মানবচিত্তকে আকর্ষণ করতে পারবে না। বক্তব্য গভীর না হলে, ব্যাপক না হলে শুধু রচনার চমৎকারিত্বে বাজিমাত করা যায় না। তা হলে ভারতচন্দ্র, সুইনবার্ন আর কিপলিঙ্‌ মহৎ সাহিত্যিক বলে অভিনন্দিত হতেন। এঁরা আ-কাটা হীরে কুঁদে কুঁদে বিচিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু রদ্যাঁর[৯] মতো পাথর কেটে দেবদানব সৃষ্টির দুর্লভ শক্তি এঁদের নেই।

---

৯ Auguste Rodin (1840—1917)—প্রসিদ্ধ ফরাসী ভাস্কর। পাথর কেটে তিনি যে সমস্ত মূর্তি নির্মাণ করেছেন তার খ্যাতি দেশজোড়া ; তাঁর নির্মিত মূর্তির ছাঁচ তৈরী করে তার থেকে মূর্তি ঢালাই করে য়ুরোপে অনেক দামে বিক্রয় হয়েছে। রদ্যাঁর মূর্তিশিল্পে বাস্তব মানুষের ছবি এবং নিথর পাথরের বুকে অপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য ও গতি ফুটে উঠেছে। দান্তের *Inferno* অবলম্বন করে তিনি 'The Gate of Hell' নামক যে বিরাট মূর্তি সৃষ্টি করেন, তার তুলনা নেই। পরবর্তিকালের ভাস্করগণ তাঁর রীতিকে ত্যাগ করে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করলেও তাঁকে এখনও অনেক মূর্তিশিল্পী গুরু বলে মানেন।

কথা উঠবে, তা হলে কি চোখঝলসানো ঘটনা আর রাজামহারাজা বীরপুরুষ ছাড়া সাহিত্যের নাটমঞ্চে আর কোন সাধারণ চরিত্রের প্রবেশাধিকার নেই ?—অবশ্য আছে। রিক্সাওয়ালাও মহাকাব্যের নায়ক হতে পারে। কিন্তু লৌকিক রিক্সাওয়ালা 'বিভাবনার' মধ্য দিয়ে শিল্পলোকে ঠাঁই পেলে সে আর তখন হীনবৃত্তিজীবী সাধারণ মানুষ থাকবে না, সামান্য মানুষও অসামান্য হয়ে উঠবে শরৎচন্দ্রের সাদামাঠা চরিত্রগুলোর মতো। মহৎ সাহিত্য ছোট মানুষের মধ্যেও মহৎকে দেখতে পায়—যেমন পেয়েছিলেন ডস্টয়ভস্কি।

যাঁরা রূপবাদী সমালোচক (Formal critic), তাঁরা অন্য কথা বলেন। তাঁরা সাহিত্যের প্রকাশের প্রকরণ বা expression-এর ওপর বেশি জোর দেন এবং বলেন, প্রকাশই সাহিত্য—Expression is literature. শুধু মহৎ বিষয়ের ওপরেই সাহিত্যগুণ নির্ভর করছে না, মহৎ বিষয় কী পরিমাণ শিল্পানুগ হতে পেরেছে তার ওপরেই যথার্থ সাহিত্যবিচার নির্ভর করছে। সুতরাং রচনা-প্রকরণ বা রীতিবিন্যাস অর্থাৎ গঠনশিল্প সাহিত্যের সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। জব্বলপুরে প্রচুর মর্মর পাথর আছে, তাই বলে তাকে কি কেউ তাজমহল বলে ? পাথর নামক বস্তুপিণ্ডকে শিল্পী কেটে চেঁছে ছুলে পালিশ করে নতুন শিল্পরূপ দান করেন। প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মতো সাহিত্যের রূপকর্ম বা Form-ই সাহিত্যকে সাহিত্য করে তোলে। এই 'ফর্ম'এর গুণে তুচ্ছ বিষয় সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠে এবং রূপকর্মের ত্রুটির জন্য মহৎ বিষয়ও নষ্ট হয়ে যায়। "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" কথাটা সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা যে অর্থেই বলুন না কেন, সাহিত্যবিচার মূলতঃ এই রীতিবিচার। নইলে 'মিসেজ ওয়ারেন্‌স্‌ প্রফেশন' (বার্নার্ড শ) নামক গণিকা-জীবনের নাটক কখনও উচ্চতর সাহিত্য বলে বিবেচিত হত না ; আবার শিল্পরূপের ত্রুটির জন্য শ্রীহর্ষ-রচিত 'নৈষধচরিত' আধুনিক পাঠকের রুচিকে পীড়িত করবে—যদিও তার বিষয়টি মহাকাব্যের অনুকূল। মধুসূদনের মহাকাব্য শিল্পরীতির জন্য মহাকাব্যের

কোঠায় স্থান পেল, কিন্তু হেমচন্দ্রের শিল্পবোধের ব্যর্থতার জন্য 'বৃত্রসংহার', সম্ভাবনা সত্ত্বেও, মহাকাব্য হতে পারল না।

রসবাদী সমালোচক বলবেন, সাহিত্যবিচারে বস্তু বা শিল্পরূপ—কোনটাই প্রধান কথা নয়। সাহিত্যপাঠের ফল—"স্বসংবিত্যানন্দ-চর্বণব্যাপার-রসনীয় রূপো রসঃ" (অভিনবগুপ্ত)—নিজের আনন্দময় সম্বিতের আস্বাদনরূপ একটি ব্যাপার। বস্তু বা শিল্পের কাজ হল সেই রসনিষ্পত্তিতে সাহায্য করা। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা প্রধানতঃ এই মতে বিশ্বাসী। য়ুরোপীয় সমালোচক রসের স্থানে সৌন্দর্যকে বসাতে চান। ভারতীয় মতের রসই হোক, আর য়ুরোপীয় মতের সৌন্দর্যই হোক, কাব্যের বস্তুগত উপাদান ও শিল্পরূপের সমবায়েই এই রস ও সৌন্দর্যের উৎপত্তি হয়, কাজে কাজেই সাহিত্যের বিষয়-বস্তু ও শিল্পরূপ হল রসনিষ্পত্তির সমবায়ী কারণ। রসবাদী সমালোচক দেখবেন যে সামগ্রিকভাবে শিল্পকর্মের মধ্যে রসোৎপত্তি হয়েছে কিনা। 'রস' নামক মানসিক ব্যাপারই সাহিত্যের পরিণাম বা ফলশ্রুতি। তাম্বুল সেবনের ফল যে অধর-রক্তিমা, তা পান চুন খয়ের সুপারি—কোনটার মধ্যে পৃথকভাবে নেই। এই উপাদান-গুলির সংমিশ্রণে রক্তিমার সৃষ্টি হয়। ঠিক তেমনি বস্তু-উপাদান বা শিল্পরূপই সাহিত্য নয়—এদের মিলনের ফলেই রসের উদ্বোধন হয়। এদিক থেকে রসবাদী সমালোচকের কথা যুক্তিসঙ্গত।

অবশ্য কথা উঠবে, রস না হলে কি সাহিত্য হয় না? রস বলতে আমরা সাহিত্যপাঠজনিত মানসিক আনন্দকে নির্দেশ করছি। কিন্তু এমন অনেক রচনা হতে পারে যার মধ্যে রসের পারিভাষিক ও সাধারণ--কোন আবেদনই নেই—তবু তা পাঠকের কাছে প্রীতিকর হয় কেন? আধুনিক কবিতার অনেক ক্ষেত্রেই রসনিষ্পত্তি বড় কথা নয়, অথচ তা চিত্তাকর্ষী। এর কারণ কি? মনে হয়, শুধু আবেগো-চ্ছল হৃদয়ানুভূতি নয়, বুদ্ধির দীপ্তিও আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে। মননের হীরকদ্যুতি—যা প্রধানতঃ আবেগধর্মী নয়, তাও কাব্যের বিষয় হতে পারে। তা নইলে এদেশে এবং ওদেশে সাম্প্রতিক কবিতা

এত জনপ্রিয় হয়েছে কেন? এই আধুনিক কবিতার মধ্যে উনিশ শতকী রোমান্টিকতা বা তার পূর্ববর্তী যুগের ক্লাসিক মানসভঙ্গী নেই—আছে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা মননগম্য চিত্তস্ফূর্তি। এই যে চকমকি পাথর ঠোকাঠুকির মতো বুদ্ধির চমক—এ রসোদ্রেক না করলেও বিস্ময়বোধ সৃষ্টি করে—এবং তাও কাব্যপদবাচ্য হয়; সুতরাং রসবাদী সমালোচনাই সাহিত্যবিচারের শেষ কথা নয়। বিশেষতঃ 'ডাডা'বাদ, সুররিয়েলিজম্, অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি দার্শনিক ও শিল্পসংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাহিত্যবিচারে যেভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে, তাতে রসবাদী সমালোচকের বিচারপদ্ধতিকে একমাত্র ও চূড়ান্ত রীতি বলে অনেকেই মেনে নিতে চাইবেন না।

সাময়িক পত্রের সমালোচক

সাময়িক পত্রই এখন বেদবাইবেল, পুরাণকোরান। একবার এক জনসভায় এক ধর্মপ্রাণ পাদ্রী শ্রোতাদের নরকভোগের ভয়াবহতা বোঝাচ্ছিলেন। ভাষায় যতটা ভয় আনা সম্ভব, তিনি ততটা ভয়ানক করে নরকচিত্র আঁকলেন। কিন্তু তাতে শ্রোতাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল না। তখন তিনি শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন; গম্ভীর স্বরে বললেন, "নরক এমন জায়গা যেখানে খবরের কাগজ নেই।" শোনামাত্র শ্রোতারা শিউরে উঠল। কথাটা 'পরিহাসবিজল্পিতম্' হলেও আজকের যুগে সাময়িক পত্রের প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যাবতীয় বস্তু সংবাদপত্রের স্তম্ভে উঠলে তবেই তার সার্থকতা। যেন বিশ্ববিধাতা সম্পাদক এবং সাময়িকপত্রের অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছুই করেন না।

আধুনিক যুগে সাময়িকপত্রের কৃপায় সমালোচনার একটা সুলভ প্রকাশ দেখা গেছে, সমালোচকেরও দায়িত্ব অনেকটা কমে গেছে। অবশ্য পশ্চিম দেশে সাময়িকপত্রের সমালোচকও কৃতবিদ্য ও রসিক এবং সাময়িকপত্রের সমালোচনাও যথার্থ

সাহিত্যবিচার। কিন্তু 'জার্নালিজম্' যেমন সাহিত্য নয়, তেমনি সাময়িকপত্রের সমালোচনাও বিশুদ্ধ সাহিত্যবিচার নয়। স্টীল, অ্যাডিসন প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীর রচনাকারেরা সর্বপ্রথম সাময়িক পত্রের সমালোচকরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। শয়ের প্রথম যৌবনের সাহিত্যজীবনের কথা সকলের মনে পড়বে। কিন্তু এখন সাহিত্যের বাজারে ছোটবড় মাঝারি রত্নের ভিড় জমেছে খুব; কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা নকল তা বাছাই করা জহুরীর পক্ষে দুষ্কর। বিশুদ্ধ সাহিত্যপত্রে বা সাময়িকপত্রের সাহিত্যসংখ্যায় সমালোচককে কিছু দায়িত্ব নিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়। কিন্তু দৈনিকের অনাদৃত কোণে সাহিত্যসমালোচনার নামে যা প্রকাশিত হয় তাকে 'মলাট সমালোচনা' নাম দেওয়াই ভাল। অর্থাৎ দৈনিকের সমালোচক নীর ত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন না। কোন প্রকারে বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, 'ছাপা ও বাঁধাই ভাল,' অথবা 'ভাল হত আরও ভাল হলে' এই ধরনের দুটো একটা নিরামিষ উক্তি করেই সাহিত্যবিচার সমাধা করেন—অন্ততঃ এদেশে। এইজাতীয় সমালোচনা সাহিত্যবিচারের মারাত্মক শত্রু। এর ফলে পাঠকের স্বাভাবিক রসবোধ ও বিচার-বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয় এবং সাহিত্যেরও ক্ষতি হয়—লাভ হয় শুধু প্রকাশকের।

সব শুক্তিতেই মুক্তা থাকে না, সাময়িকপত্রের সমালোচনাও সব সময়ে যথার্থ সমালোচনা হয় না। অসংখ্য ঝিনুক বিদীর্ণ করে একটি মুক্তা পেলে যেমন ডুবুরীর সমুদ্রাবতরণ সার্থক হয়, ঠিক তেমনি সাময়িকপত্রের স্বাদগন্ধহীন 'পুস্তকপরিচয়' পড়তে পড়তে যখন একটি রসিক বিচারকের সন্ধান পাওয়া যায় তখন সংবাদপত্রের পাণ্ডুর পত্র ঘাঁটা সার্থক হয়ে ওঠে।

চার

॥ সমালোচনার নানা প্রসঙ্গ ॥

একদা য়ুরোপে যাঁরা প্রথাবদ্ধ সত্যের বিরুদ্ধে নতুন সত্যদর্শনের কথা প্রচার করেছিলেন তাঁদের অনেককেই নিজ নিজ মাথাটি খোয়াতে হয়েছিল। ভারতেও যাঁরা আপ্ত বাক্যের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা কখনও নাস্তিক, কখনও পাষণ্ড, কখনও চার্বাক-বার্হস্পত্য বলে নিন্দিত হয়েছেন। সত্যসন্ধ যিশুখ্রীষ্ট অভিযুক্ত হলে বিচারক পন্টিয়াস পাইলেট তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, "What is truth?" যিশুর সত্যবাণী শুনে তিনি খুশী হয়ে বলেছিলেন, "I find in him no fault at all."[১] কিন্তু তবু তিনি যিশুর প্রাণদণ্ড দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ যিশুর ইহুদি স্বজনরাই তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চেয়েছিল। আবার অন্যদিকে ভারতবর্ষের মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' চার্বাক-পন্থীদের ভয়ানক নিন্দা করেছেন, তাঁদের মতের মধ্যে কিছুই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি।

সাহিত্যবিচারে দু-রকম বিচার-বিভ্রাট লক্ষ্য করা যায়। কখনও সমালোচকের সত্যদৃষ্টি না থাকায় বিচার্য গ্রন্থের মূল স্বরূপ থেকেই তিনি বঞ্চিত হন, কখনও বা পাইলেটের মতো মনে মনে সত্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েও বাইরের চাপে বা সংস্কারের বশে তাকে স্বীকৃতি দিতে কিছু কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। জনসনের প্রজ্ঞাদৃষ্টি তর্কাতীত; কিন্তু তাঁর কতকগুলি মানসিক ত্রুটিও ছিল। যে গ্রন্থকারের রচনার সঙ্গে তাঁর মতৈক্য ঘটত, তিনি তাকে সোচ্ছ্বাসে প্রশংসা করতেন; আবার ভাল না লাগলে বা সংস্কারে

১ *New Testament* (Book of St. John, Chap. XVIII)

বাধলে সেই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে দোজখে দেবার ব্যবস্থা দিতেন। তিনি পোপ এবং অ্যাডিসনের উচ্চ প্রশংসা করেছেন, কারণ তিনি যে ধরনের সাহিত্যাদর্শ ভালবাসতেন, পোপ-অ্যাডিসন ছিলেন তারই নকীব; অপরদিকে তিনি মিলটন এবং গ্রে-র প্রতি আদৌ সুবিচার করেন নি। মিলটনের রাজনৈতিক মত তাঁর কাছে ছিল অস্পৃশ্য, এবং গ্রের সঙ্গে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক বিরোধ। ফলে এই দুই সাহিত্যিকের গ্রন্থ বিচারে তাঁর রসদৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল। ম্যাথু আর্নল্ড্ দুহাত তুলে কীট্সের জয়ধ্বনি করেছেন, কিন্তু শেলীর ধর্মনৈতিক মত, দার্শনিক প্রত্যয় এবং তথাকথিত নীতিনিয়মহীন জীবনযাপনের জন্য রাগ্ বি- অক্সফোর্ডের নিষ্ঠাবান ছাত্র আর্নল্ড্ শেলীর প্রতি নির্মম হয়েছেন। আর্নল্ডের মতো শিল্পরসিক ব্যক্তি শেলী সম্বন্ধে দিবান্ধ হয়ে থাকবেন, এ কখনও সত্য হতে পারে না। তিনি 'মধ্যভিক্টোরীয়' সমাজনীতি ও জীবননীতির খ্যাপলা জালে শেলীকে ঢাকা দিতে পারেন নি বলেই তাঁর রুচি ও বিচারবুদ্ধি বিষিয়ে উঠেছিল। সমালোচনার ইতিহাসে এ রকম বিচার-বিভ্রাট কত যে ঘটেছে তার লেখাজোখা নেই। যাই হোক, আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে সমালোচনা সম্পর্কে এমন কয়েকটি সমস্যার কথা আলোচনা করব যা বাহ্যতঃ তত প্রয়োজনীয় মনে না হলেও সমালোচনার যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কার করতে হলে তার মূল্য স্বীকার করতে হবে।

সমালোচনা বিজ্ঞান, না শিল্প?

আধুনিক কালে আমরা বিজ্ঞানের রাজছত্রতলে বাস করছি; কাজেই বিজ্ঞান-মহারাজের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও একনিষ্ঠ অনুরক্তি থাকা প্রয়োজন। তাই আমরা পদার্থজগৎ ও 'অপদার্থ'- জগতের দুটি চেতনাকে বিজ্ঞানের নিরিখে বিচার করি। বিজ্ঞান পাকা গৃহিণীর মতো প্রত্যক্ষে বিশ্বাসী এবং সিদ্ধ সাধকের মতো নিরাসক্ত। গৃহিণীকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হয়, প্রত্যহের

প্রত্যক্ষ বস্তু নিয়ে কারবার করতে হয়। কাজেই তাঁকে রোমান্সের বাসর-সঙ্গিনীর ভূমিকা গ্রহণ করলে চলে না; সংসার চালানোর জন্য তিনি যা হাতের কাছে পান দরকার বুঝে তার কোনটিকে তাকে তুলে রাখেন, কোনটিকে বা বঁটি পেতে বানাতে বসেন। বিজ্ঞানও জগৎ ও জীবনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে জগৎ চালাবার ও বোঝবার জন্য কতকগুলি প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতার দ্বারা একটা 'নিয়মের রাজত্ব' আবিষ্কারের চেষ্টা করে। বিজ্ঞান দেখে, মাটির যা সত্য ও বৈশিষ্ট্য, জলের তা নয়; আবার বাতাসের স্বরূপ-লক্ষণও আলাদা। তবে এদের সকলের মধ্যে মোটামুটিভাবে নিয়মের ঐক্য আছে। বিজ্ঞান সেই ঐক্য আবিষ্কারে বদ্ধপরিকর। তার জন্য সে প্রত্যক্ষ-নিরীক্ষা, নিরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব এবং জগতের বিশৃঙ্খলাকে সেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানলব্ধ যুক্তিবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বিশেষ সত্য থেকে নির্বিশেষ সত্যে যাবার সিঁড়ি তৈরি করে। কাজেই বিজ্ঞানের প্রথমতঃ চাই একটা বৈদান্তিক নিঃস্পৃহতা, দ্বিতীয়তঃ চাই প্রত্যক্ষ বস্তুর ইন্দ্রিয়ময় চেতনায় বিশ্বাস (যতক্ষণ না তার বিপরীতটা মিলছে), তৃতীয়তঃ বিভিন্ন বস্তুচেতনাকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা, চতুর্থতঃ সে ঐক্যের পিছনে একটা যৌক্তিক পারম্পর্যের আবিষ্কার থাকবে।

শিল্প ও শিল্পীর কাজ অন্য। শিল্পী সর্বোপরি জগৎ ও জীবনের প্রতি আকৃষ্ট; এর ভালমন্দের দ্বারা আন্দোলিত—বিজ্ঞানের মতো তাঁর দৃষ্টি নিঃস্পৃহ নিরাসক্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ শিল্পের কাজ বিশেষের মধ্য দিয়ে নির্বিশেষে যাত্রা হলেও বিশেষই তার কাছে প্রধান। বিশেষ যুগের বিশেষ মানুষ রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বিশেষ রূপেই মনোমুগ্ধকর; আমরা রামায়ণ পড়ি কি জন্য ? পিতৃভক্তি, পাতিব্রত্য এবং সৌভ্রাতৃত্বের সিম্বল জানার জন্য, না রামায়ণের মধ্যে বিশেষ মানুষের যে ছবি আছে তাই উপলব্ধি করার জন্য ? উচ্চাশার কী নিদারুণ পরিণাম—শুধু এই নির্বিশেষ তত্ত্বটুকু জানবার জন্যই কি আমরা ম্যাকবেথ পড়ি ? শিল্প বিশেষের কথাই বলে—অবশ্য তা

শেষ পর্যন্ত নির্বিশেষেই নিয়ে যায়। তখন রামচন্দ্রকে আর ত্রেতাযুগাবতার বলে মনে হয় না; তিনি দেশকালের গণ্ডী কাটিয়ে যে কোন যুগেই হাজির হন। তৃতীয়তঃ শিল্পের কাজ বিশ্লেষণ নয়, শারীরতত্ত্ব নয়—সংশ্লেষণ, রূপনির্মাণ। বস্তু-উপাদানকে গ্রহণ করে শিল্পী নিজের কল্পনার বিদ্যুৎস্পর্শ দিয়ে জড়বস্তুকে মনোময় বস্তুপ্রত্যয়রূপে গড়ে তোলেন। এইটি হল শিল্পের সৃষ্টিশক্তি—সর্বপ্রধান লক্ষণ।

এই সমস্ত লক্ষণের পটভূমিকায় সমালোচনাকে স্থাপন করে কী মনে হয় দেখা যাক—সমালোচনা বিজ্ঞান, না শিল্প—science, না arts?

বিজ্ঞানের কিছু কিছু লক্ষণ সমালোচনায় অবশ্যই আছে। যেকোন বিচারপদ্ধতি মূলতঃ বৈজ্ঞানিক—সেই হিসেবে সমালোচনাও বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান যেমন নিঃস্পৃহ—আবিষ্কৃত সত্যের প্রতি কোন পক্ষপাত নেই, তেমনি সমালোচকের মনে ব্যক্তিগত ভাল লাগা মন্দ লাগার প্রতি অযথা ভক্তি থাকা ঠিক নয়। সমালোচকের কাজ সাহিত্য ও শিল্পের মূল্য নির্ণয়। কে না জানে আসামী-ফরিয়াদী কারো প্রতি বিচারকের পক্ষপাত সঞ্চারিত হলে বিচার শেষ পর্যন্ত বিড়ম্বনায় পর্যবসিত হয়? সমালোচক ব্যক্তিগত রুচি ও মানসিক প্রবণতার ঊর্ধ্বচারী না হলে তাঁর সাহিত্যবিচারপদ্ধতি তাঁরই ব্যক্তিত্বের রঙে রঙিন হয়ে পড়বে—জবাফুলের ছায়ায় রাঙা স্ফটিকস্তম্ভের মতো। সুতরাং সমালোচককে বৈজ্ঞানিকের মতো নিঃস্পৃহ হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সমালোচক প্রত্যক্ষ সাহিত্যের দৃষ্টান্ত থেকেই বিচারপ্রণালী নির্বাচন করবেন, সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন। বৈজ্ঞানিক যেমন যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে সত্যাবিষ্কারে সমর্থ হন, ঠিক তেমনি সমালোচকও নানা গ্রন্থ থেকে সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতি তৈরি করবেন। অ্যারিস্টট্ল তদানীন্তন গ্রীক মহাকাব্য পাঠ করে মহাকাব্যের গুণ ও বৈশিষ্ট্য ধরতে পেরেছিলেন। সমালোচনায় যে নিয়মাবলী ও আদর্শ গড়ে

উঠবে, তা মনগড়া থিওরি নয়, পূর্বতন ও সমকালীন সাহিত্য থেকেই সাহিত্যবিচারপদ্ধতি তৈরি হবে। তৃতীয়তঃ নানা গ্রন্থে ছড়িয়ে-থাকা এলোমেলো নিয়মকে ঐক্যবদ্ধ করাও সমালোচনার কাজ। পৃথিবীতে নানা জাতের মহাকাব্য আছে; যুগে যুগে তার রূপ ও রীতির বদল হয়েছে। কিন্তু নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সমস্ত মহাকাব্যের মধ্যে গঠনপ্রকৃতি ও স্বরূপলক্ষণগত মোটামুটি ঐক্য আছে। সেই বহু ও বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার ও পরিস্থাপনা সমালোচনার উদ্দেশ্য, এবং সমস্ত শিল্পবস্তুর উৎপত্তি ও বিকাশের মূলে একটা যৌক্তিক পারম্পর্য সর্বদা ক্রিয়াশীল—এই বিশ্বাস সমালোচনার বড় কথা। জগৎ ও জীবন যেমন আকস্মিকের ক্ষণিক সৃষ্টি নয়, এর পিছনে বহু যুগ ধরে যৌক্তিক ক্রমবিকাশ কাজ করে চলেছে, ঠিক তেমনি সাহিত্যের পিছনে 'অপূর্ববস্তু-নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা' যতই কাজ করুক না কেন, সমালোচনা কখনও দেশকাল ও যৌক্তিকতার প্রভাব ত্যাগ করতে পারে না, এবং তার ওপরেই শিল্প ও শিল্পসমালোচনা দাঁড়িয়ে আছে। এই-খানে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমালোচনার কৌলিক বন্ধন।

কিন্তু সমালোচনা শুধু কি 'শুষ্কং কাষ্ঠং', নিরুৎসুক নিরুচ্ছ্বসিত বৈজ্ঞানিক বোধ মাত্র? সমালোচক ল্যাবরেটরি ঘরে বন্দী বিজ্ঞানী নন! বিজ্ঞানের কোন সুচিরস্থায়ী রূপ নেই; আজ যা দুরূহ, দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব—কাল তা পড়া-পুঁথির মতো দূরে অনাদরে নিক্ষিপ্ত হবে। একদা মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব পণ্ডিতেরও মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল, এখন বালকেও তার তত্ত্ব বোঝে—এমন কি মাধ্যাকর্ষণের পরবর্তী তত্ত্বও তার কাছে অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু সাহিত্য শুধু একটা যুগের ব্যাপার নয়, হোমর একটা যুগের মহাকবি নন; তাঁর পরে নানা মহাকাব্য লেখা হলেও তাঁর স্থান অম্লান হয়ে আছে। সুতরাং সমালোচনা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নয়; যদি তাই হত তা হলে আজ কেউ অ্যারিস্টটল স্পর্শও করত না। কারণ অ্যারিস্টটলের পর সাহিত্য ও সাহিত্য-

তত্ত্বের কত নিয়ম বদলে গেছে। সাহিত্য যেমন পুরাতন হয় না, সমালোচনাও তেমনি পুরাতন পদ্ধতিকে পুরোপুরি ত্যাগ করে না। অনেক সময় হয়তো একযুগের তত্ত্ববাদ অন্যযুগে এসে কিছু বদলে যায়, কিন্তু আইনস্টাইন এসে যেমন নিউটনের অনেক তত্ত্বের সমাধি রচনা করলেন, তেমনি ক্রোচে এসে অ্যারিস্টট্‌লের নাভিশ্বাস তুললেন—এ কথা বলা যাবে না, যদিও অ্যারিস্টট্‌ল সাহিত্যের 'কি' ('what') নিয়ে এবং ক্রোচে কেমন করে সাহিত্য হয় ('how'), তাই নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সাহিত্যবিচারে কল্পনার ঠাঁই আছে; সমালোচনা বিশুষ্ক বৈজ্ঞানিক বিচার নয়। যা শুধু মনোজ নয়, হৃদয়েও যার স্থান আছে, তার ধরাবাঁধা কোন মাপকাঠি চিরকাল ধরে গৃহীত হতে পারে না। গ্রীক সমালোচনা এক নিয়ম মেনে নিয়েছিল, রোমীয় প্রাধান্যের যুগে তার সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটল; মধ্যযুগে আবার কিছু কিছু নূতনত্ব দেখা গেল। য়ুরোপীয় রেনেসাঁস ও আধুনিক যুগে সাহিত্যসমালোচনা নানা বৈচিত্র্য অবলম্বন করেছে। তাই বলে এ কথা বলা যাবে না যে, একমাত্র সুর্‌রিয়েলিজ্‌ম-ই ঠিক, আর সমস্ত বিচারপ্রণালী বরবাদ।

সমালোচনা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হলে নিয়মাবলী জানলেই সমালোচক হওয়া যেত; চাই কি, সমালোচনা শেখাবার পাঠশালাও স্থাপিত হত। কিন্তু শুধু শব্দার্থ জানলেই কবি হওয়া যায় না, অভিধান অধিগত করলেই কাব্যবোধ জন্মায় না। সেই রকম বাইরের দিক থেকে নিয়মকানুনের তালিম নিয়ে মোটামুটি সাহিত্য বোঝা যায়, কিন্তু অ্যারিস্টট্‌ল বা আনন্দবর্ধন হওয়া যায় না। সেই জন্য সেণ্ট্‌ বোভ সমালোচনাকে বলেছেন, "an art, requiring a clever artist."

সমালোচনার পশ্চাৎপটে কিছু বৈজ্ঞানিকতা থাকলেও, সাহিত্য-বিচার মূলতঃ শিল্পবস্তু। শুধু শারীর-বিশ্লেষণ আর অস্থি-পরিসংখ্যান সমালোচনার প্রধান কাজ নয়। সাহিত্যবিচারে খানিকটা বৈজ্ঞানিক

বিশ্লেষণের প্রভাব থাকা প্রয়োজন, তা অবশ্য মেনে নেওয়া যেতে পারে। সাহিত্যবিশ্লেষণেরও একটা রক্তমাংসের লাবণ্য আছে, সমালোচকের মধ্যেও স্রষ্টার স্বরূপ লুকিয়ে আছে। "একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুই জনে"—তাই রসশিল্পী ও রসপ্রমাতা—একের সঙ্গে অপরের আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। সমালোচক শিল্পী-সাহিত্যিককে নতুন করে সৃষ্টি করেন, সমালোচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের পুনর্জন্ম হয়। এলিয়ট না এলে ড্রাইডেন কোন্ অখ্যাত কোণে মুখ লুকিয়ে থাকতেন। সমালোচক যুগে যুগে পুরাতনের মধ্যে নতুন রস ও রূপের সন্ধান পান। বিজ্ঞানের সত্যের মতো সাহিত্যের সত্য একবার জানলে পুরাতন হয় না, বিভিন্ন যুগে বরং তার নানা রূপ ফুটে ওঠে। সুতরাং সমালোচকের কাজ দুরূহ। শুধু বিজ্ঞানীর কাজ হলে তিনি *a priori*-র পথ ধরে কতকগুলো কারণ নির্দেশ করে কাব্যে আরোহী যুক্তিমার্গ (Inductive argument) অবলম্বন করতেন এবং কিছু নিয়মকানুন বেঁধে দিয়ে কাজ শেষ করতেন। শুধু শিল্পী হলে তিনি সাহিত্যবিচারে যুক্তি-তর্কের পথে না গিয়ে শুধু লাবণ্যনির্দেশ এবং ব্যক্তিগত রসরুচির আদর্শে সাহিত্যের ধ্যান ও আরতি করতেন। কিন্তু সমালোচনা যুগপৎ বিজ্ঞান ও শিল্প। বিজ্ঞানের বস্তুজ্ঞান, যুক্তিক্রম, বিশেষের সাহায্যে নির্বিশেষের প্রতিষ্ঠা এবং শিল্পের সৃষ্টিক্রম, রস ও সৌন্দর্যের পরিচয় থাকা চাই। সমালোচনায় বিজ্ঞানের প্রভাব না থাকলে অস্‌কার ওয়াইল্ডের রসবিচারই একমাত্র মুখ্য হয়ে থাকত এবং সমালোচনায় শিল্পের প্রভাব না থাকলে সাহিত্যবিচারে এবং জীববিজ্ঞানে কোন তফাত থাকত না। তাই আধুনিক কালে সমালোচনায় বিজ্ঞানের বস্তুসচেতন পরীক্ষা ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা এবং শিল্পের রসসৌন্দর্য ও শিল্পীমানসের অভিপ্রকাশ—উভয়ই তুল্যমূল্য প্রভাব বিস্তার করেছে। সত্যিকারের সমালোচকের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্প দুয়েরই যথোপযুক্ত সমাবেশ প্রয়োজন; তা না হলে সাহিত্যবিচার একদেশদর্শী হয়ে পড়বে।

সমালোচনা কি নতুন সৃষ্টি ?

প্রশ্নটি আধুনিক কালে প্রশ্নের আকারে দেখা দিয়েছে। অতীতে সমালোচনা ছিল বিচার, সমালোচক ছিলেন ন্যায়াধীশ; তিনি কবিকৃতির ব্যাখ্যা করতেন, নিন্দা করতেন, প্রশংসা করতেন; কিন্তু বিচার্য সাহিত্যের সঙ্গে সমালোচনার যে মৌলিক প্রভেদ, সে বিষয়ে সে যুগের লেখক, পাঠক ও সমালোচক কারো সন্দেহ ছিল না। এ যুগেও অনেকে বিশ্বাস করেন, সমালোচনা যেন second-hand দোকানের জিনিস। শিল্পী জীবন দেখে বা জীবন থেকে সাহিত্যের জন্ম দান করেন। সমালোচক সেই শিল্পের আবার বিচার ব্যাখ্যা করেন; সুতরাং তাঁর অবলম্বন—কবির উচ্ছিষ্ট, মৌলিক সৃষ্টি নয়। অলাবুলতার মঞ্চারোহণের মতো সমালোচনা সাহিত্যাবলম্বী; কবিসাহিত্যিকের সৃষ্টিকে অবলম্বন করেই সমালোচকের জীবন। কাজেই সমালোচনা সাহিত্যের মতো "সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ" নয়; ওটা হল দ্বিতীয় সৃষ্টি অথবা মূল রসবস্তুর ব্যাখ্যা মাত্র—মৌলিক সৃষ্টি নয়। তবে কোন কোন সমালোচকের এমন ধীশক্তি এবং রসবোধের উপর অবাধ অধিকার থাকে যে, তাকে second-hand জিনিস বলে মনে হলেও তার যথার্থ স্থান curio shop-এর দুর্লভ কোণে। বাস্তবিক সমালোচকের নিজস্ব কোন স্বাধীনতাই নেই; তাঁকে প্রতিপদে মূল গ্রন্থকে অবলম্বন করে চলতে হয়। অবশ্য তিনি সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড ধরে বিচার্য গ্রন্থের মধ্যে অশেষ ভুলত্রুটি আবিষ্কার করতে পারেন, লেখককে তীব্রভাষায় নিন্দাও করতে পারেন, কিন্তু তাঁর বিচার্য গ্রন্থকে ছাড়িয়ে যাবার উপায় নেই। আসামীই হোক আর ফরিয়াদীই হোক, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে-থাকা ব্যক্তিটি যেমন বিচারের একমাত্র লক্ষ্য, বিচারক উকিল উপলক্ষ মাত্র,—সেই রকম সাহিত্য-বিচারে সাহিত্যই লক্ষ্য—সমালোচক উপলক্ষ মাত্র। নদী তীরের বন্ধন স্বীকার করে নিয়েই সমুদ্রাভিসারে যায়; তটের বন্ধন ছাড়ালে তার আর সমুদ্রে যাওয়া হয় না, মাঝপথে বদ্ধ হয়ে বাঁওড়-হাওড়ে

পরিণত হয়; তেমনি সমালোচককেও বিচার্য গ্রন্থের চৌহদ্দির মধ্যে বিহার করতে হয়, বাইরে থেকে নিয়মকানুন আমদানি করলেও তিনি কোনক্রমেই শিল্পবস্তুকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেন না। সুতরাং সমালোচকের একমাত্র কাজ—সর্বপ্রকারে বিচার্য গ্রন্থকে অনুসরণ করতে হবে, দরকার হলে লেখক-পাঠককে পথ দেখাতে হবে, ভুলপথ থেকে সরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু সাহিত্য ও সাহিত্যিককে ছাড়িয়ে অন্যত্র যাবার উপায় নেই।

আধুনিক কালে সমালোচনার সাহিত্যনির্ভর হয়ে থাকার দিন যেন ঘুচে গেছে। এখন আর পাঁচটা সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের মতো সমালোচনাও সৃষ্টিশীল হয়ে উঠছে। অর্থাৎ এখন সমালোচনা শুধু সাহিত্যের খিদমতগারি করে না, সে নিজেও সৃষ্টিক্ষম শিল্পবস্তু হয়ে উঠছে। সে যুগেও লংগিনাসের 'sublime' সংক্রান্ত রচনায়[২] শুধু শুষ্ক আইনকানুন বিবৃত হয়নি, তাতে রীতিমতো রসসঞ্চার হয়েছিল। শেলিং, আর্নল্ড, ক্রোচে, কার্লাইল, এলিয়ট—এঁদের সমালোচনা কি কেবল দোষগুণের তালিকা মাত্র? এই সমস্ত গ্রন্থের আরও একটা সাহিত্যিক আবেদন আছে। তাঁদের মত ও মন্তব্যের বৈশিষ্ট্য দার্শনিকতা, মানসিক উচ্চতা, বিস্ময়কর মনীষা—সর্বোপরি রচনার শিল্পলক্ষণ এই সমস্ত সমালোচনাকে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা শুধু শুষ্ক নীরস তথ্যতালিকা আর দোষগুণের নামাবলী নয়; তাঁদের সমালোচনার মধ্যে জীবনলব্ধ সত্য ও শিল্পের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। এমন কি প্রাচীন যুগের অভিনবগুপ্ত-আনন্দবর্ধনের সমালোচনার বহুস্থল শিল্পলক্ষণাক্রান্ত সাহিত্য হয়ে উঠেছে—একথা বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করবেন। আজকের দিনে সমালোচনার এই রকম সীমাসম্প্রসারণ ঘটেছে। ম্যাথু আর্নল্ড শেলী-কীট্স-মিলটন

২ পঞ্চম অধ্যায়ে পাশ্চাত্য সমালোচনার ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সম্বন্ধে কি বলেছেন, সেটাই একমাত্র জ্ঞাতব্য নয়,—কেমন করে বলেছেন, তাও সমান মূল্যবান। শেলী-কীট্‌সকে অবলম্বন করে আর্নল্ডের মানসিক প্রবণতা, এলিয়টের ক্লাসিক সাহিত্যানুশীলন, রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অবগাহন, মোহিতলালের বাঙলার জীবন ও সাধনার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া—এসব উচ্চতর সাহিত্যগুণের অপেক্ষা রাখে। তবে এ কথা ঠিক, আর্নল্ড, রবীন্দ্রনাথ, এলিয়ট, মোহিতলাল—এঁরা তো শুধু বুদ্ধিবাদী বিচারক নন—এঁদের প্রত্যেকে কবি, সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার অধিকারী। সুতরাং প্রতিভার যে অংশ কাব্য রচনা করে, সেই অংশই কিছু পরিবর্তিত আকারে এঁদের সাহিত্যবিচারেও আত্মপ্রকাশ করেছে।

সমালোচক কখন সৃষ্টিশীল হয়ে পড়েন?—যখন তিনি শুধু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হন না, বরং লেখককে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'এই রকম হলে আরও ভাল হত।'—তখন তিনি আর ভাষ্যকার হয়েই কাজ শেষ করেন না, লেখকের সমপর্যায়ে উঠে স্রষ্টার গৌরব লাভ করেন, একটা বিশেষ রূপ ও রীতির নির্দেশ দেন, বিশ্লেষণরীতি ত্যাগ করে সাংঘটিক সর্বাবয়ব মূর্তি মনে মনে কল্পনা করে নেন। তাই সমালোচকও মাঝে মাঝে শিল্পীর মতো স্রষ্টা হয়ে ওঠেন। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সমালোচক শুধু ব্যাখ্যাকার নন, তিনিও সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন। তাই য়ুরোপের অনেক সমালোচনা শুধু *Literature of Knowledge* নয়, তার অনেকটা *Literature of Power*—রসের সাহিত্য, এবং বিশুদ্ধ সাহিত্যবিচারের আদর্শেই তা বিচার্য। আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' শুধু মল্লিনাথের পুনরাবৃত্তি নয়, একটা নতুন সৃষ্টি। এলিয়টের বহু সমালোচনা সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার বিস্ময়কর উদাহরণ হয়ে আছে। বাঙলা সাহিত্যের উত্তর-রবীন্দ্র পর্বে নখাগ্রে গণনীয় এমন সমালোচক আছেন, যাঁরা সমালোচনাকে স্কুলঘরের অন্ধকূপ থেকে রক্ষা করেছেন এবং বিশ্বভারতীর সঙ্গে বঙ্গভারতীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে সমালোচনাকে রসিকজনের

আমদরবারে নিয়ে গেছেন। অধুনা সমালোচনাও রসসাহিত্যের পর্যায়ে উঠেছে এবং য়ূরোপের 'creative criticism' বা 'constructive criticism' সমালোচনাকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছে।

যাঁরা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ভক্ত তাঁরা কিন্তু এই creative criticismকে বরদাস্ত করতে পারেন না। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

আলঙ্কারিকদের এই কাব্য-বিশ্লেষণ যে আধুনিক constructive criticism, 'গঠনমূলক' সমালোচনায় অভ্যস্ত পাঠকের মনে ধরবে না, তা বেশ জানি, কিন্তু আলঙ্কারিকেরা কাব্য নিয়ে কবিত্ব করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ওর অর্থ ও সার্থকতা তাঁরা বুঝতেন না। কাব্যের গাঢ় রাগকে সমালোচনার ফিকে রঙে এঁকে কার কি হিত হয় তা তাঁদের বুদ্ধির অতীত ছিল। অধিকাংশ constructive criticism যে হয় কাব্যের রসকে রসহীন বাক্যের জল মিশিয়ে পাতলা করে পাঠকদের সামনে ধরা ; না হয়, কাব্যের 'ইমোশনকে' সমালোচনার sentimentalism-এর একটা উপলক্ষ্য করা—একথা 'আধুনিকতা'র ঠুলি, যা আজ বাদে কালই পুরাতন বলে গণ্য হবে, তা একটু খুলে ফেললেই হৃদয়ঙ্গম হবে। আলঙ্কারিকেরা বুঝেছিলেন কাব্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ বুদ্ধির ব্যাপার। কাব্যের রস, দরকার হলে পাতলা করে পাঠকদের গিলিয়ে দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়।" (কাব্যজিজ্ঞাসা—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত)

অবশ্য লেখক-কথিত constructive criticism এবং য়ুরোপে বিশেষ খ্যাত creative criticism-এর মধ্যে তফাত আছে। Construction ও creation-এ যে তফাত—সেই তফাত। Construction বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের সমবায়ে গড়ে-ওঠা যন্ত্রধর্মিতা, mechanical ; অপরদিকে creation হল গোটাসৃষ্টি। অর্থাৎ construction হল নির্মাণ, creation হল সৃষ্টি। শেকস্‌পীয়রের constructive criticism-এর অর্থ হল শেকস্‌পীয়রকে আইনানুগ যন্ত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা ও পুনর্নির্মাণের দুশ্চেষ্টা ; অপরদিকে creative

criticism হল শেকস্‌পীয়রের সঙ্গে সমালোচকের মৈত্রীবন্ধন, কবিসৃষ্টিকে নিজ সৃষ্টি করে নেওয়ার দুঃসাধ্য সাধন। সৃষ্টিশীল সমালোচনা তরল 'পানকরস' নয়, এই জাতীয় বিচারপদ্ধতি সাহিত্যকে তরল করে দেয় না, বরং নানা মনে তার নানা তাৎপর্যকে নতুন করে সৃষ্টি করে। আধুনিক কালের সমালোচনা প্রায়ই এই সৃষ্টিমূলক রীতির দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছে, এবং এর ফলে সমালোচনা সব সময়ে লেখকের নির্দিষ্ট গণ্ডী অবলম্বন না করে তাঁর সঙ্গে নতুন পথে বাহি হচ্ছে। এলিয়টের ড্রাইডেন এবং উনিশ শতকী রোমান্টিক সমালোচকের ড্রাইডেন এক ব্যক্তি নন। রবীন্দ্রনাথের মেঘদূতের সমালোচনা এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মেঘদূত আলোচনা এক জিনিস নয়—যদিও দুটিই সৃষ্টিমূলক আলোচনা—creative criticism! অধুনা তাই সাহিত্যবিচার আর স্মৃতিসংহিতার শাসন বা আদর্শলিপির দাগাবুলনো না হয়ে সাহিত্যরসের মতোই নতুন উপলব্ধিতে পরিণত হতে চলেছে। অবশ্য এর একটা কানাগলি আছে যেখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ নয়।

এই জাতীয় সৃষ্টিমূলক সমালোচনা সুখপাঠ্য সন্দেহ নেই, লেখককে পাঠকের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে বন্ধন করে, তাও ঠিক, —কিন্তু এর ফলে পাঠক মূল গ্রন্থ পাঠে উৎসাহী হবে না, সমালোচনা থেকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের রস আহরণ করে তার রসের তৃষ্ণা মিটে যাবে। কেউ যদি শেক্‌সপীয়রের সমালোচনা পাঠ করে এভন-তীরবাসী রাজহংসের পক্ষবিধূনন শুনতে অভিলাষী না হয়, কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' সমালোচনা পড়ে কালিদাসকে দূর থেকে প্রণাম নিবেদন করে, তা হলে সেই ধরনের পাঠককে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি? আধুনিক সৃষ্টিশীল বা গঠনমূলক সমালোচনার এই রকম একটা বিপদ আছে, তা লেখক, পাঠক ও স্বয়ং সমালোচকেরও প্রণিধান করা কর্তব্য।

সমালোচক, শিল্পী ও পাঠক

গ্রীক পুরাণের গল্পে আছে: থিব্‌স্‌ নগরের বাইরে পাহাড়ের ওপর স্ফিংক্‌স্‌ (Sphinx) রাক্ষসী বসে থাকত; মাথাটা তার মেয়ের মতো, চেহারায় সিংহের আদল, আবার দুখানা পাখাও ছিল। সে পথের পথিককে প্রশ্ন করত—পৃথিবীর কোন প্রাণী সকালে চার পায়ে চলে, দুপুরে দুপায়ে আর সন্ধ্যে বেলায় তিনপায়ে? যে উত্তর দিতে পারত, তাকে সে ছেড়ে দিত; এই হেঁয়ালির যথার্থ উত্তর দিতে না পারলে সে তাকে উদরস্থ করে ফেলত। এমনি করে সে বহু পথিকের প্রাণসংহার করেছিল। রাজা ঈডিপাস এই রহস্যের যথার্থ উত্তর দিয়ে বলেছিলেন—এই প্রাণীটি হল মানুষ। প্রথমে শৈশবে সে হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, যৌবনে দুপায়ে ভর দিয়ে চলে, আর জীবনসায়াহ্নে দুটি পা আর একটি লাঠি মোট তিনটি পায়ের ওপর ভর দিয়ে চলে। এইভাবে হেঁয়ালির যথার্থ সমাধান হলে স্ফিংক্‌স্‌ রাক্ষসী পরাভূত হয়ে প্রাণত্যাগ করে।

সমালোচক, সাহিত্যিক ও পাঠকের সম্পর্ক কতকটা যেন পথিক ও ঈডিপাসের মতো। সাহিত্য কারুকার্যের মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবনের কতকগুলি স্বরূপ ফুটিয়ে তোলে যা গভীরতর জীবনসমস্যা থেকে উত্থিত। শিল্পী ও সাহিত্যিক যুগ যুগ ধরে ঐ স্ফিংক্‌সের মতো পথের ধারে বসে আছে এবং পথের পথিককে কতকগুলো প্রশ্ন করে যাচ্ছে। সাধারণ পাঠক সব সময়ে তার জবাব দিতে পারে না; তখন ঈডিপাসের মতো কোন বিচক্ষণ সমালোচক এসে সাহিত্যিক-স্ফিংক্‌সের প্রশ্নের সমাধান করেন—অবশ্য তাতে সাহিত্যিক-স্ফিংক্‌স্‌ তনু ত্যাগ না করে উৎফুল্ল হন। সমালোচকের নিজের আনন্দের চেয়ে পাঠকের সঙ্গে লেখকের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই তাঁর প্রধান কাজ। শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির তাৎপর্য নির্ণয় করেন সমালোচক, তার দোষগুণ নির্ধারণ করেন তিনিই। তাঁর দ্বারাই সাহিত্যের মূল্য নির্ণীত হয়। শিল্পীর শিল্প-সৃষ্টি বা গ্রন্থকারের রচনা সম্পূর্ণ হলে তা আর স্রষ্টার রইল

না। "আমার সে নয়, সবার সে আজ" বলেই তিনি নিজ রচনার স্বত্বস্বামিত্ব ত্যাগ করে বৈদান্তিক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন। তখন সে সাহিত্য বিশেষভাবে পাঠকের। পাঠক তা থেকে নিজ নিজ প্রবণতা অনুসারে আনন্দ সংগ্রহ করে থাকে। ছাপাখানার আগের যুগে কেবল গুণবান গ্রন্থ এবং ভাগ্যবান লেখক পাঠকসমাজে প্রচার লাভ করতেন। এখন কিন্তু গণতন্ত্রের দৌলতে মধ্যম রকমের শিক্ষিত ব্যক্তিও সাহিত্য বুঝবার এবং বিচার করবার অধিকারী। অপরদিকে অসংখ্য গ্রন্থের মুদ্রণ চলেছে, ভাল মন্দ হাজারো কেতাব নিত্যই মুদ্রিত হচ্ছে। প্রকাশক নামক তিমিঙ্গিল ওত পেতে বসে আছে। সুতরাং 'ক্রেতা সাবধান'। দিশেহারা পাঠক তো সমালোচকের সহায়তা চাইবেনই; কেননা আধুনিক বৈশ্যযুগে কে-ই বা কাঞ্চন দিয়ে কাচ কিনতে চায়? সমালোচককে বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে লেখককের সৃষ্টি যাচাই করে পাঠকের তহবিল বাঁচাতে হয়, সুতরাং সমালোচক লেখক ও পাঠকের মধ্যস্থ হয়ে মূলতঃ পাঠকের পক্ষ নিয়ে থাকেন, পাঠকের বিচারবুদ্ধি ও রসোপোভোগের প্রবণতাকে যথার্থ পথে চালনা করেন। এমনি করে লেখক, পাঠক ও সমালোচকের যৌথ চেষ্টার ফলে সাহিত্যসৃষ্টি ও বিশ্লেষণ চলে।

পাঠক দেখে, সমালোচকের ক্ষমতা প্রশংসনীয় হলেও দৈবকৃপা-লব্ধ নয়; পাঠকও স্বকৃত চেষ্টার দ্বারা সমালোচনায় ব্রতী হতে পারে। এমন কি প্রত্যেক পাঠক একই সময়ে পাঠক ও সমালোচক। কোন বই বার বার পড়তে তার কেন ভাল লাগে—এই প্রশ্ন যখনই তার মনে উঠল, তখনই সে বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণের দ্বারা আক্রান্ত হল। তখন সে অজ্ঞাতসারে সমালোচকের কাজ করে চলল। কিন্তু এই অজ্ঞাতসারে সমালোচনা করার প্রবণতা বাদ দিলেও যে কোন সহজ বুদ্ধির পাঠক গ্রন্থবিচারের ক্ষমতা রাখে; যখন সে মুগ্ধভাবে কোন গ্রন্থের রস উপভোগ করে তখনও তার অন্তর্লোকে বিচার-বিশ্লেষণের প্রবণতা সংগুপ্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে, পরে অনুকূল

আবহাওয়ায় তার মনের চোরা কুঠুরি থেকে বিশ্লেষণপ্রবণতা বেরিয়ে আসে।

পাঠক শুধু সমালোচকই নয়—সময় সময় সে আবার স্বয়ং লেখক হয়ে ওঠে। বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণবিরহে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' জপতে জপতে কৃষ্ণময়ী হয়ে গেলেন—"মাধব মাধব সুমরইত সুন্দরী ভেলী মাধাই।" কোন পাঠক যখন কিছু পড়ে তখন সে লেখকের নির্দিষ্ট পথেই চলাফেরা করে বটে, কিন্তু সে লেখকের বক্তব্যকে নিজের করে নেয়, এবং সে নিজেই স্রষ্টা হয়ে ওঠে; তার কল্পনা তাকে লেখকের নির্দিষ্ট পথ থেকে দূরে দূরান্তরে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ শৈশবে 'বর্ণপরিচয়ে' "জল পড়ে পাতা নড়ে" পড়তে পড়তে জাতিস্মর হয়ে উঠেছিলেন। সামান্য একটা বাক্য একটা সাধারণ সত্যকে বিবৃত করছে—এই মাত্র। কিন্তু একদিন বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্তে এই পঙ্‌ক্তিটাই 'মেঘদূতের' মতো নববর্ষার মেঘমেদুর বাণী বয়ে এনেছিল। যখন শেকস্‌পীয়রের 'ওথেলো' পড়ি, তখন আমরা মহাকবির রচনার মধ্যে এমনভাবে ডুবে যাই যে, মাঝে মাঝে মনে হয়—এ ম্যুর আমারই সৃষ্টি। সুতরাং গ্রন্থপাঠের ফলে পাঠকের মধ্যে অজ্ঞাতসারে বিচারপ্রবণতা ক্রিয়া করলেও কোন কোন গ্রন্থ তার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে এবং কাব্যে বর্ণিত 'বিভাব'গুলিকে পাঠক অনেকটা নিজের কল্পনার দ্বারা নতুন করে সৃষ্টি করে। সমালোচকের এতটা মুক্ত-পক্ষ স্বাধীনতা নেই; তাঁকে লেখকের গ্রন্থ ধরে কল্পনায় যথেচ্ছা ভেসে গেলে চলবে না, তা হলে তাঁর সাহিত্যবিচার বিচার-যুক্তিবর্জিত ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস হয়ে উঠবে।

মাঝখানে রয়েছেন লেখক গ্রহসনাথ সূর্যের মতো, আর তাঁর দুপাশে রয়েছেন পাঠক ও সমালোচক। লেখককে ছাড়িয়ে উঠবার কারো সাধ্য নেই—না পাঠকের, না সমালোচকের। পাঠক লেখকের বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে অবগাহন করে নতুন কলেবর লাভ করতে পারে, লেখকের রচনাকে নিজের মতো করে গ্রহণবর্জন

করে নিতে পারে—কিন্তু লেখকের সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যাবার ক্ষমতা কোন পাঠকের নেই; তেমনি সমালোচক প্রয়োজনস্থলে লেখকের ওপর গুরুমশায়গিরি করলেও লেখকের প্রদর্শিত পথ ধরেই তাঁকে চলতে হবে। ট্রেনের গতিবেগ যতই বেড়ে যাক, তাকে লোহার দুখানা রেল ধরেই চলতে হবে; তার কি অটোমোবাইলের মতো যথেচ্ছাগমনের স্বাধীনতা আছে? সেই রকম সাহিত্যবিচারে বর-বধূ হল পাঠক ও লেখক। একজন বলে—"তুভ্যমহং সম্প্রদদে"; তোমাকে আমি দিলাম। আরেকজন হাত পেতে তা গ্রহণ করে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে পুরোহিত আর ঘটক আদানপ্রদানকার্য সমাধা করে দেয়। তারপর বরবধূর গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেলে ঘটক-পুরোহিতের আর কোন কাজ থাকে না—একমাত্র দক্ষিণা আর ঘটকবিদায় ছাড়া!

কোন এক সমালোচক বলেছেন, সূর্য যেমন আলোর আধার, আর সমস্ত উপগ্রহ সূর্য থেকে আলোকের আশীর্বাদ লাভ করে, তেমনি "They (অর্থাৎ সমালোচক) are the satellites which move around the poet, illuminating, transfiguring, distorting".[৩] কথাটি মূল্যবান। সমালোচক বিচারক হয়ে বসলেও মানুষের যেমন সাড়ে তিনহাত দেহটা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই, তেমনি সমালোচকেরও যা কিছু বক্তব্য, কটূতিক্ত যাই হোক না কেন, তা বিচার্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে ঘিরেই উৎক্ষিপ্ত হবে। এ বিষয়ে বরং পাঠকের কিছু স্বাধীনতা আছে; কারণ পাঠকচিত্ত বড় একটা বুদ্ধির দাসত্ব করে না—যতটা করে কল্পনার আনুগত্য; আর কল্পনার মূল কথাই হল বস্তুকে কেন্দ্র করে বস্তু থেকে স্বাধীনতা। কাজেই পাঠক লেখককে নূতন করে সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু সমালোচকের পাঠকের মতো নতুন সৃষ্টি করার স্বাধীনতা নেই। তা না থাকলেও অনেক সময় পাঠকের কল্পনা-

৩ H. J. C. Grierson—*Criticism and Creation*

শক্তি তীক্ষ্ণ থাকে না, বুদ্ধিবৃত্তি থাকে না সজাগ হয়ে। সে সব সময়ে লেখকের স্বরূপ অধিগত করতে পারে না। তখন তাকে সমালোচকের দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু সমালোচকের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার সাহায্যে একবার চোখ খুলে গেলে আর তার সমালোচকের সাহায্য দরকার হয় না—এ যেন গাঙ পার হয়ে খেয়া মাঝিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর মতো। তবু সমালোচকের শ্রদ্ধার আসন কেউ অস্বীকার করবে না। পুরাকালের প্লেটো-ভরতমুনি থেকে আধুনিক রিচার্ডস্‌-রীড পর্যন্ত সকলেই গুণকর্মানুসারে সাহিত্যিক ও পাঠকমহলে বিশেষ খ্যাতি পেয়ে আসছেন এবং আগামীকালও মল্লিনাথের দল যে সহজে নিজ নিজ অধিকার ছেড়ে দেবেন, তা মনে হয় না।

কোন কোন গ্রন্থ দীর্ঘজীবী হয় কেন ?

চিরজীবিত্ব মানুষের লক্ষণ নয়, মানুষের সৃষ্টিরও নয়। দেশ-কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ মানুষ, তার সমাজ-সংস্কার আর তার নানা প্রত্যয়। তাই সাহিত্য-শিল্পকলারও একটা কালপরিমিতি আছে যা দেশে দেশে পরিবর্তনধর্মী। এক যুগে যা পাঠকচিত্তকে উদ্দীপিত করে তোলে, আর এক যুগে তার চিহ্নমাত্রও থাকে না। মানুষের লেখার ইতিহাসেরও আগে সাহিত্যের আরম্ভ এবং লেখা সৃষ্টির পর থেকে মানুষের মৌখিক ও 'শ্রৌত' সাহিত্য আখরের বন্ধন স্বীকার করেছে। সব লেখা যদি বাচত এবং আমাদের চোখের সামনে বিরাজ করত, তাহলে কী ভয়ানক কাণ্ডই না হত! মানুষের সজীব কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গিয়ে শুকনো কাগজের নীরস খসখস ধ্বনি জীবনসঙ্গীতের হার্মনি নষ্ট করে দিত। মহাকাল বিস্মৃতির সম্মার্জনী নিয়ে অপেক্ষা করছেন; যা বিস্মরণের যোগ্য, তাকে তিনি জীবনধারণের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিচ্ছেন।

তবু প্রাচীন সাহিত্যের অনেক কিছু এখনও বেঁচে আছে, কেউ সশরীরে, কেউ স্মৃতির জাদুঘরে, কেউ-বা পড়ুয়া গবেষকের তথ্য-

স্তূপে। কেন এমন হয়? কেন ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস, হোমর-দান্তে-শেকস্‌পীয়র চিরকাল বেঁচে আছেন, কেনই-বা তাঁদের সম-ব্যবসায়ীরা লুপ্ত হয়ে গেছেন?

কেন কোন কোন বই বাঁচে—এর সোজা জবাব—জীববিজ্ঞানের চূড়ান্ত কথা—Survival of the fittest; যার চারযুগে অমর হবার সারস্বত বরপ্রাপ্তি হয়েছে সে-ই বাঁচে। অর্থাৎ যে সাহিত্য শুধু যুগবাণী নয়, যাতে দেশকালনিরপেক্ষ আরও একটা বড় কথা আছে—যা সবযুগেই মানুষের মনের সঙ্গে সজীব সংযোগ রক্ষা করতে পারে, তারই দীর্ঘজীবী হবার শক্তি আছে। যেমন জীববিজ্ঞানে দেখা যায়, যে প্রাণী পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পেরেছে, সে-ই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। 'Struggle for existence' (রসিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, 'সত্তা রক্ষার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি') যেমন জীবনের ধর্ম, তেমনি শিল্পকলারও ধর্ম। যে সাহিত্য শুধু একযুগের মানুষকে নয়, পরের যুগের সকলকেও পরিতৃপ্ত করতে পেরেছে, দেশকাল-নিরপেক্ষ বিশ্বমানব যার মধ্যে মানবজীবনের চিরকালীন রূপ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে—সমালোচনার দাক্ষিণ্য না জুটলেও সর্বকালের পাঠক তাকে শিরোপা দেবে। এক যুগে যা অতিশয় সজীব, আত্মঘোষণাপরবশ—পরের যুগে তার বিবর্ণ কঙ্কালটাই শুধু পড়ে থাকে, তারপর বিস্মৃতির ঘুণ তার শেষ কৃত্য করে দেয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কখানা ক্লাসিকই বা আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে? যেগুলি বেঁচে আছে, তার মধ্যে মানুষের মনের এমন কথা লেখা আছে, যার দেশকালপরিচ্ছিন্ন একটা বৃহৎ আকার আছে। শেকস্‌পীয়রের 'ওথেলো' নাটকে স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান পুরুষের ট্র্যাজেডি বর্ণিত হয়েছে। আজকাল তো বিবাহবিচ্ছেদের আদালতে ওথেলোর দল অনেক সহজে এর মীমাংসা করে নিচ্ছে। তবে এই নাটকের এত কদর কেন? কদর এই জন্য যে ওথেলোর মনোবেদনা সর্বযুগের মানুষের মনোবেদনা—এখন আইনের দ্বারা বিবাহ-

বিচ্ছেদ খুব স্বাভাবিক হলেও মাঝেমাঝে সন্দিগ্ধ স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করে কেন? ওথেলো আত্মহত্যা করে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু তার আত্মা এখনও আধুনিক সভ্য মানুষের মধ্যে বেঁচে আছে। তাই ওথেলো নাটক চিরকালই জনপ্রিয় থাকবে। তবে এমন যদি কোন দিন হয় যে, নানারূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ফলে মানবদেহেরই এমন একটা আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হয়ে গেল যে, তার মনোজগতের মানচিত্রটাই পালটে গেল, তা হলে মানুষের মূল্যবোধের চেহারাও বদলে যেতে পারে। তখন হয়তো মানুষের মৌলিক চিত্তবৃত্তি এমনভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে যে, এতদিন ধরে মানুষ যাকে বড় বলে শ্রদ্ধা করেছে, তার কোন দামই আর থাকবে না। সে দুর্দিন দূরবর্তী হোক!

তাহলে কি সমকালীন লেখক চিরকালের মুখ চেয়ে সমকালকে ফাঁকি দেবেন? "নিরবধি কালহ্যেহয়ং বিপুলা চ পৃথ্বী" বলে তিনি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করবেন? কিন্তু যে বৃহৎ ও মহৎ শিল্প আজও দীর্ঘজীবী হয়ে আছে তার মধ্যে যেমন একাধারে তদানীন্তন যুগ-মানস প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি আবার আছে চিরকালের বাণী। যুদ্ধান্তে পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা তো আমাদেরই জীবনের ট্র্যাজেডি, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড আমাদেরই অশ্রুসজল জীবনের অন্তিম কাণ্ড। রামায়ণমহাভারতের যুগে এর একটা যুগ ও সমাজগত রূপও ছিল, কিন্তু আজ তার স্থানিক ও কালিক পরিবেশ ঝরে গেছে—তার মধ্যে চিরকালের মানুষের যে কথা লেখা আছে, তাই আজকের সংশয়ী মানুষের মনেও একটা শান্তি ও সান্ত্বনার প্রলেপ দেয়।

সমালোচকের দাক্ষিণ্যের ওপর এই সমস্ত গ্রন্থের স্থায়িত্ব নির্ভর করে না। সমালোচক দীর্ঘজীবী মহৎ গ্রন্থকে শ্রদ্ধাভক্তির বিল্বচন্দনে অর্চনা করে ধন্য হন, বিচারবিশ্লেষণের প্রবৃত্তি এর সামনে এসে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাজমহলের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ চলে, কিন্তু হিমাচলের মহিমা ধারণাতীত। রোমের ভ্যাটিক্যান ম্যুজিয়মে

রক্ষিত নাগপাশে বন্দী 'লাওকুন'[৪] প্রতিমূর্তি আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু পিরামিড মানুষের নির্বাক বিস্ময়ের উপাদান হয়ে আছে।

সমকালীন সাহিত্য ও সমালোচক

যে সাহিত্য পুরাতন, প্রমাণিত ও প্রশংসিত, সমালোচক সেই সমস্ত নিত্য ও ধ্রুব গ্রন্থ বিশ্লেষণে বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন না। প্রথমতঃ সেই সমস্ত গ্রন্থের মূল্য কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে গেছে। দীর্ঘকাল ধরে মানুষ হোমর-ব্যাস-বাল্মীকি পড়েছে এবং তা থেকে এক-এক যুগের মানুষ এক-এক প্রকার জীবনতত্ত্ব লাভ করেছে। আর এক দিকে লেখক ও সমালোচকের মধ্যে কালের ব্যবধান আছে বলে বিচারকের নিঃস্পৃহ দৃষ্টি বিশেষ যুগপ্রবণতার দ্বারা ঘোলাটে হয়ে পড়ে না। তাই সমালোচকদের মধ্যে একটা অলিখিত নিয়ম আছে যে, কালের ব্যবধান না থাকলে গ্রন্থের যথোচিত মূল্য বিচার করা দুরূহ। খুব কাছ থেকে কোন ভাল ছবির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না—একটু দূরে গিয়ে তবে পর্বতের মহিমা অনুধাবন করা যায়। সেই রকম সমালোচকও পুরাতন অর্থাৎ ক্লাসিক সাহিত্য সম্বন্ধেই মতামত দিতে পারেন: কারণ বিরাট গ্রন্থ ও গ্রন্থকার অনেক দূরে পিছিয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে সমালোচকের কোন দিক দিয়েই যোগাযোগ নেই। সুতরাং তিনি তখন নির্ভয়ে নিজের খোলাখুলি মত দিতে পারেন। এই জন্য কেউ কেউ মনে করেন, সমকালীন সাহিত্যের আলোচনা হতে পারে না: হয় তা হয়ে পড়ে স্তুতিবাদ, আর না হয় পরিবাদ।

---

৪ *Laocoon*—অ্যাপোলো মন্দিরের পুরোহিত লাওকুন। দেবতার অন্যায় রোষে তিনি এবং তাঁর দুই ছেলে নাগপাশে বন্দী হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ১৫০৬ খ্রীঃ অব্দে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো রোমের এক অখ্যাত জায়গা থেকে লাওকুন আর তার দু ছেলের সাপেজড়ানো আর্ত প্রতিমূর্তি আবিষ্কার করেছিলেন। অবশ্য সম্প্রতি এই ধরনের প্রতিমূর্তি ইতালির নানাস্থানে পাওয়া গেছে। কারো কারো মতে ১৬শ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত মূর্তি এবং সম্প্রতি যে মূর্তি পাওয়া গেছে, তা নাকি আসল নয়,—আরো পূর্বে ব্রঞ্জে নির্মিত মূর্তির এগুলো নকল। অবশ্য ব্রঞ্জের লাওকুন মূর্তি এখনও পাওয়া যায় নি। মানুষের দৈহিক পীড়নের এমন সজীব মূর্তি দুর্লভ।

যেমন ধরা যাক বাঙলাদেশের মধুসূদনের কথা। কিছুকাল পূর্বে তাঁকে বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হত ; কিন্তু সম্প্রতি কোন কোন দুঃসাহসিক সমালোচক মধুসূদনের প্রতিভার সম্যক্ মূল্য স্বীকার করতে সম্মত হচ্ছেন না। কেউ বাঙালীর মাইকেল-প্রীতিকে "দুর্মরতম কুসংস্কার" বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। আমাদের বলবার উদ্দেশ্য—শুধু আধুনিক যুগে নয়, প্রাচীন ও প্রমাণিত গ্রন্থ নিয়েও বিচারবিভ্রাট হয়। কারণ সমালোচক দেশ ও কালের মধ্যে বিহার করেন; দেশকালের সীমার ঊর্ধ্বে উঠে ব্যক্তিগত বাসনা ও সংস্কারের বহু-আকাঙ্ক্ষিত পথ ছেড়ে দিয়ে সমকালীন লেখকের প্রতি সুবিচার করা বা তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা সমালোচকের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। শেলী-কীট্স তাই সমকালীন সমালোচকের কাছে তর্জিত হয়েছিলেন। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—এমন কি শরৎচন্দ্র পর্যন্ত প্রত্যেককেই প্রথম জীবনে সমসাময়িক সমালোচকের কাছ থেকে নিন্দাবাণী শুনতে হয়েছে। এর খুব বড় দৃষ্টান্ত ইংলণ্ড ও বাঙলাদেশের আধুনিক কবিতা।

ইংলণ্ডে যখন প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই কাব্যকল্পনা ও প্রকাশরীতিতে নূতনত্বের পরীক্ষা চলছিল, তখন উনিশ শতকী মনোভাববিশিষ্ট সমালোচকবর্গ তাতে শঙ্কিত হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন, এই সমস্ত বালখিল্য কবির দল আধুনিকতার ছদ্মবেশে ইংরাজ জাতির চরিত্রের তলায় ঘুণ ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। আমাদের দেশে ১৯৩০ সালের পর আধুনিক কবিরা খানিকটা পশ্চিমের দেখাদেখি কাব্যকবিতার নূতন পথ নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; তার ফলে পাঠক ও সমালোচক-সমাজ তাঁদের ওপর কী রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছিলেন, তা বোধ হয় অনেকের মনে আছে। 'মেঘনাদবধে'র 'উতোর' হল 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য', 'কড়ি ও কোমলের' জবাব 'মিঠে কড়া', শরৎসাহিত্যের বিরুদ্ধে লেখা হল 'সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা'।

এ কাজ সব যুগেই হয়েছে। বিশেষ সংস্কারের গোঁড়ামির জন্যই সমকালীন সাহিত্যবিচার বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এ বিষয়ে গ্রীয়ার্সনের কথাটি প্রণিধানযোগ্য :

"Two tendencies the critic should fight against, though they are invincible, prejudice and dogmatism, the wish to pontificate. The first is that to which we older readers are disposed; our test is formed and a new phenomenon makes us not only uncomfortable but too often angry. The latter is that to which the young lean, as when Mr. Eliot and Mr. Lewis and Mr. Herbert Read undertake the revaluation for their dogmatic findings." (*Criticism & Creation*)

কথাটা সত্য ; ভাল সমালোচককে সর্বদা সংস্কার ও গোঁড়ামির ওপরে উঠতে হবে। কিন্তু সাধারণতঃ তা হয় না। একটু বয়স্ক পাঠক ও সমালোচক তাঁদের সমকালীন সাহিত্য—যা সম্পূর্ণ নতুন কথা বলতে চায়, তাকে বরদাস্ত করতে পারেন না। এখনও এমন অনেক 'সুধী' সমালোচক ও 'রসজ্ঞ' পাঠক আছেন, যাঁরা এলিয়ট ও জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়তে হলে রীতিমতো ক্ষেপে যান। আবার উল্টোটাও আছে। তরুণের দল প্রায়ই সমকালীন সাহিত্য ছাড়া প্রাক্তনের মধ্যে বিশেষ কিছু পাঠযোগ্য আছে বলে মনে করেন না। তাঁদের কাছে ক্লাসিক অস্পৃশ্য। সম্প্রতি যা লেখা হচ্ছে, তাই তাঁদের কাছে পরম মূল্যবহ। এও এক রকমের মানসিক ব্যাধি।

যে সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টি আছে, যাঁর ব্যক্তিগত রুচিপ্রবণতাই সাহিত্যবিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয়, তিনি সমকালীন সাহিত্যেরও সুসমালোচক হতে পারেন। অবশ্য যিনি আত্মস্থ হতে পারেন না, তিনি সমকালীন সাহিত্যের প্রতিও সুবিচার করতে পারেন না। হয় নির্জলা নিন্দা, না হলে নির্ভেজাল প্রশংসা— এই দুই চূড়ান্ত সীমায় তিনি বিহার করেন। সমসাময়িক সাহিত্যের বিচার করতে হলে সমসাময়িক ঘটনা ও পরিবেশের

ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। যে সব গ্রন্থ সাহিত্যের নীলাম-বাজারে চড়া সুরে নিজ নিজ দাম হাঁকছে, এবং পাঠকের দল ডাক চড়াচ্ছে, তার সম্বন্ধে সমালোচক কি সব সময়ে নিঃস্পৃহ দৃষ্টি রক্ষা করতে পারেন? সকলেই জানেন, কিছু দিন ধরে বাঙলাদেশে ধর্মকে কেন্দ্র করে অনেক কথাকাহিনী ফাঁদা হয়েছে। কোনটিতে ভক্তিরসের সঙ্গে শিল্পরসের ভেজাল দিয়ে একটা ঠুনকো সাহিত্যবস্তু নির্মিত হয়েছে; কোনটাতে-বা ধর্মের সঙ্গে সংশয়বাদ, আদিরস, জুগুপ্সা, মর্বিডিটির punch তৈরি করে মূঢ় পাঠককে বঞ্চনা করা হচ্ছে। চিরকালই এ রকম ভেকধারী অসাধু সাহিত্যিক এবং বিচারবোধ-হীন পাঠক থাকবেই—সব দেশেই আছে। কিন্তু বাঙলাদেশের ব্যাপারই আলাদা। এখানে কাঞ্চনের দরে কাচ বিকোয়। যাঁরা পণ্ডিত, অধ্যাপক ও প্রবীণ সমালোচক, তাঁরা পর্যন্ত এই ধরনের অসাহিত্য—যা চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার উপযুক্ত, তাকে প্রশংসার অঙ্গরাগে শোভিত করছেন। সমালোচক যখন জটাজুট, রক্তবস্ত্র ও ফোঁটাতিলক দেখেও পর্নোগ্রাফিকে সাহিত্যের মর্যাদা দেন, তখন বুঝতে পারি সমসাময়িক সাহিত্য সমসাময়িক সমালোচকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে দিয়েছে, তিনি সুস্থ স্বাভাবিক বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

যখন রসপ্রমাতার দৃষ্টিই অস্বচ্ছ হয়ে যায়, তখন সাধারণ পাঠক কি করবে? কেমন করে সে সমসাময়িক সাহিত্যের রসোপভোগ করবে? এর উত্তর, ক্লাসিক পড়ো। যার মূল্য দীর্ঘকালের পরীক্ষা ও বিচারের ফলে কষিত কাঞ্চনের মতো সপ্রমাণ হয়েছে, তার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে সাময়িক সাহিত্যের স্বরূপ প্রকট হয়ে পড়বে। এলিয়ট, পাউণ্ড, ডে লুইস, অডেনকে যখন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-কোলরীজ-শেলী-কীট্‌সের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যাবে, জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তী-সমর সেনকে যখন বাঙলার উনিশ শতকী গীতিকাব্য এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব হবে, তখনই নবীন কবিদের কাব্যসৃষ্টির যথার্থ স্বরূপ

নির্ণয়ে সমালোচক ও পাঠকের দুরূহ কর্তব্য সহজ হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন যে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন্। বাঙলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।" কথা হচ্ছে, বাঁকের সামনে দাঁড়িয়ে নদীর ঠিক স্বরূপ বোঝা যায় না ; অনেক দূর থেকে তার যথার্থ চেহারা চোখে পড়ে, কাছ থেকে গোষ্পদকেই সমুদ্র বলে ভ্রম হতে পারে। বিশেষতঃ মর্জি নিয়ে যখন আধুনিকতা, তখন ব্যক্তিভেদে মেজাজমর্জির ভয়ানক রদবদল হতে পারে এবং ফ্যাশন ট্র্যাডিশনের স্থান কেড়ে নিতে পারে। সেইজন্য ক্লাসিক সাহিত্যের চেয়ে আধুনিক সাহিত্যবিচারে এত বিভ্রাট, এত মতভেদ। সে বিড়ম্বনা দূর করার একমাত্র উপায় সমসাময়িক সাহিত্যকে সমকালীনের খাঁচায় বন্দী না রেখে তাকে দেশকালহীন সাহিত্যের মহাকাশে উড়বার অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে, তা হলেই নবজাত গরুড়ের পক্ষবল বোঝা যাবে।

সু-সমালোচকের গুণাবলী

সুবিচারকের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন যার দ্বারা বিচারপর্ব সুচারুরূপে সমাধা হয়। এই গুণ কিছুটা তাঁর নিজস্ব স্বভাবগত, কিছুটা বা অর্জিত। শুধু অধ্যয়নের দ্বারা, আইনকানুনের ঘনিষ্ঠ অনুসরণের দ্বারা ভাল ব্যবহারজীবী হওয়া যায়, কিন্তু ব্ল্যাকস্টোন[৫] হওয়া যায় না। তার জন্য চাই স্বকৃত সাধনা, সহজাত

[৫] Sir William Blackstone (1723-80)—প্রথম জীবনে ব্ল্যাকস্টোন ব্যবহারজীবী ছিলেন, তার পরে অকস্‌ফোর্ডে যোগ দেন এবং আইনের অধ্যাপক হন। তাঁর আইনবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *Commentaries on the Laws of England* তাঁকে অমর করে রাখবে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ব্রিটিশ উপনিবেশের ব্যবহারতত্ত্ব এই গ্রন্থের দ্বারা নির্ণীত হয়েছিল। ব্রিটিশ আইনের মহিমা এই গ্রন্থ পাঠে বোধগম্য হবে।

বোধ। সু-সমালোচক[৬] সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। অনেকের ধারণা, যে সুলেখক নয়, তার সুসমালোচক হতে বাধা নেই; প্রায়ই দেখা যায় যে, যে লেখক হিসেবে ব্যর্থ হল, সে সাময়িক পত্রে সমালোচক হয়ে বসল, এবং গম্ভীরভাবে গুরুগিরি করতে লাগল। কিন্তু সমালোচনা কবিতা নয় যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবির্ভূত হবে। এর জন্য শিক্ষা দরকার, সাধনা প্রয়োজন, নিয়মাবলীর সতর্ক অনুসরণ প্রয়োজন। অবশ্য শুধু নিয়মকানুন জানলেই সুবিচার করা যায় না, তা হলে জুরিপ্রথার আবশ্যকতা থাকত না। সমালোচকেরও একটা অন্তর্দৃষ্টি ও স্বভাবজ বিশ্লেষণ-শক্তি থাকা প্রয়োজন, সেই শক্তিই শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা অধিকতর স্ফূর্তি লাভ করতে পারে। এ কথা অবশ্য সত্য যে, "The perfect critic, then, was never born and never will be born"[৭]—তবু সহজাত অন্তর্দৃষ্টি ও শিক্ষার গুণে সমালোচক সাহিত্যবিচারে অনেকটা সফলকাম হতে পারেন। আমাদের মনে হয়, অন্ততঃ দশটি গুণ থাকলে সমালোচক সাহিত্য-বিচারের দুরূহ ব্রতে বহুলাংশে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন :

১। ভূয়োদর্শন
২। আত্মসমালোচনা
৩। সতর্কতা ও পরমতসহিষ্ণুতা
৪। লেখকের প্রতি সহানুভূতি
৫। মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান
৬। দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি

---

৬ Good Critic বলতে আমরা 'সু-সমালোচক' শব্দ ব্যবহার করলাম। আধুনিক কালে কেউ কেউ 'good poet-এর বাংলা করেছেন 'সৎকবি'। এই ভাষান্তর কিন্তু আদৌ ঠিক নয়। বাংলায় 'সুকবি' 'সুসমালোচক' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করাই সঙ্গত। 'রামধনু' গানের "সন্তকো সন্মতি দে ভগবান" এর 'সন্মতি' বাংলায় অচল।—বাংলায় 'সুমতি' বলে, 'সন্মতি' নয়। কারণ বাংলায় 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দ দুটি চরিত্রনীতিতেই ব্যবহৃত হয়। অসৎ ব্যক্তিও সুকবি হতে পারেন।

৭ Kellett—*Fashion in Literature*

৭। বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য
৮। যৌক্তিকতার প্রতি নিষ্ঠা
৯। নিঃস্পৃহতা
১০। লেখকের চিত্তভূমিতে অধিষ্ঠিত হবার স্বাভাবিক সামর্থ্য

এবার সংক্ষেপে এই গুণগুলির পরিচয় নেওয়া যাক। প্রথমতঃ ভূয়োদর্শন, অর্থাৎ জগৎ, জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নিগূঢ় ধারণা সমালোচকের অত্যাবশ্যক গুণ। তার জন্য তাঁর অধ্যয়নের সীমা বর্ধিতায়তন হওয়া চাই। সাহিত্যসমালোচকের গ্রন্থলব্ধ জ্ঞানের পরিধি সুবিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন, এবং শুধু সাহিত্য নয়, মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি তাঁর আয়ত্তে থাকা দরকার। তার জন্য শুধু স্বদেশীয় সাহিত্য নয়, বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে সাহিত্যবিচারক সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারবেন না। ম্যাথু আর্নল্ড বলেছেন—সুসমালোচককে শুধু নিজের দেশের সাহিত্য জানলেই হবে না, তাঁকে বিদেশের সাহিত্য অধিগত করতে হবে, এবং যে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের তুলনা চলে না, তারও সঙ্গে তুলনা দিয়ে দেখতে হবে।[৮] তা হলে বৈপরীত্যমূলক তুলনার দ্বারা তিনি এক সাহিত্যের সঙ্গে অপর সাহিত্যের সম্পর্ক বুঝতে পারবেন। তিনি পাশ্চাত্য সমালোচকদের প্রাচ্য সাহিত্য পড়ার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। ইংরেজীর সঙ্গে সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন হিব্রু সাহিত্য পড়া না থাকলে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-কে মধুসূদনের প্রকাণ্ড পরিহাস বলে মনে হবে। বহু-অধ্যয়ন সুসমালোচকের যে প্রথম ও প্রধান লক্ষণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়তঃ আত্মসমালোচনা। সমালোচক শুধু পরের গ্রন্থই সমালোচনা করবেন না, তাঁকে মাঝে মাঝে আত্মসমালোচনাও

৮ M. Arnold—*Essays in Criticism* (First Series)

আত্মবিশ্লেষণেও নিযুক্ত থাকতে হয়। আমরা সাধারণতঃ কতকগুলি প্রিয় ধারণার দ্বারা চালিত হই এবং কেউ চোখে আঙুল দিয়ে তার ত্রুটি দেখিয়ে দিলেও তাকে ছাড়তে রাজী নই। ফলে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত রুচি ও বুদ্ধিকেই সাহিত্যবিচারের চূড়ান্ত মাপকাঠি বলে ধরি। অন্ধ অহংমন্যতার প্রতি এজাতীয় বাৎসল্যভাব সমালোচনার বনিয়াদকেই দুর্বল করে দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে সমালোচকের আত্মসমালোচনা (self-criticism) ও আত্মবিশ্লেষণে (self-analysis) প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। নিজের মনের গভীরে তলিয়ে গেলে তিনি দেখতে পাবেন, তাঁর মন মণিদর্পণের মতো সুপ্রভ নয়, হেমন্তের ঘোলাটে আকাশের মতো তাঁর চিন্তাশক্তি তাঁরই কতকগুলি প্রিয় সংস্কার ও চিত্তপ্রবণতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আর্নল্ড যদি একটু আত্মসমালোচনার পথ বেছে নিতেন, তা হলে শেলীর প্রতি অবিচার করতে পারতেন না। সমালোচক নিজের সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ, পুনর্বিচার প্রভৃতির দ্বারা অনেক ভুলত্রুটি ও চিন্তার জড়তা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। অনেক সময়ে কোন গ্রন্থ তাঁদের সংস্কারে লাগলে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, সে গ্রন্থের আর সুবিচার হয় না।

এরই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় পরমতসহিষ্ণুতা। কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থকার সম্বন্ধে অপরের অপ্রীতিকর সমালোচনা সহ্য করার মতো সমালোচকের মানসিক উদারতা থাকা প্রয়োজন। একটি গ্রন্থ হয়তো সমালোচকের রুচির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, অথবা সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে অন্য কোন সমালোচকের সিদ্ধান্ত ভাল মনে হচ্ছে না; তখনই যে সমালোচক প্রতিপক্ষের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন, তা ঠিক নয়। তাঁর বিপরীত মতামত এবং তাঁর রুচিকর নয় এমন গ্রন্থ সম্বন্ধেও তাঁকে সহিষ্ণু হতে হবে। পরমতসহিষ্ণুতা সংস্কৃতিবান মানুষের প্রধান লক্ষণ। আমাদের দেশের মোহিতলালের কোন কোন রচনায় যে রকম তাপ ও অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠেছে, তাতে তাঁর

মতো মনীষীর অনেক সার্থক রচনাই কিছু খণ্ডত্বের অভিশাপে পীড়িত হয়ে পড়েছে।

চতুর্থতঃ লেখকের প্রতি সমালোচকের পরিপূর্ণ সহানুভূতি থাকা চাই। সমালোচক যদি প্রথম থেকেই দণ্ডধারী হয়ে লেখকের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তা হলে তিনি সমালোচকের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে স্বতঃই বঞ্চিত হবেন। লেখকের প্রতি সুবিচার করতে হলে তাঁর প্রতি সমালোচকের সহৃদয় সহানুভূতি চাই; আর এই সহানুভূতি না থাকলে সমালোচক কোন গ্রন্থের প্রতি সুবিচার করতে পারেন না। সমালোচক কেলেট (Kellett) এ বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি এক সময়ে উপন্যাস সমালোচনায় ঔপন্যাসিকদের ত্রুটিবিচ্যুতি পেলে নির্মমভাবে কশাঘাত করতেন; পরে তাঁর নিজেরই উপন্যাস লেখার ইচ্ছা হল, লিখেও ফেললেন। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখলেন— উপন্যাস রচনা কী কঠিন কাজ। এরপর তিনি অন্যের উপন্যাস বিচার করতে গিয়ে আগের মতো তীব্র আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমা পরিত্যাগ করলেন—ঔপন্যাসিকের প্রতি তাঁর সহানুভূতি সঞ্চারিত হল।[১] সহানুভূতি—অর্থাৎ লেখকের সঙ্গে সমালোচকের সমপ্রাণতা। সমালোচক প্রথম থেকেই প্রতিকূল মনোভাব গ্রহণ না করে যদি লেখকের আঁকা পথ ধরে চলেন, তা হলে তিনি গ্রন্থের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পারবেন। অপরাধের বিচারে আসামী ফরিয়াদী, কারো প্রতি বিচারকের পক্ষপাতিত্ব নেই, কিন্তু সাহিত্যবিচারে লেখকের সঙ্গে সমালোচকের মানসমৈত্রী স্থাপিত না হলে সমালোচনা বিষোদ্গারে পর্যবসিত হয়। আমাদের দেশের অনেক সমালোচক যে গরলমুখী লেখনী ব্যবহার করেন, তার কারণ বিচার্য গ্রন্থের প্রতি তাঁদের কিছুমাত্র সহানুভূতি থাকে না।

---

১ Kellett—*Fashion in Literature*

পঞ্চমতঃ মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান। সমালোচককে নানাবিধ জ্ঞানের আয়ুধে সজ্জিত থাকতে হয়। তার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ নিষ্ঠা ও অধিকার থাকা চাই। মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের দ্বারাই তিনি রচনার পশ্চাৎপটে অবস্থিত লেখকের মনের খবর পান। লেখকের মনের প্রবণতা ধরতে পারলে গ্রন্থবিচারও অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে। তাই সমালোচক লেখকজীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা, চিঠিপত্র, ডায়রি প্রভৃতিকে আলোচনায় এত মূল্য দিয়ে থাকেন। ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় মিল্‌টন সম্বন্ধে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। মিল্‌টনের গ্রন্থের প্রকাশকাল ধরে এই সমস্ত লেখক কবির মনের হদিস খুঁজবার চেষ্টা করেছেন। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র থেকে তাঁদের মনের খোঁজখবর পাওয়া অসম্ভব নয়; এবং এই জ্ঞানের দ্বারা কবিদ্বয়ের সাহিত্যমানসের স্বরূপ আবিষ্কার করাও সহজ হয়ে পড়ে। সমালোচক যদি লেখকের মনোজগতের ঠিক খবর না রাখেন, তা হলে তাঁর সমালোচনা একদেশদর্শী হতে বাধ্য। এই মনস্তত্ত্বের দ্বারাই লেখক ও পাঠকের মনের সংযোগসাধন করা সমালোচকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। রিচার্ডস্ মনোবিজ্ঞানকে সাহিত্যবিচারের কাজে লাগিয়েছেন এবং সার্থকতা লাভ করেছেন তা বলাই বাহুল্য।

ষষ্ঠতঃ দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি। সমালোচকের গভীর দার্শনিক প্রত্যয় না থাকলে টীকাকারের সঙ্গে সমালোচকের কোন পার্থক্য থাকে না। দার্শনিকতা বলতে আমরা অলস মস্তিষ্ক-চর্চার ইঙ্গিত করছি না, বা সাহিত্যকে দর্শনের অঞ্চলতলে আশ্রয় নিতেও বলছি না। সমালোচকের যদি অন্তর্দৃষ্টির ন্যূনতা ঘটে তা হলে তিনি আসল-নকল, সাঁচ্চা-ঝুটোর ভেদ করতে পারবেন না। দার্শনিক যেমন বিশৃঙ্খলা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে জ্ঞানের ঐক্য ও শৃঙ্খলা আবিষ্কার করেন, তেমনি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক সাহিত্যের তিরস্করিণী অপসারিত করে তার নেপথ্যের রূপ আবিষ্কার করেন। তাঁকে তখন কবিসৃষ্টি ও কবিজীবনীর মধ্যে যোগাযোগ খুঁজতে হয়।

কবিসৃষ্টির গভীরে সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করে তিনি স্রষ্টার অন্তঃপুরেও ধাওয়া করেন। প্রসিদ্ধ জার্মান সমালোচক লেসিং[১০] এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক মেকলের সমালোচনা বিচার করলে দেখা যাবে, *Laocoon*-এর গ্রন্থকার যে গভীর চেতনা ও জীবনদর্শনের পরিচয় দিয়েছেন, মেকলের রাশি রাশি লেখায় তার অণুমাত্রও পাওয়া যায় না। এই দার্শনিক চেতনার অপর নাম প্রজ্ঞাদৃষ্টি। এর অভাব ঘটলে অনেক বড় সমালোচকও বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো আবোলতাবোল বকতে থাকেন। যেমন আর্নল্ড একবার বলেছিলেন, হোমর ও শেকস্‌পীয়রের তুলনায় হোমর শেকস্‌পীয়রকে বহুদূরে পিছনে ফেলে গেছেন, "as far behind as perfection leaves imperfection." (*Letters*, i) অকস্‌ফোর্ডের শিক্ষার গুণে আর্নল্ড গ্রীক সাহিত্যের অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন; তিনি শেকস্‌পীয়র-রসিক হয়েও হোমর ও শেকস্‌পীয়রের জীবনপ্রত্যয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ জাগে। এই প্রজ্ঞাদৃষ্টির অভাববশতঃ অনেক জার্মান সমালোচক শিলারকে শেকস্‌পীয়রের চেয়ে বড় শিল্পী বলেছেন। সমালোচক হতে গেলে এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি থাকা চাই। অনেক সমালোচক যে কলেজ-রুমের শাসন ছাড়তে পারেন না, তার কারণ তাঁদের সাহিত্যবিচারশক্তির স্বাভাবিক অভাব।

সমালোচকের সপ্তম লক্ষণ হল বিশ্লেষণশক্তির আনুগত্য। যদিও সমালোচনা একটা পরিপূর্ণ সৃষ্টি, শুধু বিশ্লেষণীর পা গুনে গুনে কোন সৃষ্টি সম্ভব নয়,—তবু বিশ্লেষণশক্তি সমালোচকের হাতিয়ার বিশেষ। বিশ্লেষণশক্তির অভাব ঘটলে সমালোচক দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে যান, গ্রন্থের যথার্থ স্বরূপ অবধারণ করতে পারেন না। লেখকের মন ও সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্টির সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক অনুধাবন করতে হলে সমালোচককে বিশ্লেষণশক্তির সাহায্য নিতে হবেই। লিটমাস

---

১০ য়ুরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে পরে লেসিং সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

কাগজের সাহায্যে যেমন ক্ষার ও অম্লের অস্তিত্ব বোঝা যায়, তেমনি বিশ্লেষণের সাহায্যে গ্রন্থের গুণাগুণ নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। অবশ্য বিশ্লেষণের প্রতি অত্যধিক নির্ভর করলে সমালোচক যান্ত্রিক হয়ে পড়েন এবং সাহিত্যবিচার শেষ পর্যন্ত ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের বৃথাপাণ্ডিত্যে পরিণত হয়।

সমালোচকের অষ্টম লক্ষণ হল যুক্তির প্রতি নিষ্ঠা। সাহিত্য-বিচারের সবচেয়ে বড় ত্রুটি 'ডগ্‌মা'র (dogma) দাসত্ব, গোঁড়ামির সঙ্গে সপ্তপদী গমন। যুক্তি মানুষকে অভ্রান্ত পথ দেখিয়ে দেয়, সাহিত্যবিচারে যুক্তি সমালোচককে হাত ধরে নিয়ে চলে। সমালোচনার মধ্যে যৌক্তিক পারম্পর্য থাকা একান্ত আবশ্যক, তা না হলে সমালোচক এলোমেলো বিশৃঙ্খলার ঘূর্ণিপাকে পথ হারিয়ে ফেলবেন। নিয়মের দাসত্ব সমালোচকের প্রধান শত্রু, অনেক সমালোচকই এই গোঁড়ামির গণ্ডী পেরোতে পারেন না; যুক্তিকে সাহিত্যবিচারের প্রধান অস্ত্ররূপে মানলে সংস্কার ও মানসিক প্রবণতা সাহিত্যবিচারকের অপক্ষপাতী মনকে কোন দিক দিয়েই আক্রমণ করতে পারবে না। যাঁরা একটু আবেগপ্রবণ, অথবা যাঁদের মনের ওপরে মানসিক সঙ্কীর্ণতা বা ঔদ্ধত্যের প্রলেপ পড়েছে তাঁরা এই যুক্তিবাদকে শরণ্যরূপে বরণ করে না নিলে সাহিত্যবিচার শেষ পর্যন্ত দলাদলির দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়।

অবশ্য যুক্তিবাদের প্রতি অত্যধিক আনুগত্য ঘটলে সমালোচকের বিচারপদ্ধতি ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা গতানুগতিকতায় পরিণত হয়। যুক্তি যদি সমালোচনার বন্ধু না হয়ে প্রভু হয়ে বসে, তা হলে তার পরিণতি হয় শোচনীয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জ্ঞানগর্ভ সমালোচনায় যুক্তির মাপজোখ প্রধান হয়ে আলোচনার সাহিত্যরস বিপর্যস্ত করে দেয়। সাহিত্যসমালোচনা সর্বোপরি সাহিত্যবিষয়ক রচনা, সুতরাং তাতে যুক্তিবাদের প্রাবল্য বিঘোষিত হলে সমালোচনার সাহিত্যিক মূল্য হ্রাস পাবে। এরূপ ক্ষেত্রে যথার্থ সমালোচক যুক্তিকে শুধু অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবেন—তার বেশি নয়।

সমালোচকের নবম লক্ষণ হল নিঃস্পৃহতা। বলাবাহুল্য এই গুণটি সমালোচকের না থাকলে সমস্ত সাহিত্যবিচার একপেশে এবং একটি ব্যক্তিমানসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, যার অর্থ—সমালোচনা ও সাহিত্যবিচারের মূলোচ্ছেদ। সমালোচক সব সময়ে তাঁর ব্যক্তিগত ভাল-লাগা মন্দ-লাগার ওপরে উঠতে না পারলে তিনি অপক্ষপাতী দৃষ্টির পরিচয় দেবেন কেমন করে? সমালোচক যখন নিজস্ব রুচি ও চিত্তপ্রবণতাকেই একমাত্র মূল্যমান বলে গ্রহণ না করবেন, তখনই তিনি নিঃস্পৃহ নিরাসক্ত ভাবদৃষ্টির দ্বারা সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপটি ধরতে পারবেন। মাইকেল মধুসূদন খ্রীষ্টান হয়েছিলেন, মধুসূদন-জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু সে দুর্ঘটনা কিছুতেই ভুলতে পারেন নি, কাজেই তিনি মাইকেলের জীবন ও কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। একদা হিন্দুয়ানির সঙ্কীর্ণ বাতায়ন থেকে বঙ্কিম-সমালোচনা পরিচালিত হত। বঙ্কিমসাহিত্যের কতটুকু হিন্দু আর কতটুকু অহিন্দু—এই নিয়ে সমালোচকদের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি সাহিত্যবহির্ভূত পটভূমিকাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিলে সমালোচক সাহিত্যবিচারশক্তি হারিয়ে ফেলবেন। অবশ্য সমালোচক সাহিত্যবিচারে বৈদান্তিকসুলভ নিরাসক্তির ভাব-লোকে সদাসর্বদা ধ্যানস্থ হয়ে থাকতে পারেন না। সাহিত্য প্রধানতঃ ব্যক্তিচিত্তাশ্রয়ী—তা সে লেখক, পাঠক, সমালোচক, যার চিত্তই হোক না কেন। এবং সমালোচক যাই বলতে চান না কেন, যতই নিরাসক্তি অভ্যাস করুন না কেন, তাঁর বিচার-প্রণালীর সঙ্গে তাঁর মনের কথার কিছু না কিছু যোগ হয়ে যাবেই—বাতাসের মধ্যে বাস করে বাতাসের চাপ এড়াবার উপায় নেই; সমালোচকও তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতা কখনও অস্বীকার করতে পারেন না। কাজেই সমালোচনা যে কিয়দংশে তাঁর ভাবনাচিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাঁর লক্ষ্য হওয়া উচিত—তিনি সর্ব সময় ব্যক্তিগত মানসিকতার ওপরে উঠবেন।

তাহলেই তিনি কেবলমাত্র নিজের মনগড়া ভাব ও আদর্শের দ্বারা সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হবেন না; সুতরাং সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কারে সফলতা লাভ করবেন।

সমালোচনার সর্বশেষ লক্ষণ—লেখকের চিত্তভূমির ওপরে সমালোচকের প্রতিষ্ঠা। লেখকের সৃষ্টি অনুধাবন করতে করতে স্বয়ং অকবিও কবি হয়ে উঠেন—সমালোচকের তো কথাই নেই। সমালোচকের যদি লেখকের অনুরূপ কল্পনাশক্তি ও দিব্যদৃষ্টি না থাকে, তবে তিনি গ্রন্থবিচারকের যথোচিত কর্তব্য পালন করতে পারবেন না। তা বলে উপন্যাস বিচার করতে গিয়ে উপন্যাস ফাঁদলে চলবে না, বা কাব্যবিচারককে কবি হতে হবে না। ফুটবল রসিককে ভাল খেলোয়াড় না হলেও চলে, গানের সমঝদার অনেক সময় অব্যাপারী ব্যক্তিই হয়ে থাকেন—তাতে তাঁর কীলোৎপাটিত বানরের দশা হয় না। সমালোচক শিল্পীর মতো রসদৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির অধিকারী হলে সাহিত্যের মূল স্বরূপ, তার আত্মার আকৃতি ঠিকই ধরতে পারবেন। অর্থাৎ কবি ও সাহিত্যিকের কল্পনা সক্রিয় ও সৃষ্টিশীল, আর সমালোচকের কল্পনা কিছুটা নিষ্ক্রিয়, সাহিত্যিকের চরণচিহ্ন অনুসরণ তার একমাত্র কাজ। তবু সাহিত্যবিচারে সমালোচকের রসবোধ ও চিত্তপ্রবণতা লেখকের সমধর্মী না হলে প্রায়শঃই বিচারবিভ্রাট এসে পড়ে। এই জন্য সমালোচক ও লেখকের মধ্যে 'হরিহর আত্মা'-র সম্বন্ধ স্থাপিত হলে বিচার-বিতর্ক নিয়ে বেশি গোলযোগ সৃষ্টি হয় না। তবে লেখক ও সমালোচকের মনের দিক থেকে যদি স্তরভেদ হয়ে যায়, তাহলে সব যুক্তির সার যুক্তি *argumentum ad baculum* প্রয়োগ করতে হয়—যেটা সমালোচকেব কাজ নয়, দেউড়ির দরোয়ানের অবশ্য কর্তব্য।

পাঁচ

॥ পাশ্চাত্য সাহিত্যবিচারের ধারা ॥

আদিযুগ ঃ গ্রীক ও রোমান সমালোচনা

দক্ষিণ য়ুরোপের যে কোন জায়গার এক হাত মাটি খুঁড়লে গ্রীক ও রোমক সভ্যতার দু-চারখানা অশ্মীভূত কঙ্কাল আবিষ্কার করা যায়। আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলটাও ঐ য়ুনানী ধ্বংসস্তূপ থেকে জন্ম লাভ করেছে। মিশর ও গ্রীসে প্রবাদ আছে যে, ফিনিক্স পাখি বুড়ো হলে চিতা তৈরি করে নিজের হাতে আগুন জ্বালিয়ে ঝাঁপ দেয় এবং ভস্মীভূত হয়ে আবার নবকলেবর নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। গ্রীক-রোমক সভ্যতাও দীর্ঘকাল ধরে চিতা-ভস্মস্তূপে বিবর্ণ হয়ে পড়ে ছিল। রোম সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর কনস্টান্টিনোপ্‌লকে রাজধানী করে রোম সংস্কৃতি প্রায় হাজার বছর বেঁচেছিল; পশ্চিম য়ুরোপে গ্রীক সভ্যতা ধ্বংস হলেও এখানে তা দীর্ঘকাল সজীব ছিল। কিন্তু ১৪৫৩ খ্রীঃ অব্দে তুর্কীর আক্রমণে কনস্টান্টিনোপ্‌ল ধ্বংস হলে গৃহহারা পণ্ডিত-মনীষীর দল ইতালিতে এসে আশ্রয় নিলেন এবং এখানে গ্রীকরোমক সাহিত্য ও সংস্কৃতি পুনর্জীবন লাভ করল—য়ুরোপেরও নবজন্ম লাভের সূচনা হল।

য়ুরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যের মূল গ্রীকরোমান সমালোচনার মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং য়ুরোপীয় সাহিত্যবিচার-পদ্ধতি আলোচনা করবার আগে গ্রীকরোমান সমালোচনা-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিতে হবে; কারণ গ্রীকরোমান সমালোচনা য়ুরোপীয় সমালোচনার আদিপর্ব।

গ্রীক সমালোচনা-সাহিত্য

অ্যারিস্টট্‌ল গ্রীক সমালোচনার নিয়মানুবর্তী বিকাশ-পরম্পরাটি যথার্থ ধরতে পেরেছিলেন; এখনও তাঁর সাহিত্যবিষয়ক মৌলিক

চিন্তা তাত্ত্বিকের কাছে আদরণীয়। তবে তাঁকে গ্রীক সমালোচনার জনক বলা যায় না, বরং সে গৌরব প্লেটোর প্রাপ্য। সাহিত্যের প্রতি প্লেটোর মত কিছু ত্রুটিযুক্ত হলেও তিনি সর্বপ্রথম সাহিত্য ও সাহিত্য-বিচারপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন। প্লেটোর যুগেই (খ্রীঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দী) গ্রীসে তত্ত্ব ও তর্কমূলক আলোচনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রাক্-প্লেটো যুগে গ্রীক প্রতিভা ছিল সৃষ্টিশীল ; পরে খ্রীঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ শতকের দিকে গ্রীসের সৃষ্টিক্ষম শিল্পপ্রতিভার অবসান হয়ে এল। তখন সাহিত্যের স্থান কেড়ে নিল সমালোচনা, হৃদয়বৃত্তির স্থানে এল বুদ্ধিবৃত্তির সুদক্ষ কারুকর্ম। তাই প্লেটোর সমকাল থেকেই গ্রীসে দ্বান্দ্বিক সাহিত্য-তত্ত্বালোচনা প্রধান হয়ে উঠল। তবে আরম্ভেরও যেমন আরম্ভ আছে, তেমনি প্লেটোর পূর্বেও সমালোচনা ছিল। প্রাক্-প্লেটোর যুগে অনেক লেখক, কবিসাহিত্যিক ও সমালোচক সাহিত্যবিচারপদ্ধতি নিয়ে অনেক কথা ভেবেছিলেন। তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে।

প্রাক্-প্লেটো গ্রীক সমালোচনা

একটু অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে, প্লেটোর পূর্বে চিন্তা, তর্ক ও নিয়মানুগ সমালোচনা গড়ে না উঠলেও সে যুগের অনেক কবি ও সমালোচক সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলেন। অবশ্য সে সমালোচনা প্লেটো বা তাঁর পরবর্তিকালের মতো নিয়মানুগ ও বৈজ্ঞানিক নয়। কারণ প্লেটোর আগে যাঁরা সাহিত্যের কথা ভেবেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই সৃষ্টিশীল কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন, মননশীল বিচারক ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের কাব্যাদির মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পের মূলতত্ত্ব নিয়ে যে সমস্ত সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন তাকে গ্রীক সমালোচনায় প্রথম পদক্ষেপ বলে ধরতে হবে।

প্রথমেই মহাকবি হোমরকে নিয়ে আরম্ভ করা যাক। যদিও তিনি কবি, সমালোচক ছিলেন না,—তবু তাঁর 'ইলিয়াড' ও 'অডিসির' মধ্যে কয়েক স্থলে রসবিচার ও শিল্পবিশ্লেষণের কথা আছে। এক জায়গায় হোমর (ইলিয়াড, ২য় সর্গ) অনুপ্রেরণার (Inspiration) কথা বলেছেন। ঐ ইলিয়াডের আর এক জায়গায় (৩য় সর্গ) বাগ্মিতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে হোমর দুরকম বাগ্মিতার কথা বলেছেন। মেনেলিউস ও ইউলিসিসের বক্তৃতার মধ্যে কার বাগ্মিতা কী রকম হয়েছে, সে বিষয়ে হোমর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। 'অডিসি'-তেও কবি ও চারণ গায়কের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।

কবি পিণ্ডার (খ্রীঃ পূঃ ৫২২-৪২২) অনুপ্রেরণা ও আঙ্গিকের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ গীতিকবি। কাব্য রচনা করতে গিয়ে তিনি কিছু কিছু সমস্যার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল—কাব্যক্ষেত্রে কোন্‌টি অধিকতর মূল্যবান,—অনুপ্রেরণা, না আঙ্গিক? অনুপ্রেরণা না এলে কাব্যরচনা হয় না, আবার আঙ্গিক বা রচনাকৌশল না জানলে শুধু অনুপ্রেরণার ফলে কাব্যরচনা সম্ভব নয়। কাব্যরচনার এ দুয়ের মধ্যে কি রকম অনুপাত রাখা উচিত তা নিয়ে তিনি চিন্তা করেছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ ৬-৫ শতকে হেরাক্লিটাস (খ্রীঃ পূঃ ৫৩৫-৪৭৫) এবং জেনোফেন (খ্রীঃ পূঃ ৪৩০-৩৫৪ অব্দ?) সাহিত্যবিচারে নৈতিক মাপকাঠিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জেনোফেন সাহস করে হোমরের সৃষ্টিকেও নিন্দা করেছিলেন। তাঁর মতে হোমর দেবতাকে মানুষের মতো করে এঁকে অন্যায় করেছেন। পরবর্তিকালে দীর্ঘদিন ধরে গ্রীক সমালোচনায় এই নীতিতত্ত্ব ও সমাজচেতনা সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবিশিল্পীর প্রধান কাজ সমাজ ও মানুষের নৈতিক কল্যাণ সাধন—এ কথাটাই হেরাক্লিটাস ও জেনোফেন বিশ্বাস করতেন এবং সে বিশ্বাস আধুনিক কালেও যে আমূল পালটেছে তা মনে হয় না।

পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধের ঐতিহাসিক থুকিদিদিস (খ্রীঃ পূঃ ৪৭১-৪০০ অব্দ, আনুমানিক) প্রচুর পরিশ্রম ও গবেষণার দ্বারা *History of Peloponnesian War* নামক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। যদিও এটি ইতিহাসগ্রন্থ, কিন্তু লেখক এতে যে বিস্ময়কর সাহিত্যরস পরিবেশন করেছেন তার তুলনা আধুনিক যুগেও খুব সুলভ নয়। তিনি এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে কথাপ্রসঙ্গে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। তাঁরও জিজ্ঞাস্য ছিল: সাহিত্যের উদ্দেশ কি? শিক্ষা দেওয়া, না আনন্দ দেওয়া? যিনি যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তিনি যে শিক্ষা দেওয়াকেই সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য বলবেন তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? তা হলে দেখা যাচ্ছে, প্লেটো-অ্যারিস্টট্লের আগেও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে নানা সন্দেহ জেগেছিল, এবং থুকিদিদিস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শিক্ষা প্রচারকেই সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করেছিলেন।

পিণ্ডারের সমসাময়িক কোরিনা নাম্নী (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) এক মহিলাকবি পিণ্ডারের কবিতার বিশেষ নিন্দা করেছিলেন। তিনি পিণ্ডারকে অম্লমধুর ভাষায় আক্রমণ করে বলেছিলেন, কবিরা যেন পৌরাণিক ব্যাপার বর্ণনায় সাবধানতা অবলম্বন করেন এবং অযথা বাগ্‌বিস্তার পরিত্যাগ করেন। গ্রীক গীতিকবি সাইমনাইড্‌স্ (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৬-৪৬৮ অব্দ) সাহিত্যবিচার প্রসঙ্গে কতকগুলি মৌলিক কথা বলেছিলেন। তিনি কাব্য ও চিত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—কাব্য হল বাঙ্‌ময় চিত্র, আর চিত্র হল নীরব কাব্য।[১] এঁর এই সংজ্ঞাটির মধ্যে যে সূক্ষ্ম বিচারবোধ ও কল্পনাশক্তির অভিনবত্ব রয়েছে, আজকের দিনেও তার মূল্য সবিস্ময়ে স্বীকার্য।

যাঁরা বিশুদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন না, তাঁরাও মাঝে মাঝে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা মন্তব্য প্রকাশ করতেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমসথিনিস

১ "Painting as silent poetry and poetry as painting that speaks". (Edmonds—*Lyra Graeca*, III)

(খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) ইসকাইলাসের ট্র্যাজেডির অনেক ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর রচনারীতিরও নিন্দা করেছিলেন। ঐতিহাসিক পলিবিয়াস (খ্রীঃ পূঃ ২০১-১২০) তাঁর পূর্বসূরীদের রচনার মধ্যে বহু দোষত্রুটি আবিষ্কার করেছিলেন। কবিদার্শনিক মেলিজার (খ্রীঃ পূঃ ১৪০-৭০) গীতিকবিতা ও ব্যঙ্গকবিতার স্বরূপ বিচার করেছিলেন। অবশ্য এঁরা যখন সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তার পূর্বেই প্লেটো-অ্যারিস্টট্‌লের আবির্ভাব হয়ে গেছে। সুতরাং সাহিত্যসমালোচনার বাঁধা পথে চলবার সুযোগ অনেক পূর্ব থেকেই জুটে গেছে।

প্লেটোর সমকালীন প্রসিদ্ধ প্রহসনরচয়িতা অ্যারিস্টোফেনিস (খ্রীঃ পূঃ ৪৫০-৩৮৫) সর্বপ্রথম তাঁর ব্যঙ্গাত্মক নাটকে বলিষ্ঠতার সঙ্গে কবিসাহিত্যিকদের নিকৃষ্ট রচনার নিন্দা করেছিলেন। তাঁর নানা প্রহসনের মধ্যে *The Frog* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রহসনে তিনি ইসকাইলাস ও ইউরিপিডেসের ট্র্যাজেডির নিন্দা করেছেন। এই নাটকে তিনি উক্ত দুজন নাট্যকারের চরিত্র এঁকে তাঁদের উক্তির মধ্য দিয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক কথা বসিয়ে দিয়েছেন। এই প্রহসনে ইসকাইলাস ইউরিপিডেসকে জিজ্ঞাসা করলেন, "Pray, tell me on what particular ground a poet should claim admiration?" এই প্রশ্ন কাব্যজিজ্ঞাসার আদিম প্রশ্ন। যখন অ্যারিস্টোফেনিস তাঁর ব্যঙ্গনাটকে এই প্রশ্ন করেছিলেন, তখন গ্রীসের সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থা চূড়ান্ত উচ্চতা অবলম্বন করেছিল। খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে গ্রীসের মধ্যে কৃত্রিমতা এসে গেছে, বহুকালাশ্রিত সত্যের বিরুদ্ধে সংশয় জেগেছে; দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলিত নীতিধর্ম সম্বন্ধেও কেউ কেউ সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। এমন অবস্থায় অ্যারিস্টোফেনিস প্রাচীন নাট্যকারদের রচনার মধ্যে নানা ত্রুটি আবিষ্কার করবার প্রয়াস পাবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? ইসকাইলাস পুরাতন ক্লাসিক পন্থা ত্যাগ

করে ঘটনা ও চরিত্রকে সাধারণ স্তরে নামিয়ে এনেছেন বলে অ্যারিস্টোফেনিস *The Frog*-এ তাঁকে ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করেছেন। তাঁর সমকালীন আরও অনেক প্রহসনলেখক এথেন্সবাসীদের চারিত্রিক অধোগতিকে ব্যঙ্গ করে নাটক রচনা করেছিলেন। সাহিত্যিকদের রচনাগত ত্রুটিবিচ্যুতিকেও এঁরা সহজে ছেড়ে দিতেন না। ক্র্যাটিনাসের *Archilochi*, টেলেক্‌লাই-ডাসের *Hesiodi*, ফ্রিনিকাসের *Muses*, প্লেটা কমিকাসের *Poet*, *Sophists* প্রভৃতি প্রহসন পাওয়া যায়নি। কিন্তু নামগুলি দেখে মনে হচ্ছে—এগুলি সাহিত্যগ্রন্থ ও সাহিত্যের ওপর আক্রমণ করে লেখা। এঁরা যেমন ইউরিপিডেস-সক্রেটিসকে আক্রমণ করতেন, তেমনি করতেন পেরিক্লিস, ক্লিয়ন, আল্‌মিবিয়াডিস প্রভৃতি শাসক ও রাজনীতিকদের। এঁদের মতে ইউরিপিডেস প্রভৃতি সাহিত্যিক এবং পেরিক্লিস, ক্লিয়ন প্রভৃতি শাসকগণ এথেন্সকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই অ্যারিস্টোফেনিস এবং তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারগণ এঁদের বিশেষ নিন্দা করেছিলেন। অবশ্য প্লেটোর সমকালে বা কিছু পূর্ব থেকে যেমন সাহিত্যকে নৈতিক শাসনদণ্ড দিয়ে বিচার করা হচ্ছিল, তেমনি সাহিত্যের বিষয়বস্তু, ছন্দ-অলঙ্কার নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা ও আলোচনা শুরু করেছিলেন ক্রোক্‌স এবং টিসিয়াস।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্লেটোর আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই গ্রীসে সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে রীতিমতো আলোচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমতঃ সমালোচকগণ সামাজিক ও ধর্মীয় মাপকাঠি দিয়ে সাহিত্যবিচার করতেন। সামাজিক কল্যাণবোধ না থাকলে তাঁরা সাহিত্য ও সাহিত্যিককে শিরোপা থেকে বঞ্চিত করতেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা সাহিত্যে আদর্শবাদের চড়াসুর পছন্দ করতেন। গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকে এবং হোমরের মহাকাব্যের স্থানে স্থানে নিম্নজীবনের প্রভাব আছে বলে এই সমালোচকের দল এই সমস্ত অমর সৃষ্টিকে মুক্তকণ্ঠে নিন্দা করতে কুণ্ঠিত হন নি। এই আক্রমণ

অ্যারিস্টোফেনিসের হাতে মারাত্মক আকার ধারণ করে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছলে তিনি উন্নততর সাহিত্যাদর্শের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশ করেছেন।

প্লেটো (খ্রীঃ পূঃ ৪২৮-৩৪৭)

বিশ্বমনীষীর গুরুস্থানীয় প্লেটো গত আড়াই হাজার বছর ধরে মননের ক্ষেত্রে অখণ্ড মহিমায় বিরাজ করছেন। জগৎ, মানবজীবন ও দিব্যজীবনের এমন সমীকরণ তাঁর পূর্বে পশ্চিম-জগৎ কল্পনাও করতে পারত না, তাঁর পরেও তাঁর ভাণ্ডার থেকে য়ুরোপ প্রচুর আহরণ করেছে। তিনি নিত্যশুদ্ধ নৈতিক জীবন ও কৈবল্যতত্ত্বকে (The Absolute) যৌক্তিকতা ও দার্শনিকতার বাতায়ন থেকে নিরীক্ষণ করেছেন; শুধু নিষ্ক্রিয় চিন্তাবিলাসিতা নয়, উচ্চ আদর্শের মানসিক রূপনির্মিতিও নয়,—তিনি বিশুদ্ধ আদর্শকে মানবজীবনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। রাজনীতি তাঁর কাছে জীবনবহির্ভূত নীতিমাত্র ছিল না, রাজনীতি ও জীবননীতির বৈষম্য দূরীভূত করবার চেষ্টায় তিনি অত্যাচারী শাসক দ্বিতীয় ডাইয়োনিসিয়াসকে সদুপদেশের দ্বারা পরিচালিত করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হন। এর পর তিনি আর প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে অবতরণ করেন নি। এথেন্সের অদূরে 'অ্যাকাডেমি' স্থাপন করে তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানবিতরণে অতিবাহিত করেন। পৃথিবীর অধুনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সার্থকরূপ তাঁর অ্যাকাডেমিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

তিনি সিসিলি ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ জ্যামিতিক পিথাগোরাসের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর জ্যামিতিতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। মানবচিন্তাপ্রণালী যে জ্যামিতিতত্ত্বের মতো যুক্তির ঋজু পথ ধরে পরিণতির দিকে অভ্রান্ত গতিতে চলেছে, নিশ্চয় তাঁর সে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়েছিল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ মনন

ও উদার কল্পনাশক্তি কিছু জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে তিনি নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এবং সেই আলোচনায় তাঁর যুক্তিপূর্ণ সাত্ত্বিক মন কিছু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর নামে যে সমস্ত রচনা প্রচলিত আছে, তার মধ্যে প্রায় সবটাই উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক। তাঁর গুরু সক্রেটিস এবং শিষ্যদের কথোপকথনের রীতিতে তিনি নানা তত্ত্ব, দর্শন ও নীতির কথা ব্যাখ্যা করেছেন। এই রকম ৪২টি 'কথোপকথনে'র (*Dialogue*) সন্ধান পাওয়া গেছে। পণ্ডিতদের মতে এর মধ্যে কিছু কিছু প্রক্ষেপ আছে; অনুমান মোট ২৭-২৮টি 'কথোপকথন' প্লেটোর রচনা। তাঁর তিনটি 'কথোপকথনে' সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলোচিত হয়েছে: (১) *Phacdrus* (২) *Ion* এবং (৩) *Republic*।

উল্লিখিত আলোচনাগুলি পড়লে প্লেটোর তীক্ষ্ণ মনন সম্বন্ধে কিছু হতাশ হতে হবে। যাঁর রচনা গদ্য হয়েও কাব্য ও নাট্যরসে দ্রবীভূত, বর্ণনাভঙ্গিমা ও বক্রোক্তি এখনও সুখপাঠ্য, তিনি সাহিত্যতত্ত্বের অন্তঃপ্রদেশে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবেশ করেন নি—এটাই পরিতাপের কথা। তিনি মূলতঃ সামাজিক ও মানসিক নীতিচর্যার দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং সাহিত্যের দ্বারা জীবননীতিকে সংশোধিত ও সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন।

প্লেটোর উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্যতত্ত্বের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। *Phaedrus* ও *Ion*-এ তিনি প্রধানতঃ কাব্যসৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা (Inspiration) এবং অনুকরণের (*Mimesis*—imitation) স্থান সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। প্রথম দুটিতে তিনি পাঠক ও কবির প্রতি কিছু সহানুভূতি রক্ষা করতে পেরেছেন—অন্ততঃ *Phaedrus*-এ প্লেটোর মন নীতির চাপে ততটা সঙ্কুচিত হয় নি। *Phaedrus*-এ বর্ণিত সাহিত্যতত্ত্বের মূল কথা হল: কবিরা যেন ঐশ্বরিক প্রভাবান্বিত দিব্যোন্মাদ। তাঁরা সাধারণ লোকের মতো নন,—না মনের দিক দিয়ে, না ভাষার দিক

দিয়ে। লোকে যেমন ভূতগ্রস্ত হয়ে অসম্বদ্ধ কথা বলে—কবিরাও ঠিক সেই রকম। তবে তাঁরা দিব্যশক্তির (*Theia dunamis*) বশে কখনও নবীর মতো অদৃশ্য অধৃষ্য ভাগবত প্রতিভার অধিকারী হন, কখনও-বা উন্মাদের মতো অসম্বদ্ধ মূঢ়তার দ্বারা আবিষ্ট হন। *Phaedrus* থেকে একটু উল্লেখ উদ্ধৃত হচ্ছে :

> তৃতীয় প্রকারের উন্মত্ত হলেন কবিরা—যাঁরা কল্পনার দ্বারা আবিষ্ট হন। এই উন্মত্ততা কবিদের কোমল পবিত্র অন্তঃকরণে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং তাঁদের কল্পনাশক্তিকে এমনভাবে উদ্দীপিত করে যে, তাঁদের গীতিপ্রতিভা এবং অন্যান্য ধরনের সাহিত্যপ্রতিভা জাগ্রত হয়। কবিরা এই শক্তির বলে প্রাচীন বীরপুরুষদের কাহিনী এমন ভাবে বিবৃত করেন যে, পরবর্তিকালে তা থেকে মানুষ অনেক শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু যে কবির মনে কল্পনার উন্মত্ততা প্রবেশ করে নি, তিনি হয়তো মনে করতে পারেন, তিনি শুধু আঙ্গিক বা রচনাকৌশলের দ্বারা কাব্য সৃষ্টি করতে পারবেন; প্রকৃতপক্ষে তা হয় না—অনুপ্রেরণার উন্মত্ততা ব্যতীত কাব্যসৃষ্টি হয় না। সাধারণ মানুষ কি উন্মত্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে? (ভাবানুবাদ)

এখানে লক্ষণীয় যে, প্লেটো কল্পনার উন্মত্ততার ওপরে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং উন্মত্ততা না এলে কাব্যসৃষ্টি হয় না—এ সম্বন্ধে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন; তবে 'সাধারণ মানুষ কি উন্মত্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে'—এই উক্তিতে বোঝা যাচ্ছে এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল—কাব্যসৃষ্টি একরকমের পাগলামি—অবশ্য ঐশ্বরিক পাগলামি। পরবর্তী 'কথোপকথনে' তিনি যে সাহিত্যের প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন, *Phaedrus*-এর এই আলোচনায় তার বীজ উপ্ত হল।

Ion গ্রন্থে প্লেটো আরও বিস্তারিত ও তীক্ষ্ণভাবে অনুপ্রেরণার কথা বলেছেন। আয়োন ছিলেন একজন আবেগোন্মত্ত কথক (Rhapsodist)। তিনি অতিশয় হোমর ভালবাসতেন, তাঁর কাব্য সোচ্ছ্বাসে আবৃত্তি করতেন, কখনও কাঁদতেন, কখনও হাসতেন।

শ্রোতারাও তাঁর আবৃত্তি শুনে অনুরূপ আবেগে ভেসে যেত। আয়োনের সঙ্গে সক্রেটিসের কাল্পনিক কথোপকথন এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য। প্লেটো দেখালেন যে, কবিরা যে ঐশ্বরিক আবেশের বশে কাব্য রচনা করেন, আয়োন-ও অনুরূপ আবেগ ও আবেশের দ্বারা হোমর আবৃত্তি করেন। এ বিষয়ে প্লেটোর উক্তি স্মরণীয়: "ভগবান কবিদের মনকে নিজে গ্রহণ করেন এবং কবিদের নিজের বাণীবাহকে পরিণত করেন; তাই কবিরা যা বলেন, লেখেন—তা তাঁদের কথা নয়। ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের ফলেই তাঁরা কি বলেন, তা তাঁরা জানেন না। কারণ ভগবানই নিজের কথা কবিদের দ্বারা বলিয়ে নেন।...সুতরাং কবিরা হলেন ভগদ্বাণীর ব্যাখ্যাতা, এর দ্বারাই তাঁরা আবিষ্ট হন।" (ভাবানুবাদ) এ কথার উত্তরে আয়োন সক্রেটিসের কাছে স্বীকার করে বললেন, "এ কথাটা আমারও মনে লাগছে। আমি স্বীকার করছি, আমি যখন করুণ ঘটনা আবৃত্তি করি, তখন আমার চোখ জলে ভরে আসে, যখন বীভৎস ভয়ঙ্কর ঘটনা আবৃত্তি করি তখন আমার গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে, বুক ধড়ফড় করতে থাকে।" এই কথার উত্তরে সক্রেটিস বললেন, "কোন কোন লোক যখন দেবমন্দিরে বলি দেখতে যায় বা কোনো উৎসবে অংশ গ্রহণ করে, তখন তার মনে একটা অদ্ভুত ভাব জাগে। সে মনে করে, তার দামিদামি পোশাক, সোনার মুকুট কেউ কেড়ে নেবে, —যদিও সত্যি সত্যি কেউ কেড়ে নিচ্ছে না—তবু সে সেইরকমভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। তাকে কী বলা যাবে? সে কি তখন সুস্থ মস্তিষ্কের অবস্থায় আছে? তেমনি যে কবি অনুপ্রেরণার বশে এবং ভাগবত নির্দেশের চাপে সেইরকম মনোভাবের আশ্রয় নেয়, সেও কি সুস্থ স্বাভাবিক মনের পরিচয় দেয়? সুতরাং যা বাস্তবে নেই, ঐশ্বরিক নির্দেশ বা অনুপ্রেরণা যাই হোক না কেন,—কবিরা সেই ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে উন্মত্তে পরিণত হয়, আর না হলে হয় মিথ্যাচারী, অসাধু।"[২]

২ স্থানসঙ্কোচনের জন্য মূল উক্তিকে সংক্ষেপে ভাষান্তরিত করতে হয়েছে।

সক্রেটিস ও আয়োনের এই উক্তিপ্রত্যুক্তির সাহায্যে প্লেটো কাব্যনির্মিতিকে প্রধানতঃ ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা বলেছেন। এতে তাঁকে শিল্প ও সাহিত্যের গুণগ্রাহী ও বন্ধু বলে মনে হবে।[৩] বাহ্যতঃ এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্লেটো যে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার কথা বলেছেন, তা শিল্প ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার—যদিও একটু ঈশ্বর-ঘেঁষা। 'কবিবাণীই ভগবদ্বাণী'—প্লেটোর এ কথাতে আমাদের উল্লসিত হবারই কথা।

কিন্তু একটু অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, তিনি সূক্ষ্মভাবে শিল্প ও সাহিত্যের বিরোধিতাই করেছেন। প্রথমতঃ তাঁর মতে কবিগণ উন্মত্ততার আবেশে কি বলেন তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না—হোক সে আবেশ ঐশ্বরিক। অর্থাৎ শেক্‌সপীয়রের ভাষায়—

> The lunatic, the lover and the poet
> Are of imagination all compact......

দ্বিতীয়তঃ কবিকে তিনি মিথ্যাচারী বলেছেন। বাস্তবে কিছু নেই, অথচ তদ্‌ভাবে ভাবিত হয়ে কবিরা আয়োনের মতো কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও ভয়ের বশীভূত হন—এ একপ্রকার মিথ্যাচার ছাড়া কি? তাই *Ion*-এ প্লেটো শিল্পের যথার্থ স্বরূপকেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। তিনি যখন কবিশিল্পীকে পাগল ও মিথ্যাবাদী বলেছেন, তখন তাঁকে আর যাই বলা যাক, কিছুতেই শিল্পের বন্ধু বলা যাবে না।

প্লেটোর তৃতীয় গ্রন্থ *Republic*-এ কবিসাহিত্যিকের বিরুদ্ধে নির্মমতম কটূক্তি আছে। তিনি তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র (Republic) থেকে মিথ্যাচারী কবিসাহিত্যিকদের নির্বাসিত করবেন, *Republic* গ্রন্থে খুব সুদৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত করেছেন। এই গ্রন্থটি তাঁর মধ্যজীবনে গৌরবের চরম সময়ে লেখা হয় এবং এতে তাঁর পরিপক্ক মনের ছাপ পড়েছে। সুতরাং এতে বর্ণিত মতামতকে তাঁর

---

৩ *The Principles of Art*-এর গ্রন্থকার R. G. Collingwood প্লেটোকে শিল্পসাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু বলে গ্রহণ করেছেন।

চূড়ান্ত অভিমত বলে গ্রহণ করা যায়। এর ২য়, ৩য় এবং ১০ম অধ্যায়ে প্লেটোর শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে মতামত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

প্লেটো এই সময়ে সামাজিক ও নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি একটি আদর্শ রাষ্ট্রের (Republic) পরিকল্পনা করেন। *Republic* গ্রন্থের ২য় অধ্যায় থেকে ৭ম অধ্যায় পর্যন্ত আদর্শ রাষ্ট্রের যে বর্ণনা আছে, তাতে ন্যায়পরতা ও সুবিচারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই আদর্শ রাষ্ট্রের পরিচালক হবেন বীরপুরুষ ও দার্শনিক; তাঁদের বলা হয়েছে জন-অভিভাবক (The Guardians)। এমন রাষ্ট্রে কবির স্থান হতে পারে না; কারণ কবিরা শুধু মিথ্যাই বলেন না, মিথ্যাকে সুন্দর করে বলেন, জনমনোলোভন করে অবাস্তব মিথ্যাকে সুসজ্জিত করেন।

একজন ছুতোর যখন কাঠের চৌকি তৈরি করে, তখন সে কি করে? প্লেটোর মতে জগতে একটা চৌকি আছে যা ঈশ্বরসৃষ্ট। ছুতোর সেই আদিতম চৌকির একটা নকল তৈরি করে। আবার শিল্পী বা সাহিত্যিক চৌকির ছবি আঁকতে হলে বা চৌকির বিষয়ে কিছু লিখতে হলে ছুতোরের তৈরী চৌকির শৈল্পিক নকল করেন। অর্থাৎ শিল্পিসাহিত্যিক নকলের নকল করেন। কাজেই কোন দিক দিয়ে তাঁদের স্রষ্টা বলা যায় না। "All the poets are imitators of images of virtue and of all the other subjects on which they write, and do not lay hold of truth." পরিশেষে সক্রেটিস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন :

১। নকলকারী কবিশিল্পী নকলকরা বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

২। অনুকরণ একপ্রকার কৌতূহলজনক আনন্দপ্রদ ব্যাপার, গভীরতর চিত্তপ্রবৃত্তি নয়।

৩। যারা কাব্য বা নাটক লেখে তারা সকলেই বড় দরের নকলনবীশ।

কবিরা শুধু নকলনবীশ নন, তাঁরা মিথ্যাচারী অসাধু। হোমর হেসিয়ড—এঁরা দেশপূজ্য কবি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এঁরা কি পূজা পাবার উপযুক্ত? তাঁরা জগদ্‌বরেণ্য দেবদেবীকে কুৎসিত করে এঁকেছেন। হোমরের দেবতারা প্রতিহিংসাপরায়ণ, নির্মম, মিথ্যাবাদী, কামুক এবং নিজেরাই দ্বন্দ্বকলহে মত্ত। ন্যায়াধীশ দেবতারা কখনও এমন দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারেন? অথচ হোমর তো এইভাবেই চিত্রিত করেছেন। বীরপুরুষের চরিত্র অঙ্কনেও কি তিনি সুবিচার করতে পেরেছেন? একিলিস-প্রায়ামের মতো বীরপুরুষেদেরও তিনি হাপুস নয়নে কাঁদিয়ে ছেড়েছেন। সুতরাং প্লেটোর মতে হোমর ও হেসিয়ড তাঁদের কাব্যে দুর্নীতিই প্রচার করেছেন। এমন কবিশিল্পীকে প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে কি করে স্থান দেবেন?[৪] কাব্যকে যদি প্রবেশাধিকার দিতেই হয়, তাহলে যে কবি শুধু দেবতা ও মহামানবের গুণগান করেন, কেবল তাঁরই ঠাঁই মিলবে ঐ আদর্শ রাষ্ট্রে।

প্লেটো রাষ্ট্রনীতি, সামাজিকতা ও চরিত্রনীতির দ্বারা অধিকতর পরিচালিত হয়েছিলেন বলে সাহিত্যতত্ত্বের মূল কথাগুলো ধরতে পারেন নি। শিল্প ও সাহিত্য স্বভাবের যথাযথ নকল নয়; তা আরেক প্রকার সৃষ্টি। এই সত্যটি বুঝতে অপারগ হয়েছিলেন বলে তিনি সাহিত্য ও শিল্পের স্বরূপ নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে সমালোচনার ইতিহাস থেকে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। তিনিই সর্বপ্রথম নিয়মানুগতভাবে সাহিত্যতত্ত্ব

---

৪ *Republic*-এ প্লেটো সক্রেটিসের জবানিতে কবিদের আদর্শ রাষ্ট্র থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলেছেন—"Then we may now with justice refuse to allow him entrance to a city which is to be well governed, because he arouses and fosters and strengthens this part of the soul and destroys the reasoning part. Like one who gives a city over into the hands of villains, and destroys the better citizens, so we shall say that the imitative poet likewise implants an evil constitution in the soul of each individual; he gratifies foolish element in it, that which cannot distinguish between great and small but thinks the same things are sometimes great and sometimes small and he manufactures images very far removed from the truth." (Chap.X)

বিচার করেছিলেন—যদিও সে বিচার অস্বচ্ছ দৃষ্টির জন্য অস্পষ্ট হয়ে গেছে। সাহিত্য বিষয়ে তাঁর মূল্য বক্তব্য হল দুটি; (১) অনুকরণ (২) অনুপ্রেরণা। 'অনুকরণ'-তত্ত্ব যদিও পরবর্তিকালে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর অবলম্বিত 'অনুপ্রেরণা', যা সক্রেটিস আয়োনকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা সাহিত্যতত্ত্বের মৌলিক কথা এবং অত্যন্ত মূল্যবান অংশ। অবশ্য কেউ কেউ প্লেটোর প্রতি অতিভক্তিবশতঃ তাঁর অনুকরণতত্ত্বকে (*Mimesis*) প্রশংসা করে বলতে চান যে, আধুনিক কালে যাকে আমরা বাস্তববাদ বলি, তা নাকি প্লেটোর মধ্যেই প্রথম ধরা পড়ে। বাস্তবতা যেমন বাস্তবধর্মী সাহিত্যের মূল লক্ষ্য, তেমনি বহু পূর্বে প্লেটোও বলেছিলেন যে, সাহিত্যিক বস্তুর নকল করেন। এ বিষয়ে আমাদের মনে হয় যে, প্রথমতঃ বাস্তবতাই সাহিত্যের একমাত্র পরিণতি নয়। দ্বিতীয়তঃ প্লেটোর *mimesis* এবং আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের বাস্তবতা এক জিনিস নয়। প্লেটোর মতে শিল্প ও সাহিত্য বাস্তবের ছায়া অনুসরণ করে বলেই তা নকলের নকল এবং দুর্বল। আধুনিক বাস্তবপন্থী সাহিত্যিকের কাছে বাস্তবতাই সাহিত্যের একমাত্র গুণ। একজনের কাছে যা হানিকর দোষ, অপরের কাছে তা আদরণীয় গুণ। প্লেটোর মতামত আজ হয়তো স্বীকৃতি পাবে না, তবে তিনি আমাদের মধ্যে সাহিত্যবিষয়ক নানাবিধ প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছেন বলে চিরকাল মানব-মননে বেঁচে থাকবেন।

অ্যারিস্টট্‌ল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২)

প্লেটোর যোগ্যশিষ্য অ্যারিস্টট্‌ল য়ুরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যের জনক বলে অভিহিত। গুরুর অ্যাকাডেমির সেরা ছাত্র এবং গুরুর একান্ত অনুরাগী হয়েও তিনি একলব্যের মতো নিজের আঙুল কেটে শিষ্য-কৃত্য করেন নি। তিনি প্লেটোর শিল্পতত্ত্বকে নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করেছেন, এবং প্রায়শঃই প্রতিবাদ করে যেভাবে শিল্পের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, য়ুরোপে বহু শতাব্দী

ধরে সেই আদর্শই একমাত্র সাহিত্যাদর্শ বলে গৃহীত হয়েছে। যদিও আমরা জানি অ্যারিস্টট্‌লের বিখ্যাত *Poetics* (যথার্থ নাম—*Concerning the Art of Poetry*) গ্রন্থটির রচনা অত্যন্ত শিথিল, এর অনেক উক্তি স্ববিরোধী, কোথাও সামান্যকথন প্রভৃতি নানা ত্রুটি আছে, কিন্তু তবু সাহিত্যবিচারে অ্যারিস্টট্‌লকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

অ্যারিস্টট্‌ল গ্রীক ছাড়া অন্যভাষা জানতেন না, গ্রীকসাহিত্যের সমস্ত শাখার বিস্তারিত বিবরণও দেন নি। ট্র্যাজেডির বর্ণনাই *Poetics*-এর বারো আনা অংশ অধিকার করে আছে। তিনি এতে মুখ্যতঃ ট্রাজেডি, গৌণতঃ মহাকাব্য এবং প্রসঙ্গক্রমে কমেডির উল্লেখ করেছেন। গীতিকবিতা সম্বন্ধে তাঁর নীরবতা পীড়াদায়ক। সাফো এবং পিণ্ডারের উৎকৃষ্ট গীতিকবিতাগুলি তাঁর পূর্বে রচিত হলেও তিনি *Poetics*-এ এ বিষয়ে কিছুই বলেন নি। শোনা যায় *Poetics*-এর নাকি দ্বিতীয় খণ্ড লেখা হয়েছিল এবং হয়তো তিনি এতেই গীতিকবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই ধরনের অনুমানের ওপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। যাই হোক, *Poetics*-এ সামান্য লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণে কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও এর মধ্যে ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হয়েছে, তার মূল্য অসাধারণ, এবং সে সব উক্তি শুধু প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, আধুনিক সাহিত্যবিচারে অ্যারিস্টট্‌লের অনেক মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত এখনও নানা কৌতূহল জাগাতে সক্ষম।

অ্যারিস্টট্‌ল প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক। প্লেটো দার্শনিক ও কবি। তাই অ্যারিস্টট্‌লকে নানা প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে সাহিত্য-বিচার করতে হয়েছে। প্লেটোর লেখায় যে রকম কাব্যসৌন্দর্য ও শিল্পগুণ আছে, শিষ্যের নীরস লেখায় তার কোন আস্বাদই পাওয়া যায় না। তিনি নিঃস্পৃহ বৈজ্ঞানিকের মতো তদানীন্তন গ্রীক সাহিত্য অবলম্বনে সাহিত্যের রূপ-রীতি, বিষয়বস্তু ও আবেগ-অনুভূতির স্বরূপ বিচার করেছেন। তাঁর পিতা ছিলেন বৈদ্য, সুতরাং

তিনি পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে বৈজ্ঞানিকতা অর্জন করেছিলেন, আর গুরুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন অবিরাম জ্ঞানানুশীলন। উত্তরজীবনে তিনি প্লেটোর অ্যাকাডেমির অনুসরণে 'লাইসিয়াম' নামক বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজ্ঞান ছাড়াও তিনি রাজনীতি, তর্কবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ও সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তাতেই বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় দিয়েছেন—যা প্লেটোর মধ্যে ততটা ছিল না। তিনি প্লেটোর কোন কোন মতের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে সে যুগে অনেকে মনে করত যে, গুরুশিষ্যের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষার সম্পর্ক ছিল। সে যাই হোক, তিনি গুরুর মতের কিছু কিছু প্রতিবাদ করলেও তাঁকে কখনও অশ্রদ্ধা করেন নি বা তাঁকে ছাড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করেন নি।

Poetics প্রধানতঃ সাহিত্য-ও শিল্প-বিষয়ক বিচ্ছিন্ন রচনা। তাঁর *Rhetoric* গ্রন্থে বাগ্মিতা ও অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। কিন্তু *Poetics*-এর জন্যই তাঁর জগৎজোড়া খ্যাতি। এর পূর্বে কেউ বিশুদ্ধ ও সৌন্দর্যের দিক থেকে সাহিত্যবিচার করেন নি, এর পরেও অনেকে সাহিত্যবিচারে সৌন্দর্য ও আনন্দকে একমাত্র লক্ষ্য-বস্তু বলে মানতে পারেননি সাহিত্য ও শিল্পকে সমাজ বা নীতির প্রয়োজনে না লাগিয়ে তাকে মানবজীবনের আনন্দলোকে স্থাপন করে অ্যারিস্টটল সাহিত্যতত্ত্বের মূল বনিয়াদ পাকা করে গেছেন।

অবশ্য *Poetics* গ্রন্থহিসেবে কিছু দুর্বল রচনা। মনে হয় এটা তাঁর বক্তৃতার বিচ্ছিন্ন অংশ। কোন ছাত্র হয়তো তাঁর বক্তৃতার অনুলিপি প্রস্তুত করেছিল; সেটাই পরবর্তিকালে তাঁর রচনা বলে প্রচারিত হয়েছে। কিংবা এই টুকরো নোটগুলোকে হয়তো তিনি অধ্যাপনার সময় ব্যবহার করতেন। অন্ততঃ এটাকে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ-পুস্তক বলা যায় না। এর মধ্যে স্থানে স্থানে অসঙ্গতি আছে। তাঁর অন্যান্য রচনায় যে যুক্তিক্রম ও রচনার পরিচ্ছন্নতা দেখা যায়, *Poetics* সে রকম নয় বলে এর প্রামাণিকতা নিয়ে কিছু কিছু সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

Poetics-এ প্রধানতঃ শিল্পের শ্রেণী ও বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। সাহিত্য, সাহিত্যের বিষয়বস্তু, শ্রেণীবিন্যাস, প্রকাশরীতি (medium), মানবমনে সাহিত্যের প্রভাব প্রভৃতি নিয়ে তিনি এতে যে আলোচনা করেছেন তার মৌলিকতা বিস্ময়কর। ট্র্যাজেডির স্বরূপ ও লক্ষণ নিয়ে এতে দীর্ঘ আলোচনা আছে এবং লেখক যেন ট্র্যাজেডি বর্ণনার জন্যই কলম ধরেছিলেন। পরে ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনা দিয়ে মহাকাব্যের বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, মহাকাব্য ট্র্যাজেডির কাছে কিছু খর্ব। এ ছাড়া তিনি প্রসঙ্গক্রমে কমেডি ও গীতিকবিতার কথা খুব সংক্ষেপে বলেছেন। এই গ্রন্থ পড়তে পড়তে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, লেখক ট্র্যাজেডির প্রতি এত আসক্ত ছিলেন যে, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার প্রতি সুবিচার করার অবকাশ পান নি।

অ্যারিস্টট্লের ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা সুপরিচিত: 'Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude ; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play ; in the form of action, not of narrative ; through pity and fear effecting the proper purgation." এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ট্র্যাজেডি হল একটি গভীর, পূর্ণাঙ্গ পরিমিত ঘটনাপ্রবাহ, যার ভাষায় শিল্পগুণ থাকবে ; তা বিবৃতিমূলক হবে না, মূলতঃ ঘটনাশ্রয়ী হবে এবং এর দর্শন বা পাঠের ফলে মনের মধ্যে করুণা ও ভীতি জাগ্রত হয়ে ঐ প্রবৃত্তিগুলোর শমতা বিধান করবে। এই ট্র্যাজেডি হল সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প ; মহাকাব্য এই ট্র্যাজেডি থেকেই জন্মলাভ করেছে; কমেডি ট্র্যাজেডির চেয়ে নিম্নস্তরের রচনা। ট্র্যাজেডির চরিত্র বাস্তবের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও মহৎ ; কমেডির চরিত্র বাস্তব থেকে নিকৃষ্ট। অ্যারিস্টট্লের মতে ট্র্যাজেডিতে সাহিত্যের সমস্ত অঙ্গ ও বৈশিষ্ট্য স্থান পেয়েছে—মহাকাব্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমস্ত লক্ষণ নেই।

ট্র্যাজেডির কাহিনীর সঙ্গে মহাকাব্যের কাহিনীর সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু মহাকাব্যের রচনার ঐক্য কিছু শিথিল। কারণ মহাকাব্য বিবৃতিমূলক, সুতরাং এই ধরনের গ্রন্থ অনেকটা স্থান অধিকার করতে পারে—ট্র্যাজেডির যে সুযোগ নেই। কাজেই ট্র্যাজেডির কাহিনীনির্মাণে 'ত্রয়ী ঐক্যতত্ত্বে'র (Three Unities) আশ্রয় নিতে হয়। মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি রচনার পন্থাও (medium) পৃথক। ট্র্যাজেডিতে বর্ণনামূলক ঘটনাসংঘাতের সাহায্যে কাহিনী বিবৃত হয়। আর মহাকাব্যে কবিতার মারফতে কাহিনী বর্ণিত হয়। এর ফলে মহাকাব্যে ছোট ছোট ঘটনা বিবৃত করা সম্ভব হয়, এবং আশ্চর্য ও অদ্ভুত ব্যাপার অক্লেশে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু ট্র্যাজেডি মূলতঃ অভিনয়মূলক বলে এতে সে সুযোগ নেই। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিনি ট্র্যাজেডিকেই বরমাল্য দিয়েছেন। "It (i. e. Tragedy) has all that Epic has—it can use the metre of Epic—and a very considerable addition in music and scenic accessories ; and it is music which gives the greater vividness to the combination of pleasurable emotions produced by tragedy." তা হলে দেখা গেল, ট্র্যাজেডিতে এপিকের সব লক্ষণই আছে। আবার তা ছাড়াও কতকগুলো বেশি সুবিধেও আছে। যেমন ট্র্যাজেডিতে সঙ্গীত ও দৃশ্যসজ্জা আছে—এ সুযোগ মহাকাব্যের নেই। তাই অ্যারিস্টট্‌লের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য হল ট্র্যাজেডি।

Poetics-এর ১৩শ ও ১৪শ অনুচ্ছেদে মহাকাব্যের বিষয়ে কিছু আলোচনা আছে। মহাকাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অ্যারিস্টট্‌ল ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, "As to the poetic imitation which is narrative in form and employs a single metre, the plot manifestly ought, as in tragedy, to be constructed on dramatic principles. It should have for its subject a single action, whole and

complete, with a beginning, a middle and an end." একই ছন্দে রচিত বিবৃতিমূলক এবং নাট্যগুণাশ্রয়ী কাহিনী হবে মহাকাব্যের বিষয় ; এর বিষয়বস্তুটি হবে একটি ঘটনা—যার আরম্ভ, মধ্যভাগ ও উপসংহার থাকবে। এর পরে তিনি মহাকাব্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তার অনেকটাই ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনা-মূলক বিচার-বিশ্লেষণ। ট্র্যাজেডির জন্য তিনি যেমন অনেকটা অংশ নিয়েছেন, মহাকাব্য বা কমেডির বিষয় আলোচনায় তিনি ততটা বিস্তৃত বিশ্লেষণের সাহায্য নেন নি। ট্র্যাজেডিই তাঁর মূল বক্তব্য ; কমেডি-মহাকাব্য শুধু ট্র্যাজেডি আলোচনাপ্রসঙ্গে এসে পড়েছে—ট্র্যাজেডির বাইরে এদের কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আলোচনা *Poetics*-এ পাওয়া যাবে না।

অ্যারিস্টট্‌ল-ব্যাখ্যাত সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখা যাবে যে, তিনি মূলতঃ তিনটি প্রধান তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করেছেন যা বিশেষভাবে মৌলিক বলে সর্বযুগেই স্বীকৃত হয়েছে। সেগুলি হল—(১) বিভিন্ন শিল্পের পারস্পরিক যোগ (২) অনুকরণ বা *mimesis* (৩) ক্যাথারসিস (*katharsis*) বা পরিশুদ্ধকরণ।

১। তিনি দেখিয়েছেন যে, মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি, কমেডি, ডিথি-র‍্যাম্ব (গীতিকবিতা), বাঁশির সুর ও বীণার ঝঙ্কার—এ সমস্তই জীবনের অনুকৃতি বা সৃষ্টি ; তাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে। শুধু তফাত হচ্ছে রচনার মাধ্যম (medium) বা অবলম্বন, বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশল। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য এক শিল্পকে অপর শিল্প থেকে পৃথক করে তোলে। এখানে তিনি প্লেটোকে অতিক্রম করে সমস্ত শিল্পের মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগ খুঁজে পেয়েছেন। প্লেটো যেমন চিত্রবিদ্যার সাহায্যে সাহিত্যকে আক্রমণ করেছিলেন, অ্যারিস্টট্‌ল কিন্তু সে পথে না গিয়ে প্রত্যেক শিল্পবস্তুর মধ্যে প্রকাশের পার্থক্য সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ ঐক্য আবিষ্কার করেছেন।

২। তাঁর যে তত্ত্বটি মৌলিকতা দাবি করে থাকে, তা হল *mimesis* বা অনুকরণ। প্লেটোও অনুকরণের কথা বলেছেন।

তা হলে অ্যারিস্টট্‌ল এ বিষয়ে কী এমন নূতন তত্ত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করলেন? তিনিও সমস্ত শিল্পকে 'modes of imitation' বলেছেন। *Poetics*-এর সর্বত্র এই *mimesis* (imitation)-এর ছড়াছড়ি। তাঁর কাছে 'Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete and of certain magnitade." Comedyও তাঁর মতে "an imitation of characters of a lower type." তা হলে কি তিনি *mimesis* বলতে প্লেটোর মতো স্তবজগতের হুবহু অনুকৃতিকেই শিল্প-সাহিত্য আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন?

তাঁর ব্যবহৃত *mimesis* যে অনুকরণ নয়, তার প্রমাণ *Poetics*-এ আছে। কারণ তিনি বলেছেন, ট্র্যাজেডিতে বাস্তব মানুষের উৎকৃষ্টতর চরিত্র অঙ্কিত হয়, আর কমেডিতে অঙ্কিত হয় নিকৃষ্টতর চরিত্র। বাস্তবের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হলে তাকে বাস্তবের অবিকল অনুকরণ বলা যায় কি? তা নিশ্চয় বাস্তব অতিক্রম করে চলে যায়। ট্র্যাজেডির চরিত্র বাস্তবের চেয়ে বড়; সুতরাং এই উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি *mimesis* বলতে imitation বোঝান নি। তিনি এক স্থানে (*Poetics*—XXV) কবির স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন, "The poet being an imitator like a painter or any other artist, must of necessity imitate one of three objects,—things as they were or are, things as they are said or thought to be, or *things as they ought to be.*"[৫] এখানে লক্ষণীয় কবি অন্যান্য শিল্পীর মতো বস্তুজগৎকে অনুকরণ করেন বটে, কিন্তু শুধু হুবহু অনুকরণ করেন না; *things as they ought to be*—এতেই বোঝা যাচ্ছে, কি রকম হওয়া উচিত, তাও কবির বক্তব্য। সুতরাং অ্যারিস্টট্‌ল অনুকরণ বলতে শুধু বাস্তবের অবিকল অনুকরণ বোঝান নি—এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে।

---

৫ বাঁকা অক্ষর আমাদের দেওয়া

অ্যারিস্টটল *mimesis* বলতে যথার্থ কি বুঝিয়েছিলেন, তা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি সাহিত্যকে সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন, প্লেটোর মতো চিত্রের সঙ্গে তুলনা দেন নি। প্লেটো বলেছেন, চিত্রী যেমন ছবিতে বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ করেন, তেমনি কবিও নকল করেন মাত্র। কিন্তু অ্যারিস্টট্‌ল দেখলেন যে, কবি চিত্রীর সঙ্গে তুলনীয় নন, বরং সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে কবিকৃতির তুলনা চলে। গান বাস্তবের নকল নয়। বসন্ত রাগে কি সত্যি সত্যি কোকিল ডাকের নকল করা হয়, না মল্লারে ময়ূরের কাংস্য ক্রেংকার ও মেঘের বজ্রগর্জন অনুকৃত হয়? গান দৈনন্দিন বাস্তবতা ছাড়া অন্য কিছু। নৃত্যও বাস্তব চলনভঙ্গিমার নকল নয়; নৃত্যের তাল, ছন্দ, মুদ্রা, ভঙ্গিমা বাস্তবকে যথাযথ অনুকরণ করে না, বরং বাস্তবাতিরিক্ত আবেগ ও সৌন্দর্য প্রকাশ করে। অ্যারিস্টট্‌লের মতে সাহিত্যও ঠিক বাস্তবের অনুকরণ করে না, ঐ সঙ্গীত ও নৃত্যের মতো বাস্তবাতিচারী ভাবসংবেগ সৃষ্টি করে। অবশ্য তিনি স্পষ্টতঃ *mimesis*-এর কোন টীকাভাষ্য করেন নি, পরবর্তিকালের গবেষকেরা এর নানা অর্থ করেছেন।

কাব্য যে বাস্তবছাড়া অন্য কিছু, তার প্রমাণ—কাব্য বাস্তবের অন্ধ অনুকরণ হলে লোকে বাস্তব ছেড়ে দিয়ে কাব্যানুশীলনে কেন প্রবৃত্ত হবে? নিশ্চয় কাব্য বাস্তব-ব্যতিরিক্ত আরেক প্রকার সত্তা, যা বাস্তবে অবিকল মেলে না; তাই লোকে কাব্য পাঠ করে।

তা হলে দেখা গেল যে *mimesis* বাস্তবের অনুকরণ নয়—কল্পনার অনুকরণ।[৬] আমরা কাব্যে প্রকৃতির হুবহু নকল দেখতে চাইনে, কারণ মূলটা (অর্থাৎ প্রকৃতি) তা চোখের সামনেই রয়েছে। বরং প্রকৃতির মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে, আমরা তাকেই কল্পনার দ্বারা নতুন করে সৃষ্টি করতে চাই। ট্রয়যুদ্ধ কবে হয়েছে তার বস্তু-

---

৬"Poetic imitation does not mean mimicry. How can poetry imitat men as better or as worse then real life? Obviously, not by copying nature but only by imitating imagination." (Abercrombie—***Principles of Criticism***

যাথার্থ্য নিয়ে ঐতিহাসিকেরা মাতামাতি করুন, কিন্তু হোমরের মনের মধ্যে ট্রয়যুদ্ধ নতুন রূপ লাভ করেছে। হোমর কল্পনার সাহায্যে বাস্তব ট্রয়যুদ্ধকে নতুন সৃষ্টি করেছেন। তাই অ্যারিস্টট্‌লের *mimesis*কে কেউ কেউ 'কল্পনার সাহায্যে নতুন সৃষ্টি' বলতে চান।

কেউ কেউ এই অনুকরণকে technique বা রচনাকৌশল বলতে চান। রচনাকৌশলের দ্বারা বাস্তব উপাদান সাহিত্যে পরিণত হয়। একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল—সেটা হল বাস্তব। তাকেই যখন কবি বা নাট্যকার কবিতা বা নাটকের মারফতে বর্ণনা করবেন, তখন তা সাহিত্য হয়ে উঠবে। কবিতার ছন্দ, ভাষা, অলঙ্কার প্রভৃতি এবং নাটকের চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ প্রভৃতির সাহায্যে একটা বাস্তব ঘটনা শিল্পরূপ লাভ করে। তা হলে দেখা যাচ্ছে বাস্তব ঘটনাই রচনাকৌশলের দ্বারা রসবস্তু হয়ে ওঠে। কাব্যে 'অনুকরণ' বলতে এই technique বা রচনাকৌশলের অনুকরণ বুঝতে হবে।

অবশ্য এই অনুকরণকে প্রকাশ বা expression বলেও ধরে নেওয়া যায়। সাহিত্য মানবজীবনকে প্রকাশ করে, ঠিক অনুকরণ করে না। বস্তু যখন সাহিত্যে প্রকাশিত হয়, তখন তা সাহিত্যিকের মন এবং সাহিত্যের বাহনের (medium) মধ্য দিয়ে আসে। সাহিত্যিক একটা বাস্তব ঘটনাকে মানসিক রূপ দেন এবং সেই মানসিক ভাববস্তুকে তিনি বিশেষ ধরনের রচনা-কৌশলের সাহায্যে প্রকাশ করেন। সুতরাং অ্যারিস্টট্‌লের *mimesis* বা 'অনুকরণ'কে বাস্তবের অনুকরণ না বলে বরং বাস্তবের পুনর্গঠন বলা চলতে পারে। শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে অ্যারিস্টট্‌লের এই কথাটাই সর্বাধিক মৌলিক বলে স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ অনুকরণ নয়, সৃষ্টিই হচ্ছে সাহিত্যের মূল কথা। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেছেন, বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাবের মারফতে লৌকিক ভাব অলৌকিক রসে পরিণত হয়।

অ্যারিস্টট্‌লের *mimesis* অনেটা এই বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাবের সঙ্গে তুলনীয়। এই *mimesis*-এর সাহায্যেই বাস্তব ঘটনা শিল্পরূপ লাভ করে। সুতরাং বস্তুর শিল্পরূপ ও বাস্তবরূপ এক নয়।

৩। অ্যারিস্টট্‌ল ট্র্যাজেডির ফলশ্রুতি বর্ণনা প্রসঙ্গে *Katharsis* শব্দের প্রয়োগ করেছেন। এর ইংরাজী প্রতিশব্দ হল purgation—যা রোগনিদানশাস্ত্রে চিকিৎসা-প্রকরণ হিসেবে ব্যবহৃত। অ্যারিস্টট্‌ল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ট্র্যাজেডির দ্বারা আমাদের চিত্তে করুণা ও ভীতি উদ্রিক্ত হয়ে শমতা লাভ করে।[৭] যেমন রোগীর মাথায় রক্ত চড়ে গেলে চিকিৎসক রক্ত মোক্ষণ করে রোগীকে সুস্থ করেন, তেমনি ট্র্যাজেডি দর্শনে আমাদের মনোবিকার হ্রাস পেয়ে যায়। এই *Katharsis* শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে বিশেষ মতভেদ হয়েছে। প্লেটো বলেছিলেন যে, সাহিত্য ও শিল্প মানুষকে দূষিত করে। অ্যারিস্টট্‌ল বোধহয় তারই প্রতিবাদে এই *Katharsis* শব্দ প্রয়োগ করে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, সৎসাহিত্য মানুষকে কলুষিত করে না; ট্র্যাজেডি দেখে আমাদের চিত্ত মলিনতামুক্ত হয়—এরই নাম *Katharsis* (purgation)। ট্র্যাজেডি দর্শন করার পর আমাদের মনের মধ্যে করুণা ও ভীতি জাগে; যার ফলে আমাদের সমস্ত কুপ্রবৃত্তি নির্গত হয়ে যায়, আমাদের মন তখন শমতা লাভ করে। এই *Katharsis*-এর প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে গবেষকদের মধ্যে কিছু মতভেদ হয়েছে। এর অর্থ যা-ই হোক, অ্যারিস্টট্‌ল কিন্তু এই শব্দটিকে রোগনিরাময়ের অনুরূপ অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন। এই 'purgation' অর্থটি প্লেটোর *Phaedo*-তেও আছে। সেখানে প্লেটো বলেছেন যে, সত্য মন থেকে সুখদুঃখ ও ভীতিকর অনুভূতিকে নিষ্কাশিত করে দেয়। ("Truth is in fact

---

[৭] "Through pity and fear tragedy effects the purgation of emotions." *(Poetics)*

a kind of purgation of all such pleasures and fears.") সুতরাং অ্যারিস্টট্‌লের আগে থেকে দার্শনিক আলোচনায় *Katharsis* শব্দটি purgation অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। সম্প্রতি সমালোচকগণ এই শব্দটিকে সাহিত্যক্ষেত্রে দু অর্থে প্রয়োগ করতে চান। (১) রোগনিরাময়তা—অর্থাৎ আমাদের মনের মধ্যে আবেগগুলি যখন হানিকর হয়ে ওঠে তখন ট্র্যাজেডি দর্শনের পর সেগুলিকে মনের বাইরে বার করে দিয়ে মনকে প্রশান্ত করা যায়। (২) পবিত্রকরণ—অর্থাৎ করুণা ও ভীতি—যা আমাদের মধ্যে স্বার্থের আকারে আবির্ভূত হয়, তাকে দূর করে মনকে ক্ষুদ্র স্বার্থের ওপরে তুলে সৌন্দর্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। প্রথমটি নৈতিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত, দ্বিতীয়টি সৌন্দর্যতত্ত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অ্যারিস্টট্‌ল বোধ হয় প্রথম অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সহজ কথায় *Katharsis*-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলা চলতে পারে: ট্র্যাজেডি পাঠ বা অভিনয়দর্শনে একপ্রকার বিশিষ্ট সাহিত্যকৃতি ও শিল্পের সঙ্গে পরিচয় তো হয়ই; তার ওপর যে সমস্ত উপদ্রবকারী অনুভূতি আমাদের চিত্তকে উৎপীড়িত ও অশান্ত করে ফেলে, ট্র্যাজেডি সেগুলোকে আমাদের মন থেকে বহিষ্কৃত করে; আমরা তারপর নতুন জ্ঞান ও সৌন্দর্য লাভ করি, মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। ট্র্যাজেডি মনকে উচ্চতর মার্গে নিয়ে যায়, মনের ময়লা বার করে দেয়—*Katharsis* শব্দের মধ্যে এই রকম একটা তাৎপর্য নিহিত আছে।

অ্যারিস্টট্‌ল সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে উল্লিখিত কতকগুলি মৌলিক সমস্যার অবতারণা ও সমাধান করেছেন। সে সমস্যা ও সমাধান একটা বিশেষ যুগে আবির্ভূত হয়েছিল; তারপর প্রায় আড়াই হাজার বছর চলে গেছে, জগৎ ও জীবনের তত্ত্ববাদ অনেক বদলে গেছে। অ্যারিস্টট্‌ল গ্রীক সাহিত্যের বাইরে অন্য সাহিত্যের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতেন না। তিনি শেকস্‌পীয়র, ইবসেন, শয়ের নাটক

পড়লে ট্র্যাজেডি-কমেডি সম্বন্ধে মত বদলাতেন কিনা কে জানে। আধুনিক উপন্যাস পড়লে তিনি কি মহাকাব্যের আলোচনাকে দু-কথায় সেরে দিতে পারতেন? এ সম্বন্ধে ড্রাইডেনের মতটি প্রণিধানযোগ্য: "It is not enough that Aristotle has said so, for Aristotle drew his models of tragedy from Sophocles and Euripides: and, *if he had seen ours, might have changed his mind.*"[৮]

সে যাই হোক, অ্যারিস্টট্‌ল থেকেই য়ুরোপীয় সাহিত্য-সমালোচনার যথার্থ শুরু; আজ প্রায় আড়াই হাজার বছর পরেও দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর কোন কোন মত এখনও কৌতূহলী আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

লংগিনাস (খ্রীঃ ১ম শতক?)

প্রাচীন সাহিত্যবিচারপদ্ধতিতে যিনি যুগান্তর এনেছিলেন, রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বৃহৎ জীবনবোধের আদর্শে সাহিত্যকে ঊর্ধ্বতর সত্তায় তুলে ধরেছিলেন, সেই লংগিনাসের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর নামধাম নিয়ে নানা মতভেদ আছে। খ্রীঃ তৃতীয় শতকে ক্যাসিয়াস লংগিনাস (২১৩-৭৩ খ্রীঃ অঃ) আবির্ভূত হন; ইনি প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক ছিলেন। পরে পামিরার রানী জেনোবিয়ার উপদেষ্টা হন। জেনোবিয়া রোমান বশ্যতা অস্বীকার করলে লংগিনাস রোমসম্রাটের দ্বারা ধৃত হন; বিচারে এঁর প্রাণদণ্ড হয়। কেউ কেউ বলেন যে, ইনিই *The Sublime* নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক সমালোচনাগ্রন্থের রচয়িতা। কারো কারো মতে এ অনুমান ঠিক নয়। ক্যাসিয়াস লংগিনাসের অন্ততঃ দুশো বছর আগে *The Sublime* রচিত হয়েছিল; এবং যে লংগিনাসের সঙ্গে *The Sublime*-এর নাম জড়িত, তিনি অন্য কেউ। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় না। তাই তাঁকে সাধারণতঃ Pseudo Longinus

৮ বাঁকা অক্ষর আমাদের দেওয়া।

বা কল্পিত লংগিনাস আখ্যা দেওয়া হয়। শোনা যায় তিনি নাকি জাতিতে গ্রীক, আসল নাম পম্পেইয়াস; ইনি বোধহয় খ্রীঃ ১ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। অবশ্য এ সমস্ত জনশ্রুতি মাত্র। যাঁরা (যথা—স্কট-জেম্‌স্‌) তাঁকে ক্যাসিয়াস লংগিনাসের সঙ্গে এক করতে চান, তাঁদের যুক্তি অভ্রান্ত নয়।

লংগিনাসের গ্রন্থটির নাম *Peri Hupsous*। *Hupsous*-এর প্রতিশব্দ হিসেবে sublime শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে *On the Sublime*। ইংরেজীতে বিভিন্ন যুগে এই 'hupsous' নানা ভাবে অনূদিত হয়েছে। ১৬৬২ সালে জন হিল এই শব্দটির অনুবাদ করেন *Of the Height of Eloquence*; ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দে জন পুলটেনির ভাষায় এর রূপান্তর হয় *Of the Loftiness or Eloquency of Speech*। ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দে বোয়লো (Boileau) এর পাকাপাকি রূপদান করলেন—*Sublime*। তারপর থেকে এই Sublime কথাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই গ্রন্থে বারবার গ্রীক *ekstasis* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হল আনন্দাবেগ, transport। এই transport ও sublime শব্দ দুটির দ্বারা এই গ্রন্থকে বিশেষিত করা চলে।

লেখক এই গ্রন্থে প্রধানতঃ রোমান্টিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যের লক্ষ্য ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই অংশে বিশুদ্ধ সাহিত্যতত্ত্বের চেয়ে বরং সাহিত্যের নানাবিধ বাস্তব সমস্যা আলোচিত হয়েছে। তাই অনেকে মনে করেন *On the Sublime* নামে যে গ্রন্থ পাওয়া গেছে তা বোধ হয় মূলগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড; প্রথম খণ্ডে সম্ভবতঃ দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছিল। লংগিনাস 'sublime'-কে সাহিত্যের একমাত্র লক্ষণ বলে ধরেছেন। সেই sublime-এর অর্থ ছিল ভাষার এমন প্রাধান্য ও সৌন্দর্য, যা ভালো বাগ্মীর মতো এক মুহূর্তেই পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারে। তিনি হোমর থেকে

ডিমসথিনিস পর্যন্ত গ্রীক সাহিত্য বিশ্লেষণ করে sublime-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বহু গ্রন্থ থেকে (তার মধ্যে *The Book of Genesis*-ও আছে) উদ্ধৃতি উল্লেখ করে নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করেন। গ্রন্থের পরিশেষে তিনি সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে যোগাযোগ কোথায় সে বিষয়েও সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনার বিষয় সংহত, যুক্তিপূর্ণ ও সাহিত্যগুণান্বিত; *On the Sublime* পড়তে পড়তে প্লেটোর কথা মনে পড়ে যায়। বক্তব্যের সূচী: স্টাইল বা রচনারীতি; সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি ও মূলতত্ত্ব; ক্লাসিকতার প্রাণতত্ত্ব ব্যাখ্যা; বুদ্ধির স্থৈর্য ও মুক্তি; অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিল্পের মূলতত্ত্ব আবিষ্কার। মূলতঃ এই বিষয়ে তাঁর আলোচনা কেন্দ্রীভূত।

আনন্দ, শিল্পসৌন্দর্য, মহত্ত্ব—এইগুলিকেই তিনি শিল্পের ফলশ্রুতি বলেছেন। সাহিত্য ও শিল্প আমাদের মহৎ লোকে নিয়ে যায়, নতুন আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠিত করে। সাহিত্যের এই আনন্দদানের লক্ষণ এর আগে কেউ কেউ বলেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা শিক্ষাদানের (*cavel*) কথা ভুলতে পারেন নি। কিন্তু লংগিনাস *cavel*-কে সাহিত্যবিচার থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে চেয়েছেন। সাহিত্য আমাদের বিশুদ্ধ আনন্দ দেবে এবং মহত্তর সৌন্দর্যলোকে নিয়ে যাবে—এ ছাড়া সাহিত্যের আর কোন কাজ নেই। সাহিত্যেব এই বৈশিষ্ট্যকেই তিনি অপার্থিব আনন্দ (*ckstasis*) বলেছেন।

সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে লংগিনাস পাঁচটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন: (১) মহৎ বিষয়বস্তু (২) আবেগ ও অনুপ্রেরণা (৩) অলঙ্কারসন্নিবেশ (৪) উপযুক্ত ছন্দ (৫) মহত্ত্বব্যঞ্জক রচনারীতি। এখানে লক্ষ্য করা যাবে, তিনি প্রধানতঃ সাহিত্যের উপাদান, আবেগ, রচনারীতি—এই তিনটির উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। এইগুলির সম্মিলিত চেষ্টার ফলে সাহিত্য আমাদের sublime বা মহত্তরলোকে নিয়ে যেতে পারে। তাঁর পূর্ববর্তী

প্লেটো-অ্যারিস্টট্‌লের মতে যুক্তির দ্বারা স্বমতানুবর্তী করা (persuasion—যা বাগ্মিতার ধর্ম) সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু লংগিনাস বললেন, "For a work of genius does not aim at persuasion, but ecstasy—or lifting the reader out of himself." প্রতিভাবান শিল্পী পাঠককে তাঁর মতানুবর্তী করেন না, তাঁকে ক্ষুদ্রত্ব থেকে মহত্তর আনন্দলোকে নিয়ে যান। এই sublime-এর সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য : "The sublime consists in a certain loftiness and consummateness of language, and it is by this and this only that the greatest poets and prose writers have won pre-eminence and lasting fame." Sublime হল ভাষার এমন একটা মহত্ত্বব্যঞ্জক চূড়ান্ত প্রকাশক্ষমতার বিকাশ, কেবলমাত্র যার দ্বারাই কবি ও গদ্যশিল্পীরা বিখ্যাত হয়েছেন। Sublime শুধু মহৎ নয়, সাহিত্যে সুন্দর ও মহৎ—দুই-ই চাই ; এক গুণে তা আমাদের চিত্তাকর্ষী হয় এবং অপর গুণে তা আমাদের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বৃহৎ পরিসরের আনন্দলোকে নিয়ে যায়, যাকে অনেক পরে জুবেয়ার বলেছিলেন, "Nothing is poetry unless it transports."

লংগিনাসের বিচিত্র সাহিত্যমতের মধ্যে তিনটি লক্ষণ বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর মতে সাহিত্যের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে : (১) উপভোগ (appreciation) (২) মহত্তর জীবনবোধ (sublime) এবং (৩) আনন্দলোকে অভিসার (transport)। সাহিত্য পাঠশিক্ষার জন্য নয়—উপভোগ বা আনন্দের জন্য। সেই আনন্দ হল মহৎ শিল্প ও চিত্তবোধের আনন্দ এবং সেই মহৎ আনন্দ উপভোগের জন্য মানুষের ঊর্ধ্বতর চিত্তসত্তায় উদ্‌গমন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, লংগিনাস সমালোচনায় সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ আনন্দবাদ—যা রোমান্টিকতার ধর্ম, তাই প্রতিষ্ঠিত করেন। এইখানে তাঁর সঙ্গে অ্যারিস্টট্‌লের সবচেয়ে বড় ভেদ ;

বরং প্লেটোর সঙ্গে তাঁর যৎসামান্য সাদৃশ্য আছে। সাহিত্য পাঠকের মনে আনন্দ সঞ্চার করতে পারছে কিনা, তার সীমাবদ্ধ মনকে বৃহৎ সত্তায় নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে কিনা, এক কথায় সাহিত্যে sublime-এর লক্ষণ আছে কিনা, তাই একমাত্র প্রণিধানযোগ্য। সাহিত্য লেখকের মনে মহৎ চিন্তা ও বিশুদ্ধ আবেগ সৃষ্টি করবে; এই রকম আবেগমুগ্ধ সাহিত্যিকের মন থেকে যে সাহিত্য সৃষ্টি হবে, তাতে মহৎ শিল্পলক্ষণ থাকবে এবং ঐ মহৎ সাহিত্য পাঠকের মনে এমন একটা আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করবে যে, সেই পাঠক সঙ্কুচিত সীমাবদ্ধ চেতনা থেকে সৌন্দর্য ও আনন্দের ঊর্ধ্বতর সত্তায় উন্নীত হবেন।

অবশ্য এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, লংগিনাস সহজলভ্য সাহিত্যরসের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং পাঠকের উপভোগ্যতাকেই সাহিত্যের গুণাগুণ নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু পাঠকচিত্তের সম্মিত অনুরাগকেই শিল্পগুণের একমাত্র নিয়ামক শক্তি বলে মনে করেন নি; যদি তাই মনে করতেন, তা হলে তাঁকে রোমান সমালোচক হোরেস ও কুইন্টিলিয়ানের মতো গতানুগতিক সমালোচক বলেই নগদ বিদায় করা যেত। তিনি সাহিত্যবিচারে পরিপক্ক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১]

লংগিনাসের মূল কথা—মহৎ সাহিত্য ও শিল্প তাকেই বলা যাবে যা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, এবং পাঠককে পুনঃপুনঃ ঊর্ধ্বতর সত্তায় নিয়ে যায়। শুধু একবার নয়, যতবার পড়া যাবে ততবার রসাস্বাদন লাভ হবে। কেবল কাব্যবিশেষজ্ঞ ও বিদগ্ধরাই যে মহৎ সাহিত্যর রসভোগ করবেন, তা নয়; যে কোন বয়সের যে কোন ভাষাভাষী ব্যক্তি—দেশকালজাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই মহৎ সাহিত্য থেকে আনন্দ ভোগ করতে পারবে।

---

১ তাঁর উক্তি: "Judgment of literature is the final trait of ripe experience."

লংগিনাস সাহিত্যের রীতি বা style সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিয়েছেন। পরবর্তিকালে 'Style is the man' বলে যে উক্তিটি প্রচলিত হয়েছে, তার প্রথম পথিকৃৎ লংগিনাস। কিন্তু তিনি *Peri Hupsous*-এ (*The Sublime*) সাহিত্যসমস্যা বিষয়ে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যা বিশেষভাবে ১৯শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সমালোচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। এ বিষয়ে তিনি যে কোন প্রাচীন সমালোচকের চেয়ে আধুনিক। স্টাইল বা রচনারীতি, আবেগ, সৌন্দর্য, সংক্রমণ (Communication), বক্তব্য বিষয় ও সাহিত্যিকের একাত্মতা (Empathy) প্রভৃতি সম্পর্কে লংগিনাসের মতামত ও যৌক্তিকতার আধুনিকতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যত কথাই বলুন না কেন, একটি বিষয়ে তিনি সর্বদা অবহিত, এবং নানা কথার মধ্যে সে কথাটি একবারও বিস্মৃত হন নি। তা হল সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর অভ্রান্ত অসংশয় মনোভাব। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আমাদের মনকে আলোড়িত করবে, উত্তেজিত করবে, মহত্তর করবে, ঊর্ধ্বতর সত্তায় নিয়ে যাবে, ভাগবত উন্মত্ততায় আবিষ্ট করবে,—এই হল তাঁর সাহিত্যবিষয়ক মৌলিক সিদ্ধান্ত। সমালোচকের কর্তব্য হল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে এই গুণ আবিষ্কার করা এবং প্রচার করা।

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের ধ্বনিবাদের সঙ্গে লংগিনাসের *Hupsous*-এর সাদৃশ্য আছে। আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত এই ধ্বনিবাদ ব্যাখ্যা ও প্রচার করেন। কিন্তু ধ্বনিবাদের মূল লেখক কে, তা জানা যায় না, আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্তও জানতেন না। লংগিনাসেরও প্রকৃত পরিচয় রহস্যাবৃত। তাঁর sublime-তত্ত্ব যেমন প্রাচীন সাহিত্যবিচারের এক অভিনব দৃষ্টান্ত, তেমনি ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রেও ধ্বনিবাদ (ব্যঞ্জনা) অভিনব বলে স্বীকৃত। তত্ত্বের দিক থেকে ধ্বনিবাদ ও 'sublime'-এর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ধ্বনিবাদের মূল কথা—বাচ্যার্থের অতীত বিষয়ান্তরের

ব্যঞ্জনা: sublime-এর মূল কথা 'transport'—যা আমাদের উচ্চতর সৌন্দর্য ও আবেগের স্বর্গলোকে নিয়ে যায়।

রোমান সমালোচনা

অ্যারিস্টট্‌লের অবসানের পর প্রায় দু-শ বছর এথেন্‌সে বিশেষ কোন সাহিত্যচর্চা হয়েছিল বলে মনে হয় না, হলেও তার প্রমাণ হস্তগত হয় নি। অবশ্য পরবর্তিকালে আবির্ভূত স্ট্রাবো, প্লুটার্ক, ডায়োজেনিস, লাইরটাস প্রভৃতির গ্রন্থাদি থেকে অনুমান হয়, এই যুগে ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, অভিধান, অলঙ্কার প্রভৃতির অনুশীলন হলেও সৃষ্টিমূলক কিছু রচিত হয় নি। এর পর সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হল রোম, বাহন হল লাতিন ভাষা। অবশ্য রোমান সমালোচকগণ গ্রীক আদর্শ ছেড়ে একটুও ভিন্ন পথে যেতে পারেন নি। তাঁরা গ্রীক সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শকেই একমাত্র আদর্শ বলে মনে করতেন এবং গ্রীক আদর্শের একনিষ্ঠ অনুকরণই সাহিত্যিকের কর্তব্য—এই মত তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন। প্রসিদ্ধ রোমান বাগ্মী ও রাজনীতিক সিসিরো (খ্রীঃ পূঃ ১০৬-৪৩) সাহিত্যবিচারে কিছু স্থূলবুদ্ধি ছিলেন। তিনিও মনে করতেন যে, গতানুগতিক ভাবে গ্রীক সাহিত্যাদর্শ অনুসরণ করাই রোমান সাহিত্যের একমাত্র কর্তব্য। তিনি *De Oratore* নামক গ্রন্থে অ্যারিস্টট্‌ল-প্রদর্শিত পথ ছেড়ে এক পাও ভিন্ন পথে যেতে পারেন নি। এই যুগে লাতিনভাষী যে সমস্ত রোমান সমালোচক এসেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ তীক্ষ্ণ রসবোধের অধিকারী হলেও বিরাট গ্রীক আদর্শ ছাড়া অন্য কিছু কল্পনাও করতে পারেন নি। রোম গ্রীসকে জয় করেছিল, কিন্তু সংস্কৃতির দিক থেকে গ্রীসকে সে দাস্যভাবে সেবা করেছে।

হোরেস (খ্রীঃ পূঃ ৬৫-৮)

প্রাচীন রোমান সমালোচকদের মধ্যে হোরেস ও কুইন্টিলিয়ানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা যদিও গ্রীক সাহিত্যের

নৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন এবং প্লেটো-অ্যারিস্টট্‌লের পথ ধরেই চলেছেন, তবু পরিমিত ক্ষেত্রে সাহিত্যতত্ত্ব বিচারে কিছু নতুন কথা বলেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম হোরেসের নাম স্মরণীয়; কারণ পরবর্তী যুগে অ্যারিস্টট্‌লের *Poetics*-এর প্রচার সঙ্কুচিত হয়ে পড়লে, হোরেসের *Ars Poetica* সেই শূন্যস্থান কথঞ্চিৎ পূরণ করেছিল।

প্রসিদ্ধ রোমান গীতিকবি হোরেস[১০] সামাজিক জীবনে সাধারণ স্তর থেকে উচ্চ স্তরে উঠেছিলেন। রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে তিনি সর্বস্বান্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত সরকারী কেরানির পদ নিতে বাধ্য হন। যাই হোক তাঁর বন্ধুভাগ্য ভাল ছিল, তাই কবি ভার্জিলের বন্ধুত্ব ও মন্ত্রী মাইসিনিয়াসের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ভার্জিলের মৃত্যুর পর তিনি কিছুকাল রাজকবিও হয়েছিলেন। তাঁর *Satire, Odes* ও *Epistles* নামক কবিতা ও পত্রকবিতা তাঁকে অশেষ খ্যাতি দিয়েছিল। কিন্তু যে জন্য তাঁর প্রসিদ্ধি, তা হল তাঁর সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ *Ars Poetica*, যার পুরো নাম—*Epistula ad Pisones*। এটি বোধ হয় তাঁর পৃথক কোন গ্রন্থ নয়; তাঁর 'Second Book of Ode'-এর তৃতীয় পত্রের অন্তর্গত বলে মনে হয়। তিনি পিসো নামক কোন এক ব্যক্তি এবং তাঁর দুই পুত্রকে কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ছন্দে উপদেশ দিয়েছিলেন বলে এর নাম *Epistula ad Pisones*। বোধ হয় এই গ্রন্থটিকে কুইন্টিলিয়ানই সর্বপ্রথম *Ars Poetica* বলে অভিহিত করেন, তার পর থেকেই এই ছন্দোময় কাব্যতত্ত্ব *Ars Poetica* নামে পরিচিত হয়। কোন কোন মতে হোরেসের এই গ্রন্থটি মৌলিক রচনা নয়, নিয়োপ্‌টলেমাস-এর *Peri Poematon* (On Poems) অবলম্বনে রচিত; আধুনিক কালে এমন কতকগুলো তথ্য আবিষ্কার হয়েছে যে, এ অনুমান সত্য বলে মনে হয়।

এই গ্রন্থে হোরেস ছন্দে চিঠিলেখার রীতিতে সাহিত্যতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। অ্যারিস্টট্‌লের *Poetics*-এ

১০ তাঁর পুরো নাম—Quintus Horatius Flaccus

যা বলা হয়েছে তিনি তার বেশি কিছু বলতে পারেন নি। কিন্তু বলার ভঙ্গীটি অ্যারিস্টট্‌লের মতো নীরস নয়। তিনি স্বয়ং কবি ছিলেন, কবি হিসাবে যে সব সমস্যা অনুভব করেছেন, তাকেই এই গ্রন্থে বলবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্য সাহিত্যগুণান্বিত বলে পরবর্তিকালে, বিশেষতঃ মধ্যযুগের য়ুরোপে, *Ars Poetica*-র অত্যন্ত আদর হয়েছিল; এমন কি এই গ্রন্থের দ্বারা অ্যারিস্টট্‌লের *Poetics*-এর জনপ্রিয়তা খর্ব হয়ে পড়েছিল।

হোরেস *Ars Poetica*-তে বক্তব্য বিষয় এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন: শিল্পের ঐক্য বা সংহতি; রচনারীতি ও শব্দপ্রকরণ; কবিতার যথার্থ উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি; প্রতিভা ও শিল্পী; মাঝামাঝি লেখকের প্রয়োজনীয়তা; সাহিত্যসৃষ্টির জন্য অশ্রান্ত অনুশীলন। অবশ্য এতে কোন ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচিত হয় নি; বিচ্ছিন্নভাবে কবিতা ও রচনাকৌশল, ভাল লেখকের গুণগত বৈশিষ্ট্য, প্রথম শিক্ষার্থীর সাহিত্যপাঠের ভূমিকা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। প্রথম শিক্ষার্থীর প্রতি তাঁর উপদেশ স্মরণীয়। তিনি বলেছেন যে, যাঁরা প্রথমে সাহিত্যব্রতী হবেন, তাঁরা এমন বিষয় বেছে নেবেন, যা তাঁরা আয়ত্তে আনতে পারবেন। নির্দোষ সাহিত্য-সৃষ্টি নবীন লেখকের আয়ত্তাতীত; নির্দোষ সাহিত্য জগতে কটাই-বা সৃষ্টি হয়েছে? একটু-আধটু ত্রুটি সাহিত্যগুণকে খর্ব করতে পারে না।

সমালোচনায় হোরেস অতিশয় প্রাচীনপন্থী ছিলেন, গ্রীক আদর্শ ছাড়া যে আর কিছু থাকতে পারে তা তিনি মানতেন না। তিনি নবীন লেখকদের বার বার উপদেশ দিয়েছেন: গ্রীক আদর্শ অনুসরণ কর; গ্রীক কবি, নাট্যকার ও সমালোচক যা বলে গেছেন, ঠিক সেই আদর্শ হুবহু অনুকরণ কর। তাঁর কাছে ক্লাসিকতা ছিল রক্ষণশীলতার নামান্তর। তাঁর শেষ কথা, কাব্যের কাজ হল "To instruct, or to delight or both." কাব্য নীতি-উপদেশ দেবে, না আনন্দ দেবে—তা নিয়ে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে তিনিও উপনীত হতে পারেন নি।

হোরেস অ্যারিস্টট্‌লের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও সাহিত্যের রচনারীতি সম্বন্ধে কিছু নতুন কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে সাহিত্যের মূল কথা—প্রকাশ ; কিন্তু ক্রমাগত মানুষের অভিজ্ঞতা বদলাচ্ছে, ফলে কাব্যসাহিত্যের প্রকাশের ভাষাও বদলাতে পারে। কারণ মানুষের ভাষা অভিজ্ঞতাকেই বহন করে। কাজেই কাব্যের রচনারীতি যুগে যুগে নব নব রূপ গ্রহণ করে থাকে। কাব্য যেন গাছ, আর শব্দ তার পাতা। পুরনো পাতা ঝরে গিয়ে গাছে নতুন পাতা গজায়, তেমনি কাব্যেও পুরনো শব্দ লোপ পেয়ে গিয়ে নতুন শব্দ আবির্ভূত হয়। প্রাচীন যুগে এ কথা বলে হোরেস উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

মধ্যযুগে সাহিত্যসমালোচনায় হোরেস অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ; সেই প্রভাব বিস্তারে তাঁর গুণগত কোন কৃতিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। *Ars Poetica* বিচ্ছিন্ন ধরনের রচনা হলেও সাহিত্যগুণান্বিত বলে দীর্ঘকাল আপনার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

কুইন্টিলিয়ান (আনুমানিক খ্রীঃ ৪০-১০০)

রোমান সমালোচকদের মধ্যে কুইন্টিলিয়ান[১১] বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি অ্যারিস্টট্‌লের মতো মৌলিক চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন এবং বিশুদ্ধ সাহিত্যসেবী না হয়েও সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাতে তাঁর বিস্ময়কর আধুনিক মন ধরা পড়েছে। হোরেসের চেয়ে তাঁর সাহিত্যবিচারপদ্ধতি অধিকতর শ্রদ্ধার যোগ্য। অথচ এমনি ভাগ্যবিড়ম্বনা, খ্রীষ্টান য়ুরোপে হোরেসেরই জয়জয়কার, কুইন্টিলিয়ান সমালোচনাসাহিত্যের ইতিহাসের পাদটীকায় বেঁচে আছেন।

কুইন্টিলিয়ান 'জাত সাহিত্যিক' নন, বৃত্তিতে বাগ্মী। তিনি বাগ্মিতার ওপরেই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে যুগে আইন-আদালত ও রাষ্ট্র-সমাজে বাগ্মিতা অতিশয় প্রয়োজনীয় ছিল ;

১১ তাঁর পুরো নাম—Marcus Fabius Quintilianus

কাজেই বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে বাগ্মিতা অনুশীলিত হত। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও রাজনীতিক সিসিরোর ভক্ত-শিষ্য কুইন্টিলিয়ানের প্রায় সমস্ত রচনা লোপ পেয়ে গেছে, কেবল একখানি গ্রন্থ *Instiiutio Oratoria* কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছে। এটি বাগ্মিতা শিক্ষার গ্রন্থ। এতেই তিনি প্রসঙ্গক্রমে বাগ্মিতার গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে গদ্যভাষার রীতি-প্রকরণ ও সুবাগ্মীর লক্ষণ ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থটি মোট বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তার মধ্যে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আবেগ, হাস্য-পরিহাস ও বাক্‌কৌশল, ৮ম অধ্যায়ে রচনারীতি, শব্দপ্রয়োগের যৌক্তিকতা ও অলঙ্কার প্রয়োগ এবং ৯ম অধ্যায়ে গদ্যের শিল্পরূপ ও ছন্দস্পন্দ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১০ম অধ্যায়টি পুরোপুরি সাহিত্যসমালোচনা নিয়ে রচিত। এই অধ্যায়ে গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর মূল বক্তব্য হল গদ্যের লক্ষণ নির্ণয়; কারণ বাগ্মীর বাহন গদ্য। তাই তিনি এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে গদ্যভাষার রূপ ও রীতি বিশ্লেষণ করেছেন—এ বিষয়ে তিনি 'ফর্মবাদী' সমালোচক (Formal critic)। সাহিত্যের বিষয়বস্তু কী হবে, তা নিয়ে তিনি বিশেষ আলোচনা করেন নি; ভাষা ও শিল্পের রূপটা কি রকম হবে, এই ছিল তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয়। তাঁর মতে গদ্যের লক্ষণ হল (১) পরিমিতিবোধ (২) স্বচ্ছতা (৩) সংহত প্রকাশ-ক্ষমতা (৪) নির্মিতি (design) (৫) শিল্পপ্রকরণ। গদ্যের সাহায্যে কী ভাবে অপরকে স্বমতানুবর্তী করা যায়, যুক্তির ভাষাতেও আবেগ, হাস্যপরিহাস প্রয়োগ করে গদ্যকে শিল্পসম্মতরূপে গড়ে তোলা যায়—এই ছিল তাঁর সাধনা। গদ্যের মতো কেজো ভাষাকে কি রকম করে শাণ দিয়ে তাকে সূক্ষ্ম শিল্পের বাহন করে তোলা যায়, তিনি তারই পরীক্ষা করেছেন। কাজেই তাঁকে সাহিত্যের আকার ও প্রকাশরীতিকেই বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। তিনি মূলতঃ বাগ্মী ছিলেন, সুতরাং গদ্যের 'ফর্মের' ওপর বেশি আকৃষ্ট হবেন তাতে আর সন্দেহ কি?

তাঁর মতে গদ্যরচনা একপ্রকার চেষ্টাকৃত শিল্পসাধনা। স্বয়মাগত ও স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্যের প্রতি তাঁর ততটা নিষ্ঠা ছিল না। তিনি মনে করতেন, বিশেষ চেষ্টা, পরীক্ষা ও অনুশীলন না করলে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। নদী যেমন অনেক বাধা ঠেলে পাথর ডিঙিয়ে বয়ে চলে তেমনি সাহিত্যিককে অনেক চেষ্টা করে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হয়।

তাঁকে তুলনামূলক য়ুরোপীয় সমালোচনার জনকত্ব দিতে আপত্তি হবার কথা নয়। অ্যারিস্টট্‌ল *Poetics* লেখার সময় শুধু গ্রীক সাহিত্য ব্যবহার করেছিলেন। ভার্জিল-হোরেসের সমসাময়িক রোমান জাতি গ্রীক সাহিত্যাদর্শে এমন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে তারা গ্রীক সাহিত্যের যথার্থ পরিমাপ করতে পারেনি, —শুধু গ্রীক সাহিত্য অনুকরণ করাকেই একমাত্র সাহিত্যসেবা বলে মনে করত। কুইন্টিলিয়ান এঁদের একটু পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কাজেই খানিকটা দূর থেকে গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার করতে পেরেছিলেন। তিনি দেখালেন যে, যদিও লাতিন ভাষা ও রোমান সাহিত্য গ্রীক ভাষা ও গ্রীক সাহিত্যের চেয়ে নিকৃষ্ট, তবু দুটোর গুণাগুণের তুলনামূলক আলোচনা হওয়া উচিত। তিনি আরও দেখালেন যে, গ্রীক সাহিত্য ও রোমান সাহিত্য এক ধরনের নয়। লাতিন ভাষায় লঘুতা ও সৌন্দর্যের অভাব আছে। কাজেই পুরোপুরি গ্রীক আদর্শ অনুসরণ না করে বরং এই ত্রুটি পুরিয়ে নেবার জন্য লাতিন ভাষায় ওজোগুণ, বৈচিত্র্য ও অলঙ্কারকৌশল অনুসরণ করা উচিত।

সর্বশেষে তিনি একটি কথা বলেছেন: সৌন্দর্য শিল্পের নিত্য সঙ্গী। এ কথাটা দু হাজার বছর আগে যিনি বলতে পেরেছিলেন তাঁর বুদ্ধিবিবেচনা আধুনিক দৃষ্টিতেও বিশেষভাবে অভিনন্দিত হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

ছয়

॥ পাশ্চাত্য সমালোচনার ধারা ॥

মধ্যপর্ব ঃ দান্তে থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী

প্রাক্-দান্তে যুগ

গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির অবসানের সঙ্গে গ্রীক-রোমান সমালোচনারও বিদায়মুহূর্ত আসন্ন হয়ে এল। একদিকে বর্বর ও অর্ধবর্বরের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের পতন হল, আর এক দিকে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানধর্মের আক্রমণে জীবনবাদী হেলেনীয় শিল্পসাহিত্যের দুর্দিন ঘনিয়ে এল। তবু এই অন্ধকারের মধ্যে দু-একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে যায় নি। খ্রীঃ ৩য় শতাব্দীতে নব্য-প্লেটোবাদের (Neo-Platonism) প্রধান প্রচারক প্লটিনাস (খ্রীঃ ২০৫-২৭০ অব্দ) ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ *Enneads* গ্রন্থে সৌন্দর্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি ভাগবত চেতনা ও অধ্যাত্ম মহিমার দিব্য বাতায়ন থেকেই সৌন্দর্যকে বিচার করেছেন। তাঁর মতে সৌন্দর্যের অর্থ হল অধ্যাত্ম চেতনার ব্যঞ্জনা। খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত প্লটিনাসের এই মত পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল। তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং লংগিনাসের 'Hupsous'-এর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। অবশ্য প্লটিনাস সৌন্দর্যতত্ত্বকে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন এবং লংগিনাস শিল্পসাহিত্যের পক্ষ থেকে 'sublime' তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন।

যখন রোম সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতি ভেঙে পড়েছে তখন দু-চার জন লাতিন লেখকের সমালোচনায় নির্বাপিতপ্রায় প্রদীপটি কোনমতে জ্বলছিল। এঁদের মধ্যে অন্ততঃ দুজনের নাম উল্লেখ করা যায়। সার্ভিয়াস মোরাস অনরেটাস ভার্জিলের ওপর একখানা টীকাগ্রন্থ

লিখে প্রধানতঃ ভার্জিলের কবিকৃতি এবং গৌণতঃ সাহিত্যলক্ষণ আলোচনা করেছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ম্যাক্রোবিয়াস (খ্রীঃ ৪০০ অব্দ) *Saturnalia Convivia* নামক সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট গ্রন্থে পুরাণ-ইতিহাসের তত্ত্ব নিয়ে গভীর গবেষণা করেন—যদিও ভার্জিলের কাব্যই তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয়। এর পরে এবং দান্তের পূর্বে (খ্রীঃ ৫ম-১২শ শতাব্দী) লাতিন ভাষায় উল্লেখযোগ্য কোন সমালোচনা বা সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত রচনার পরিচয় পাওয়া যায় না।

এর পর মধ্যযুগের গোড়ার দিকে খ্রীষ্টানধর্মের প্রাধান্যের ফলে হেলেনীয় 'অ-ধর্ম'-সাহিত্য ও শিল্প গির্জাঘরের পাণ্ডা-পুরোহিতের দ্বারা নিন্দিত হল এবং গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির বলিষ্ঠ জীবনরস নারকীয় বলে নরকবাস লাভ করল। খ্রীঃ ৫ম থেকে ১৫শ শতাব্দী—প্রায় হাজার বছর ধরে খ্রীষ্টান ধর্মনৈতিক অনুদারতা সাহিত্যের প্রাণরস শোষণ করে নিয়েছিল। সুতরাং এই যুগে সমালোচনাতত্ত্বও যে দুর্বল হয়ে পড়বে, তাতে আর সন্দেহ কি? বোয়েথিয়সের (৬ষ্ঠ শতক) মতো গ্রীক সাহিত্য-রসিকও কবিকল্পনাকে যখন 'রঙ্গনটী' ("Wantons of the Theatre") বলে নিন্দা করলেন, তখন সহজেই অনুমেয়, মধ্যযুগের গোড়ার দিককে কেন "তামস যুগ" ("The Dark Age") বলা হয়েছে। এই যুগে পাদরিসঙ্ঘের নির্দেশে কাব্য ও নাটক চার্চের ত্রিসীমানা থেকে বিতাড়িত হল। সেণ্ট জেরোম পুরোহিতদের কমেডি পড়া নিষিদ্ধ করে দিলেন। ভেল্‌কিওয়ালা, বিদূষক, অভিনেতা আর কবিরা এঁদের ফতোয়ার দ্বারা অক্ষয় নরকবাস লাভ করলেন। কবি হলেন ভাঁড়ের সমগোত্র। *Aucassin and Nicolete* নামক ১২শ শতাব্দীর একটি আখ্যায়িকায় উক্ত গ্রন্থের কদাচারী নায়ক অকাসিন বলছে যে, সে তার নায়িকা নিকোলেটের সঙ্গে সেই নরকে যেতে রাজি আছে যেখানে আছে টাকাপয়সার ছড়াছড়ি আর যেখানে বাস করে কবিরা। ১২শ

শতকেও কবির বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল নরকে। রোমান ক্যাথলিক চার্চের অতিপ্রাধান্যের ফলে মধ্য ও পশ্চিম য়ুরোপে সাহিত্য নারকীয় বলে পরিত্যক্ত হল এবং লাতিন ভাষায় পুরো দমে ধর্ম ও দর্শন চর্চা চলতে লাগল। সেই সময়ে চার্চের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বিদ্বজ্জনসমাজ থেকে সাহিত্য নির্বাসিত হল বটে, কিন্তু লৌকিক ভাষায় কিছু কিছু সাহিত্য ও সঙ্গীত জনসাধারণের মধ্যে তখনও অনুশীলিত হত। দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভেন্সাল ভাষায় ত্রুবেদুরদের প্রেমের কবিতা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মধ্যযুগের ধর্মধ্বজীদের চাপে পড়ে সাহিত্য যদি মৃত্যু বরণ করত তাহলে দান্তের আবির্ভাব হত কি করে? ঐ অন্ধ তামসিকতার মধ্য থেকেই তো মহাকবি ও সমালোচক দান্তে আলিঘিয়ারি আবির্ভূত হলেন—যেমন করে আকস্মিকভাবে আকাশপ্রান্তে দুজ্ঞেয় আলোকদূত জেগে ওঠে।

দান্তে (১২৬৫-১৩২১ খ্রীঃ অঃ)

মধ্যযুগের নিশ্ছিদ্র অমারজনীর মধ্যে একটি তারকার মতো দীপ্তি পাচ্ছেন দান্তে (Dante Alighieri)। ফ্লোরেন্সের অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করে সামরিক কর্তব্য ও রাজনীতিক আবর্তে পড়েও তিনি মহাকবি, গীতিকবি, মরমী সাধক—উপলব্ধির তুঙ্গ শীর্ষে সমাসীন। তাঁর সাধিকা বিয়াত্রিচে পার্টিনারি ন বছর বয়স থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত দান্তেকে অদৃশ্য প্রেম ও অপার্থিব দিব্যজীবন দান করেছিলেন। কবির *La Vita Nuova* এবং *Divina Commedia*—গীতিকবিতা ও মহাকাব্যে এই বিয়াত্রিচের দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মহাকবি সাহিত্যতত্ত্বে যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনাস্থল মধ্যযুগে একান্তই বিরল। বলতে গেলে দান্তে থেকেই য়ুরোপে রেনেসাঁসের যথার্থ সূচনা।

দান্তে *De Vulgari Eloquentia* (The Illustrious Vernacular) নামক লাতিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থে লাতিন ভাষার

বিরোধিতা করে সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মার্জিত প্রাদেশিক ভাষার জয় ঘোষণা করেন। রেনেসাঁসের বড় কথা হল লাতিনের দাসত্ব থেকে লোকভাষাকে মুক্তি দান। সেই মুক্তিমন্ত্রের প্রথম পূজারী দান্তে।

সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে তিনি দুখানি বই লিখেছিলেন। ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থটি *De Vulgari Eloquentia* নামে পরিচিত; দ্বিতীয়টি *Il Convivio* নামে বিখ্যাত—এতে তিনি কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন।

*De Vulgari Eloquentia*তে তিনি চারটি পর্বে ইতালীয় লোকভাষার সাহিত্যিক প্রয়োজনীয়তা বিচারের চেষ্টা করেছেন; অবশ্য এর মাত্র দুটি পর্ব রচিত হয়েছিল। এর প্রথমাংশে তিনি শ্রেষ্ঠ কথ্য ভাষার স্বরূপলক্ষণ বিচার করেছেন এবং এই লোকভাষাকে কী ভাবে কাব্যে প্রয়োগ করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে মাতৃভাষাই কবিভাষা হওয়া উচিত, লাতিনের মতো কৃত্রিম ভাষার সে গৌরব প্রাপ্য নয়। এইজন্য ইতালির বিভিন্ন উপভাষা নিয়ে বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ইতালিতে প্রচলিত যে সমস্ত উপভাষা আছে, তার মধ্যে যেটি প্রকাশক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ, সেটি হবে সাহিত্যের ভাষা। একেই তিনি *De Vulgari Eloquentia* বা The Illustrious Vernacular বলেছেন। কথিত ভাষাতেই কবি অধিকতর সহজে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন, কাজেই তিনি লোকভাষাকেই সাহিত্যের বাহন করতে চেয়েছেন। তা বলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো তিনি "a selection of language really used by men", অর্থাৎ লোকে যথার্থতঃ যে ভাষায় কথা বলে, তাকেই সাহিত্যের ভাষা বলতে রাজি হন নি। তাঁর মতে, "Poetry and the language proper for it are elaborate and painful toil."—স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা কাব্যের ভাষা নয়, অনেক চেষ্টা করে কাব্যের ভাষা আয়ত্ত করতে হয়। জনসাধারণের অমার্জিত মুখের ভাষাও

সাহিত্যের ভাষা নয়। "Avoid rustic language"—গ্রাম্য ভাষা ত্যাগ করো—এ-ও তাঁর উপদেশ। তিনি লাতিন ভাষাকে পরিত্যাগ করে কথিত ভাষাতে সাহিত্য রচনার কথা প্রচার করলেও যে-কোন কথিত ভাষাকেই সে মর্যাদা দিতে চান নি; যা শ্রেষ্ঠ 'illustrious vernacular', তারই শুধু কাব্যে প্রবেশাধিকার আছে—এই তাঁর সার সিদ্ধান্ত।[১]

তিনি এই গ্রন্থে ভাষাতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করে দেখিয়েছেন, কাব্যক্ষেত্রে দু-রকম শব্দ প্রযুক্ত হতে পারে। একটি হল *pexa*, অর্থাৎ মার্জিত ভাষা, আর একটি হল *hirsuta*, অর্থাৎ ঈষৎ অমসৃণ খসখসে ভাষা। *Pexa* শব্দ অর্থাৎ যে শব্দ ত্রি-অক্ষরবিশিষ্ট (trisyllabic), যাতে মহাপ্রাণ বর্ণ থাকবে না, উৎকট শ্বাসাঘাতও থাকবে না, এবং যা উচ্চারণমাত্রেই শ্রুতিকে প্রীতিদান করবে। আর *hirsuta*র লক্ষণ হল একাক্ষরযুক্ত (monosyllabic) অলঙ্কার-মুখর ঝঙ্কারবহুল শক্ত ঋজু শব্দসমারোহ। এই দুরকমের শব্দ মিলে কাব্যের কলেবর তৈরি হয়।

আদর্শ ভাষাতাত্ত্বিকের মতো তিনি শব্দকে দু-ভাগে ভাগ করেছিলেন: (১) *Signum Rationale*—অর্থাৎ যাকে এখন ভাষাতত্ত্বের পরিভাষায় Semantic (শব্দার্থতত্ত্ব) বলা হয়। (২) *Signum Sensuale* অর্থাৎ Phonology বা শব্দের ধ্বনি-তত্ত্ব। শব্দের অর্থ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়, এর নাম শব্দার্থতত্ত্ব। তেমনি তার আকার-আয়তনগত পরিবর্তনও হয়, তার নাম ধ্বনিতত্ত্ব। দান্তে নিপুণ ভাষাতাত্ত্বিকেব মতো ভাষালক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ইতালির শ্রেষ্ঠ কথিত ভাষাকে গৌরব-মণ্ডিত করতে গিয়ে তিনি ভাষার প্রাণবস্তু আলোচনা করেছিলেন এবং আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম পথ নির্মাণ করে বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি শুধু কাব্যভাষা নিয়েই

---

১ দান্তে ইতালীয় ভাষার পক্ষ নিয়েছিলেন তাঁর গুরু গুইদো গুইনিচেলির আদর্শ অনুসরণ করে। গুইনিচেলি সর্বপ্রথম দেশভাষা ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। কবি দান্তে গুরুর এই মতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

আলোচনা করেন নি; কাব্যভাষা ও কাব্যবস্তুর তুল্যমূল্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন তাঁর *Convivio* নামক গ্রন্থে।

দান্তে অ্যারিস্টট্‌ল পড়েছিলেন কিনা জানা যায় না; কিন্তু এক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অ্যারিস্টট্‌লের মতপার্থক্য আছে। অ্যারিস্টট্‌ল যেখানে *mimesis*-এর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, সেখানে দান্তে কাহিনীর ওপর অধিকতর মূল্য স্থাপন করেছেন। অবশ্য মূলতঃ এ দুয়ে বিশেষ ভেদ নেই। কারণ *mimesis* হলো মানবজীবনকাহিনীর শিল্পানুকরণ, দান্তেও সেই কাহিনীর ওপর জোর দিয়েছেন। আরও একস্থলে তাঁর সঙ্গে অ্যারিস্টট্‌লের মতপার্থক্য আছে। দান্তে *mimesis*-এর বদলে 'রূপকে'র ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে মানবজীবনের হুবহু বাস্তব কাহিনী সাহিত্যে অনুসৃত হয় না, বরং মানবজীবন সাহিত্যে রূপকাকারে উপস্থাপিত হয়—সাহিত্য সর্বদা রূপকধর্মী। মানুষের গোটা বাস্তব জীবন সাহিত্যে ঠাঁই পায় না, স্থূল বাস্তব ঘটনা সাহিত্যের মধ্যে রূপকের আকার লাভ করে। তাঁর *Divina Commedia* তো তাঁরই ব্যক্তিজীবনের রূপক-আখ্যান। সাহিত্যবিচারে তাঁর এই রূপকতত্ত্ব পরবর্তি-কালে বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছিল।

দান্তে ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন যে, গম্ভীরার্থব্যঞ্জক কাহিনী না হলে শুধু গুরুগম্ভীর ভাষায় (*grandiosa*) কাব্য রচনা সম্ভব নয়। বিষয়বস্তুটি *gravitas sententiae* অর্থাৎ গভীর অর্থবহ হওয়া চাই। তার পরে চাই *grandiosa* রচনারীতি—যাকে আর্নল্ড বলেছেন 'grand manner'। যে মৌলিক ভাষায় এই *grandiosa* আছে, তাকেই কাব্যের বাহন করতে হবে।

সাহিত্যের উপাদান কী নিয়ে গড়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে তিনি তিনটি লাতিন শব্দের উল্লেখ করেছেন: (১) *Salus* অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, (২) *Venus* অর্থাৎ প্রেম, এবং (৩) *Virtus* অর্থাৎ ভগবৎ-চিন্তা। সহজ কথায় দেশপ্রেম, নারীপ্রেম ও

ভগবৎ-প্রেম—কাব্য প্রধানতঃ এই তিনটি উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠে। তাঁর পরবর্তিকালে কাব্য-উপাদান নিয়ে বহু আলোচনা গবেষণা হলেও এই উপাদানগুলি এখনও কাব্য রচনার প্রধান অবলম্বন।

কাব্যের উপাদানের পর তিনি ঐ *Il Convivio*-তে কাব্য-রচনারীতি বা প্রকাশরীতি সম্বন্ধেও তিনটি নির্দেশ দিয়েছেন: (১) *Superbia Carminum* অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ছন্দপ্রকরণ (২) *Constructionis elatio* অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্টাইল যা কাব্য-উপাদানকে উচ্চতর মার্গে নিয়ে যেতে পারে এবং (৩) *Excellentia Vocabulorum* অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শব্দ-উপাদান। এইগুলি কাব্য-উপাদানের স্টাইলগত লক্ষণ। তিনি এই প্রসঙ্গে রচনারীতির ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, যাঁর রচনাভঙ্গিমা আমাদের মনকে উচ্চতর লোকে নিয়ে যায়, তিনিই হলেন "illustrious master of style."

মধ্যযুগের অন্ধকারের মধ্যে আবির্ভূত হয়েও দান্তে সাহিত্য-বিচারে নতুন কথা ও জটিল সমস্যার কথা শুনিয়েছেন। লোক-ভাষার কাব্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা এবং কাব্য মূলতঃ রূপকধর্মী—এই দুটো তত্ত্বকথা তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। তাঁর পরে কিছুদিন লাতিন ভাষার গৌরব অটুট থাকলেও, খ্রীষ্টানী উন্নাসিকতা লোকভাষাকে আর একঘরে করে রাখতে পারল না, 'illustrious vernacular' তার যথাযোগ্য স্থান লাভ করল এবং ভারতে যেমন সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে প্রাদেশিক ভাষাসমূহ সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হল, তেমনি য়ুরোপেও মধ্যযুগীয় কালরাত্রির অবসানে ফরাসী, ইতালি, জার্মান ও ইংলণ্ডের প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যক্ষেত্রে যথাযোগ্য ঠাঁই পেল। লাতিন ভাষা পণ্ডিত ও ধর্মযাজকদের তর্ক-কলহের মধ্যে কিছুকাল জীবিত থাকলেও তার অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। লাতিনের মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করলেন দান্তে—নূতন জীবন-জিজ্ঞাসার বাহন সৃষ্টি করলেন *Vita nouva* ও *Divina*

Commedia-র মহাকবি। এইজন্য আধুনিক য়ুরোপীয় সমালোচনা, ভাষা ও সাহিত্যের গুরুপদ তাঁরই প্রাপ্য।

চতুর্দশ-ষোড়শ শতাব্দীর সমালোচনা

স্যর ফিলিপ সিড্‌নের *Apologie for Poetrie* গ্রন্থটি শুধু ইংরাজী সাহিত্যের নয়, ১৬শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্যতত্ত্ব জানতে হলে এই একখানি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। দান্তের পর সিড্‌নেই সাহিত্যবিচারে কতকগুলো মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেন এবং মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টানী সঙ্কীর্ণতা থেকে সাহিত্যকে রক্ষার চেষ্টা করেন। অবশ্য তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেও সারা য়ুরোপেই সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৪শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দান্তের অবসান হল এবং ১৬শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে সিড্‌নের *Apologie for Poetrie* (1596) প্রকাশিত হল। এই প্রায় পৌনে তিনশ বছর ধরে য়ুরোপের নানা অঞ্চলে সাহিত্যবিচার কোন্ পথ ধরে চলছিল সংক্ষেপে তার পরিচয় নেওয়া যাক।

ইতালি, ফরাসী ও জার্মান সমালোচনা (১৪শ-১৬শ খ্রীঃ অঃ)

ইতালিতে দান্তের পর পেত্রার্কা (১৩০৪-৭৪) এবং বোকাচিও (১৩১৬-৭৫) শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকের গৌরব লাভ করেছিলেন। পেত্রার্কা কিন্তু সাহিত্যবিচারে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নি, দান্তের কবিস্বরূপ নির্ধারণে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন ; তাঁর চেয়ে বরং বোকাচিও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন বেশি। পলিটিয়ান (১৪৫৪-৯৪) এবং স্কালিজার (১৪৮৪-১৫৫৮) গ্রীক-রোমান সাহিত্যকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন, সাহিত্যবিচারে নতুন কথা অল্পই বলেছেন। ভিদার *Poetica* (1527) হোরেসের পদাঙ্ক অনুসরণ মাত্র। ত্রিসিনোর *Poetica* (1563) এবং ট্যাসোর *Discorsi* (1594)-তে মহাকাব্য সম্বন্ধে আলোচনা

থাকলেও নতুন তত্ত্ববাদের অভাব আছে। ইয়াকোপ মাৎসোনি তাঁর *Difesa* (1587)-তে হোমার-ভার্জিলের চেয়ে দান্তেকে বড় বলেছেন। অ্যারিস্টট্লের *Poetics*-এর পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের পর ইতালিতে ক্লাসিক সাহিত্য চর্চার বান ডাকল। Giorgio Valla ১৪৯৮ খ্রীঃ অব্দে লাতিন ভাষায় *Poetics*-এর অনুবাদ করার পর অ্যারিস্টট্লের সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ইতালিতে আলোচনা শুরু হল। এই লাতিন অনুবাদের ইতালি ভাষায় অনুবাদ (১৫৪৮) করলেন Robertello। ফলে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নব্য রেনেসাঁসের পীঠস্থান ইতালিতে ক্লাসিক সাহিত্যতত্ত্বালোচনা আরম্ভ হল। ১৫৮৪ সালে Riccobono ঘোষণা করলেন যে, সৌন্দর্যই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই মতবাদ প্রচারের পর ক্লাসিকপন্থী ইতালীয় সমালোচনায় নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত হল। ফরাসী সমালোচনা-সাহিত্য ১৬শ শতাব্দীর পূর্বে কিছুটা নিদ্রিতাবস্থায় ছিল। গ্রীক ও রোমান সাহিত্যানুশীলনের ফলে ফরাসী সমালোচকবর্গ অলঙ্কার ও ছন্দ নিয়েই গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ১৬শ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের আবির্ভাবের ফলে ফরাসী সমালোচকবর্গ কাব্যতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এঁরা সাহিত্যবিচারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা যাচ্ছে :

(১) ধর্মান্ধতা ও ক্লাসিকতার আক্রমণ থেকে কাব্যকে রক্ষা করতে হবে।

(২) কাব্যের যথার্থ প্রকৃতি আবিষ্কার প্রয়োজন।

(৩) সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণী, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

(৪) কোন্ ভাষায় সাহিত্য রচিত হবে, লাতিন, না ফরাসী ভাষায় ?

অবশ্য সাহিত্য সম্বন্ধে এই রকম উদার ও মৌলিক প্রশ্ন জাগলেও ১৬শ শতাব্দীর ফরাসী সমালোচনা নীতিতত্ত্ব ও ক্লাসিক

আদর্শের আঁচল-ধরা হয়ে ছিল। *Roman de la rose* (1527) গ্রন্থের ভূমিকায় নীতিপ্রচারকেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে ধরা হয়েছিল। Sebillet তাঁর *Art Poetique Francois* (1548) গ্রন্থে কাব্যকে ভক্তিপূত ভাগবত ব্যাপার বলে বর্ণনা করেছিলেন। ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দে Jacques Peletior du Mans তাঁর *Art Poetique*-এ বলেন যে, কাব্য নীতি, চরিত্রাদর্শ ধর্ম প্রভৃতি প্রচার করবে। Ronsard-এর *Abrege de l'art poetique* (1565)-এ সাহিত্যের নৈতিক দিকটির ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। রেনেসাঁসের প্রভাবে হেলেনীয় সংস্কৃতি ফরাসীদেশে জনপ্রিয় হবার ফলে প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল, হোরেস, সিসিরো, কুইন্টি-লিয়ান প্রভৃতির গ্রন্থে বর্ণিত সাহিত্যতত্ত্ব ফরাসী সমালোচকদের মধ্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছিল ; এই যুগে ক্লাসিক আদর্শ ত্যাগ করে নতুন পথে যাবার কথা ফরাসী সমালোচকগণ ভাবতেও পারেন নি।

১৩শ থেকে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে জার্মান সমালোচকগণ বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারেন নি। ১২১০ খ্রীঃ অব্দে রচিত Strassburg-এর *Tristan* মহাকাব্যে সমসাময়িক কবিদের আলোচনা আছে। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে H. Bebel রচিত *Ars Versificandi* (1506)-তে কাব্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছিল। এই সময়ে ক্লাসিক সাহিত্যবিশারদ নিপুণ সমালোচক স্কালিজারের *Poetics*-এর প্রভাব জার্মান সমালোচনার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

ইংরেজী সমালোচনা (১৩শ-১৬শ খ্রীঃ অঃ)

একমাত্র স্যর ফিলিপ সিড্‌নেকে বাদ দিলে ১৬শ শতাব্দীর ইংরেজী সমালোচনার বিশেষ বৈচিত্র্য ও মননশীলতা লক্ষ্য করা যাবে না, অভিনবত্বের স্বাদও পাওয়া যাবে না। খ্রীঃ ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে যখন নতুন করে হেলেনীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির তরঙ্গে

ইংলণ্ড উদ্বেল হয়ে উঠল, তখন ক্লাসিক সাহিত্যের অলঙ্কারতত্ত্বই একমাত্র সমালোচনা—এই রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা ইংরেজ সমালোচকদের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সিড্‌নে এসে সেই কৃত্রিম শাসনরজ্জু অনেকটা শিথিল করে দিলেন। আমরা এখানে সর্বপ্রথম সিড্‌নের পূর্ববর্তী ইংরেজী সমালোচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে সিড্‌নে-প্রসঙ্গে অগ্রসর হচ্ছি।

স্টিফেন হয়েজ নামক একজন কাব্যতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সপ্তম হেনরির সভাসদ ছিলেন। তাঁর *The Passetyme of Pleasure* (1509) নামক রূপকাশ্রয়ী গ্রন্থে অলঙ্কারতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্ব বিস্তারিত আকারে প্রথম ব্যাখ্যা করা হয়। এর পর স্যর টমাস উইলিয়ম প্রণীত *Art of Rhetoric* (1553)-এ নতুন সমালোচনার আস্বাদ পাওয়া গেল। তিনিই সর্বপ্রথম ভাষার বিশুদ্ধির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ; ইংরেজী ভাষায় অত্যধিক লাতিন শব্দের ব্যবহারকে তিনি নিন্দা করেছিলেন। অ্যাস্‌চামের *The School Master* (1570) তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। প্রথম দিকের আদর্শ গদ্যশিল্পী হিসাবে তো বটেই, তিনি এতে গদ্য ও পদ্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে মৌলিক কথা বলবার চেষ্টা করেছেন বলে ইংরেজী সমালোচনার গোড়ার দিকের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই যুগে গসনের (Gosson) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্টিফেন গসনের *Schoole of Abuse* (1579) একদা প্রবলভাবে সাহিত্যকে আক্রমণ করেছিল। তরুণ বয়সে গসন নাটক ও কাব্য রচনা করলেও পরে পিউরিটান মত গ্রহণ করে কাব্যসাহিত্যের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন—সেই বিরূপতার তিক্ততা তাঁর উক্ত প্রচারপুস্তিকায় ছড়িয়ে আছে। সে যুগের সমাজে বিখ্যাত ব্যক্তি স্যর ফিলিপ সিড্‌নেকে তিনি এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। সিড্‌নে বইটি পড়ে খুশি হতে পারেন নি, তিনি নিজেই কাব্যকে সমর্থন করে *Aplogie for Poetrie* রচনা করেন। সে যাই হোক, গসন যদিও নিজে সাহিত্যচর্চা করেছিলেন,

তবু সাহিত্য থেকে খ্রীষ্টানী পবিত্রভাব চলে গিয়ে গ্রীক পেগানবাদ আসছে বলে তিনি অতিশয় শঙ্কিত হয়েছিলেন। সাহিত্যে কবিরা মিথ্যার বেসাতি রচনা করছেন, দুর্নীতি প্রশ্রয় দিচ্ছেন, খ্রীষ্টীয় আদর্শ যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে না—এইজন্য তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি পুরোপুরি পিউরিটান মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সাহিত্য বিচার করতে গিয়েছিলেন বলে সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে লজ্ একখানি প্রত্যুত্তর-পুস্তিকা রচনা করেন, যার আখ্যাপত্র হারিয়ে গেছে। বোধহয় এই পুস্তিকার নাম ছিল *Honest Excuses*। তিনি এতে কাব্য, সঙ্গীত ও অভিনয়কে সমর্থন করে বলেন যে, এগুলি আদৌ মন্দ জিনিস নয়। কিন্তু লজ ঠিক সমালোচকের দৃষ্টিতে সাহিত্যবিচার করতে সক্ষম হন নি। যিনি গসনের ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সমালোচকের পক্ষ থেকে যথার্থ জবাব দিলেন তিনি হলেন সুপ্রসিদ্ধ স্যর ফিলিপ সিড্‌নে। সিড্‌নে ইংরেজী সমালোচনার প্রথম দিকনির্দেশক, প্রথম judicial critic।

অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করে উচ্চতর রাজকার্য ও সামরিক কর্তব্য পালন করেও স্যর ফিলিপ সিড্‌নের সাহিত্যরসিক মন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে নি। ইংরেজী ভাষায় তিনি সর্বপ্রথম বিস্তারিত আকারে কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন এবং পিউরিটান ধর্মান্ধতার হাত থেকে সাহিত্যকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি মুখ্যতঃ গসনের *Schoole of Abuse*-এর প্রতিবাদে ১৫৮০-৮১ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে *Apologie for Poetrie* রচনা করেন। তাঁর জীবিতকালে এটি পাণ্ডুলিপির আকারে কাব্যরসিকের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও তাঁর মৃত্যুর পর এই বিখ্যাত গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় (১৫৯৫)। একই সময়ে দুজন প্রকাশক এই গ্রন্থকে দু'নামে মুদ্রিত করে প্রচার করেন: (১) *Apologie for Poetrie* এবং (২) *The Defence of Poesie*। তাই এই গ্রন্থটি দু'নামেই চলে। এতে সিড্‌নে ধর্মান্ধ গোঁড়ামির

হাত থেকে কাব্যকে রক্ষা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্যের সংজ্ঞা, লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে মৌলিক আলোচনা করেন। এই গ্রন্থ বেন জনসন, শেক্‌সপীয়ার ও অন্যান্য নাট্যকারদের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। শেলী *Defence of Poetry* লেখবার সময় সিড্‌নের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত।

এই আলোচনায় সিড্‌নে শিল্পকে অনুকরণমূলক বলেও স্বীকার করলেন: "The poet does not imitate, but creates; it is the reader who imitates what the poet creates." অ্যারিস্টট্‌লের পরে আর কেউ এত স্পষ্ট ভাষায় শিল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারেন নি। তিনি আলোচনাপ্রসঙ্গে বললেন যে, শুধু ধর্মনীতি কেন, কোন বিচারেই কাব্য নিন্দনীয় নয়; শিশু বৃদ্ধ সকলেই কাব্য থেকে যুগপৎ শিক্ষা ও আনন্দ পেতে পারেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার, ঐতিহাসিক, দার্শনিক—সকলেই সাহিত্যের শরণাপন্ন হয়েছেন। কারণ কবিরা স্রষ্টা। অবশ্য তিনি স্বীকার করলেন যে, ইংলণ্ডে কিছু কিছু কুৎসিত সাহিত্য শিল্পকলাকে কলুষিত করছে। তবে তার জন্য সমস্ত সাহিত্য দূষ্য নয়। প্রাচীন রোমানরা কবিকে বলত *vates*—অর্থাৎ ধর্মগুরু, নবী। সিড্‌নে এই কথাটি সগর্বে ঘোষণা করেন।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি, তা নিয়েও তিনি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। তাঁকে যখন কলম ধরতে হয়েছিল, তখন ইংলণ্ডে সাহিত্যের বড় দুর্দিন। পিউরিটান আবহাওয়ার ফলে সাহিত্যকে 'profane' বলে শিষ্টজনে ঘৃণা করত। তাই তিনি হোরেসের মতো দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন: "Delightful teaching is the end of poetry." তিনি কিন্তু মনে মনে কাব্যের আনন্দময় সত্তার অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন, যখন তিনি *Chevy Chase* নামক ব্যালাড পড়তেন বা *Percy and Douglas* নামক গীতি-আলেখ্য শুনতেন, তখন তাঁর মন উল্লাসে উদ্বেল হয়ে উঠত—যা শত ভেরীতূরী-

নিনাদেও সম্ভব হত না। তাই তিনি সাহিত্যবিচারে আনন্দবাদেরই সমর্থক, যদিও যুগধর্মানুসারে তাঁকে নীতিপ্রচার ও শিক্ষাদানের কথাও বলতে হয়েছিল। পিউরিটানেরা বলত—সাহিত্য শুধু কুশিক্ষা দেয়, তাঁকে তার প্রতিবাদ করে দেখাতে হয়েছিল যে, তা সত্যি নয়, সাহিত্য সুশিক্ষাই দেয়। কাজেই তিনি বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে সাহিত্যের শিক্ষাদানের কথাটাই প্রধানতঃ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজে সাহিত্যবিচারে আনন্দবাদী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সমালোচনা

১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় সমালোচনা উৎকট সমস্যার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সে সঙ্কট হল নব্য-ক্লাসিক (Neo-classical) সমালোচনার সর্বগ্রাসী প্রভাব। ইতিপূর্বে ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের আবির্ভাবের ফলে হেলেনীয় সংস্কৃতির প্রসাদ লাভ করে য়ুরোপীয় সমালোচনাও প্লেটো-অ্যারিস্টট্‌ল-হোরেসের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। অ্যারিস্টট্‌লের *Poetics*-এর লাতিন অনুবাদ (১৪৯৮) য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়লে গ্রীক সাহিত্য-বিচারপ্রণালী অনড় শিলাস্তূপের মতো য়ুরোপীয় শিল্প, সমালোচনা ও সাহিত্যের ওপর চেপে বসল। তখন সাহিত্যবিচারকগণ গ্রীক-রোমান আদর্শের নজির তুলে কৃত্রিম বন্ধনের দ্বারা সাহিত্যের বিকাশধারাকে বেঁধে ফেলতে চাইলেন; কিছুটা সমর্থও হলেন। কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে য়ুরোপীয় সমালোচনা গ্রীক-রোমান আদর্শের অন্ধ আনুগত্য ত্যাগ করে নতুন পথ বেছে নেবার জন্য উৎসুক হল—পাশ্চাত্য সমালোচনায় যথার্থ যুগান্তর উপস্থিত হল।

ইতালীয় সমালোচনা

১৭শ শতাব্দীতে ইতালীয় সমালোচনায় বিশেষ কোন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া না গেলেও,

সমালোচকেরা যে পুরাতন পথ ছেড়ে নতুন পথে চলতে চাইছেন, তার খানিকটা আভাস পাওয়া গেল। এ বিষয়ে আলোচনা করতে হলে সকলের আগে Traiano Boccalini রচিত *I Ragguagli di Parnaso* (1612) নামক সমালোচনা-গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। এতে প্রাচীন লেখকের কাল্পনিক কথোপকথনচ্ছলে সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের আস্ফালনকে নিন্দা করা হয়েছে, সাহিত্যের রূপ ও রীতিগত নানা ত্রুটিকে শাণিত ভাষায় তীব্র আক্রমণ করাও হয়েছে। পরবর্তিকালের সাহিত্য-সমালোচনায় Boccalini-র প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। এই আলোচনা অত্যন্ত সজীব, প্রখর ও বুদ্ধিদীপ্ত—কিন্তু তত্ত্ববিচার ও মতপ্রতিষ্ঠায় খুব গভীর নয়। বরং এঁর পরে আবির্ভূত Tassoni, Pallavicino, Salvatore Rosa প্রভৃতি সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী এঁর চেয়ে গভীর ও মৌলিক। Galileo Galilei যদিও বৈজ্ঞানিক রচনা বেশি লিখেছেন, তবু তাঁর সাহিত্যালোচনা প্রশংসা দাবি করতে পারে।

১৭শ শতাব্দীর শেষের দিকে ইতালীয় কাব্যধারার স্রোতোপথ শুষ্ক হয়ে এল, কবির কুরুচি কাব্যকে শাসন করতে লাগল। এই সময়ে 'আর্কাডিয়ান অ্যাকাডেমি' (Arcadian Academy, 1690) প্রতিষ্ঠিত করে এই সংস্থার নেতৃস্থানীয় Crescimbeni এবং Gravina কাব্যে কুরুচির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন; বিশুদ্ধ যুক্তি ও নীতিনিয়মের নিগড়ে কাব্যের প্রাণ যে বাঁধা পড়ে, সে কথাটাই তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন। একদা এই অ্যাকাডেমি ইতালীয় সাহিত্যসমাজে প্রায় গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৮শ শতাব্দীতে ইতালীয় সমালোচনা নতুন পথের যাত্রী হল; সাহিত্যবিচারে যুগান্তর আনলেন Muratori ও Vico। Muratori সমালোচনায় সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক চেতনা প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করলেন; তিনি ইতালির পূর্বতন সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিস্মৃতির সমুদ্র' থেকে আবার উদ্ধারের চেষ্টা করলেন এবং তাকে

যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। Vico তাঁর *Scienza Nuova* (1725)-তে ইতিহাসের তাৎপর্য ও সৌন্দর্যদর্শন আলোচনা করে সাহিত্যবিচারে নতুন পথ খুলে দিলেন। সাহিত্যবিচার প্রধানতঃ সৌন্দর্যবিচার এবং সাহিত্যের উপাদান মূলতঃ মানবজীবন ও মানব সমাজ—এই হল তাঁর মৌলিক সিদ্ধান্ত। তাঁর এই ঐতিহাসিক সৌন্দর্য ব্যাখ্যা সে যুগের ইতালীয় সাহিত্যসমাজ ঠিক অনুধাবন করতে পারে নি। De Senalis এসে Vico-র মতকে ব্যাখ্যা, প্রচার ও জনপ্রিয় করলেন।

১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইতালীয় সমালোচনা আরও অগ্রবর্তী হল। এই যুগে সাহিত্যতত্ত্বসংক্রান্ত নানা রকম মত-বিরোধ ও তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হল। য়ুরোপের নানা দেশ থেকে অনুবাদসাহিত্যের মারফতে নানা ক্লাসিক গ্রন্থ ইতালিতে আসতে শুরু করল। Giuseppe Baretti ইংরেজী সাহিত্যবিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলে ইতালি য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হল। তিনি *Frusta letteraria* (1763-65) নামক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করে সাহিত্যবিষয়ক নানা প্রখর আলোচনা শুরু করলেন। দান্তেও তাঁর হাত থেকে রেহাই পেলেন না; তিনি দান্তের অমর মহাকাব্যের মধ্যেও নানা ত্রুটি আবিষ্কার করলেন: ফলে সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে এই শতাব্দীর শেষের দিকে তুমুল কলহ দেখা দিল। Saverio Bettinelli, Gaspare Gozzi প্রভৃতি সমালোচকেরাও দান্তে-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেন। সমালোচক Vico সর্বপ্রথম দান্তের সাহিত্যরস বিশ্লেষণ করে মহাকবিকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। Girolamo Tiraboschi প্রায় দশ বছর ধরে (১৭৭২-৮২) ইতালীয় সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাস রচনা করলেন—পরবর্তী যুগে তাঁর এই মহাগ্রন্থ ইতালিসাহিত্যের ইতিহাসের একমাত্র আদর্শ হয়েছিল। এর পর যিনি ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন, তিনি এই গ্রন্থ থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী—এই দুশো বছরের মধ্যে ইতালীয় সমালোচনা এক দিকে তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাহিত্যাদর্শকে আবিষ্কার করল আর এক দিকে কন্টিনেন্টের অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ইতালীয় সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক প্রসারিত হল। সর্বোপরি চিরাচরিত ক্লাসিক রীতির অন্ধ আনুগত্য অনেকটা শিথিল হয়ে এল। দান্তেকেও এঁরা সব সময়ে শিরোধার্য করতে পারলেন না, সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেন। ১৯ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইতালিতে রোমান্টিক সমালোচনার আবির্ভাব হবার পর পূর্বতন ক্লাসিক বন্ধনের অবসান হল এবং সাহিত্যবিচারপদ্ধতি সৌন্দর্যবাদী রসতত্ত্বের দুর্নিবার প্রভাবকে স্বীকৃতি জানাল।

ফরাসী সমালোচনা

১৭শ শতাব্দীর ফরাসী সমালোচনা প্রধানতঃ দ্বান্দ্বিক, কলহাকীর্ণ এবং নানা সংশয়ে সন্দিহান। এই দ্বন্দ্বের মূলকথা নবীন ও প্রবীণের মতবিরোধ। সাহিত্যে ক্লাসিক আদর্শ না রোমান্টিক সমালোচনা, সাহিত্যের বাহন কি হবে, ফরাসী না, লাতিন,—এই সমস্ত নানা দ্বিধা সংশয় গোটা ১৭শ শতাব্দীর ফরাসী সমালোচনার আকাশ বিতর্কের কুজ্ঝটিকায় অস্বচ্ছ করে তুলেছিল। ১৮শ শতাব্দীতেও তার জের মেটে নি।

যাঁরা গ্রীক-রোমান আদর্শ অর্থাৎ ক্লাসিকপন্থী সমালোচক ও সাহিত্যিক, তাঁরা পুরাতন আদর্শকেই শিরোধার্য করে নিয়ে বললেন যে, উক্ত আদর্শের ঘনিষ্ঠ অনুসরণের ফলেই ফরাসী সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে। সমালোচক Malherbe ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে কবি Desportes-এর কাব্যগ্রন্থের টীকা করতে গিয়ে প্রচার করলেন যে, গ্রীক ক্লাসিক আদর্শই কাব্যরচনার একমাত্র শ্লাঘনীয় রীতি। তিনি কাব্যে আবেগের চেয়ে যুক্তির প্রতিফলন দেখতে অধিকতর উৎসুক হলেন। তাঁর যুগে তিনি সাহিত্য ও

সমালোচনার অধিনায়কত্ব করেছিলেন। সমস্ত ১৭শ শতাব্দী ধরেই প্রধানতঃ কাব্যরীতি ও নাট্যাদর্শের রূপকল্প নিয়ে প্রখর তর্কবিতর্ক চলেছিল। ট্র্যাজেডি রচনায় গ্রীক 'Three unities'-এর ঘনিষ্ঠ অনুসরণ নাট্যকারের প্রথম কর্তব্য বলে নির্ধারিত হল। Mairet তাঁর *Silvanire* (1631) নাটকের ভূমিকায় সগর্বে এই কথা ঘোষণা করলেন। Boileau-এর *L' Art Poetique* (1674) প্রধানতঃ হোরেসের *Ars Poetica*-র পদাঙ্ক অনুসরণ করে লেখা। Rapin-এর *Comparaisons*-এ ভার্জিল, প্লেটো, অ্যারিস্টট্ল প্রভৃতি গ্রীক ও রোমান মনীষীদের সাহিত্যতত্ত্ব ও কাব্যপদ্ধতি শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হল। ১৮শ শতাব্দীতেও এই গ্রীক আদর্শানুসরণ খর্ব হল না। ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দে Mme. Dacier হোমরের ইলিয়াড অনুবাদ করতে গিয়ে ফরাসী ভাষার দীনতা স্বীকার করে বললেন যে, গ্রীকভাষার ক্লাসিক মহিমা কোন প্রাদেশিক ভাষাতেই যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায় না।

অবশ্য সকলেই যে ক্লাসিক পন্থাকে নির্বিচারে মেনে নিলেন, তা নয়। কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কর্কশ সুর তুললেন। Corneille-এর *Discourse* (1660) গ্রন্থে এবং তাঁর নাটকের ভূমিকায় ও নানা বিতর্কমূলক আলোচনায় তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে, নীতিনিয়ম নয়, ক্লাসিক আনুগত্য নয়—দর্শকের মনে নিছক আনন্দ দেওয়াই নাটক রচনার উদ্দেশ্য। Moliereও তাঁর নাটকের ভূমিকায় এই মত সমর্থন করলেন। Saint-Evermond নাটকরচনায় ক্লাসিক বন্ধনকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করলেন। ক্রমে প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্ব প্রবলাকার ধারণ করল। একদল বললেন, কাব্যরচনায় পুরোদস্তুর ক্লাসিক আদর্শ মানতে হবে। খ্রীষ্টানী আদর্শ মহাকাব্য রচনায় সার্থক হতে পারে না—এই রকম অদ্ভুত মতও প্রচারিত হল। এমন কি, স্মৃতিস্তম্ভের লিপি লাতিন না ফরাসী, কোন্ ভাষায় উৎকীর্ণ হবে, তা নিয়েও কলহ সৃষ্টি হয়েছিল।

পূর্বে আমরা Mme. Dacier-এর ইলিয়াড অনুবাদ প্রসঙ্গে দেখেছি, তিনি অনুবাদ করতে গিয়ে বলেছিলেন, ক্লাসিক গ্রীক কাব্যকে দুর্বল ফরাসী ভাষায় ভাল করে প্রকাশ করা যায় না। এর প্রতিবাদে Houlder de la Motte আবার উল্টো কথা বললেন। তাঁর মতে ফরাসী ভাষা গ্রীকের চেয়ে কোন দিক দিয়ে দুর্বল নয়, বরং গ্রীক হোমরকে ফরাসী ভাষায় অধিকতর সুন্দর করে ভাষান্তরিত করা যায়। তিনি হোমরের অনেক ত্রুটিও আবিষ্কার করেছিলেন। একদিকে ক্লাসিক গ্রীক আদর্শ, আর একদিকে ফরাসী আদর্শ—এই দ্বন্দ্বের মধ্যে মধ্যপন্থা নিলেন Fenelon তাঁর *Lettre Sur les Occupation de l'Academie*-এ। এই সময়ে ফরাসী সাহিত্যিক ও সমালোচকের দৃষ্টি অনেক প্রসারিত হল—যখন ফরাসী ভাষায় শেকস্‌পীয়রের তর্জমা ও আলোচনা শুরু হল। অবশ্য Voltaire তাঁর *Lettre a l' Academic*-তে শেকস্‌পীয়রের বিরোধিতা করেছিলেন।

১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ফরাসী সমালোচনায় যুগান্তরের প্রতিধ্বনি শোনা গেল। এবার আর ক্লাসিক আদর্শ নয়, রোমান্টিকও নয়,—দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব স্থাপিত হল। Diderot তাঁর *De la poesie dramatique* (1759) গ্রন্থে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে নিয়ে ট্র্যাজেডি রচনার নির্দেশ দিলেন। তিনি কখনও নতুন সাহিত্য জন্মের কথা ঘোষণা করলেন, কখনও-বা পুরাতন সাহিত্যকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার আরম্ভ করলেন। Diderot এবং D' Alember-এর পরিচালনায় প্রকাশিত *The Encyclopedie* (1751-52)-তে প্রাচীনের প্রতি অনাবশ্যক শ্রদ্ধা নিন্দাবাণে জর্জরিত হল। রুসো যদিও সমালোচক ছিলেন না, তবু তিনি য়ুরোপীয় নব্যরোমান্টিকতার জনক বলে আখ্যাত হয়েছেন। Mme. de Stael এবং Chateaubriand এঁর আদর্শের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হন।

পুরাতন ও নতুনের দ্বন্দ্বে ক্লাসিকতার অবসান ঘনিয়ে এল, Mme. de Stael-এর *De la litterature* (1800) প্রকাশিত

হলে কাব্যে কৃত্রিম ক্লাসিকবন্ধন হ্রাস পেল, ফরাসী বিপ্লবের অগ্নিবাণী ফরাসী সাহিত্যের প্রাচীন আনুগত্য ও জরাজীর্ণতাকে ভস্মীভূত করে এদেশের সাহিত্য ও সমালোচনাকে হৃদয়াবেগের প্রসারিত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করল।

জার্মান সমালোচনা

১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে ফরাসী সমালোচনার মতো জার্মান সমালোচনাতেও ক্লাসিক আদর্শ অনুসৃত হয়েছিল। Martin Optiz তাঁর *Buch von der deutschen Poeterey* (1624)-তে বলেছেন যে, জার্মান সাহিত্যের একমাত্র কর্তব্য—ঘনিষ্ঠভাবে গ্রীক আদর্শ অনুসরণ করা। একদিকে যেমন গ্রীক আদর্শ জার্মান সাহিত্যে একমাত্র আদর্শ বলে প্রচারিত হল, তেমনি আবার অপরদিকে ফরাসী রীতিও কম জনপ্রিয় হয় নি। Friedrich Von Canitz, Christian Wernicke প্রভৃতি লেখকগণ ফরাসী আদর্শ অনুসরণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে Johann Christoph Gottsched সাহিত্যে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্থাৎ বাস্তবতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে *Versuch einer kritischen Dichtkunst vor die Deutschen* (1730) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে যা বিশ্বাস করা যায় না, তা সাহিত্যের কোঠায় স্থান পেতে পারে না। পরবর্তিকালে Gottsched-পরিকল্পিত 'বিশ্বাসযোগ্যতাবাদ' নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকের মতভেদ হয়। প্রসিদ্ধ সুইস্ সমালোচক Johann Jakob Bodmer এবং Jakob Breitinger এই মতের প্রতিবাদ করে গ্রন্থ রচনা করেন। Gottsched শুধু কাব্যরচনার কৌশলের ওপর ('la critique par les rigles') অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কিন্তু উক্ত সুইস্ সমালোচকদ্বয় সাহিত্যবিচারে আবেগ-অনুভূতিকেই ('la critique de sentiment') অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এইভাবে পুরাতনপন্থী Gottsched এবং নবীনপন্থী

Bodmer ও Breitinger-এর মধ্যে বিষম মতভেদের ধূলিঝড় উঠেছিল। ফরাসী সমালোচনাতেও অনুরূপভাবে নবীন ও প্রাচীনের দ্বন্দ্ব ('querelle des anciens et des modernes') উৎকট আকার ধারণ করেছিল।

১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মান সমালোচনা নতুন পথে যাত্রা করবার উদ্যোগ করল, নবীনপ্রবীণের দ্বন্দ্ব শমতা লাভ করল, ক্রমে ক্রমে সমালোচনায় আধুনিক মনোভাব যথাযোগ্য আসন পেল। সুপ্রসিদ্ধ Gotthold Ephraim Lessing-এর দুখানি সমালোচনা-গ্রন্থ (*Briefe die neueste Litteratur betreffend*, 1759 ; এবং *Laokoon*, 1760) জার্মান সমালোচনাপদ্ধতির আমূল সংশোধন করতে শুরু করল। লেসিং শিল্প ও সাহিত্যের নানা প্রকরণ বিচার করে শিল্পতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বাইরে থেকে মনগড়া থিয়োরির দ্বারা সাহিত্যসমালোচনার পণ্ডশ্রম করেন নি। সৌন্দর্য, আবেগ, মহনীয়তা—ইত্যাদি উচ্চতর পরিমণ্ডল থেকে তিনি সাহিত্যকে বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর সময় থেকেই জার্মান সমালোচনা গ্রীক-আদর্শের পা গুণে গুণে চলা থেকে মুক্তি পেল, সাহিত্যের মুক্তি ঘটল তাঁরই হাতে।

এই প্রসঙ্গে জার্মান সাহিত্য সমালোচনায় একটি বিশিষ্ট আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দের দিকে জার্মানিতে *Sturm und Drang* ('Storm and Stress') নামক সাহিত্যান্দোলন শুরু হয়। এই দলের নেতা ছিলেন হার্ডার, গ্যয়ঠে এবং শিলার। এঁরা সাহিত্যসমালোচনা, শিল্পকলা, সমাজজীবন—সর্বত্র নবজীবনের জয়বার্তা শুনতে পেয়েছিলেন। যেখানে এঁরা ত্রুটি দেখেছেন, সেখানেই তীব্রভাষায় আক্রমণ করেছেন। ফ্রেড্রিক ক্লিঙ্গার '*Wirrwar, oder Sturm und Drang* ('Confusion, or Storm and Stress'—১৭৭৬ সালে অভিনীত) নামক নাটকে সর্বপ্রথম ফরাসী ক্লাসিক নাট্যকলার দাসত্ব ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে নাট্যরচনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এই

নাটকের নাম থেকে *Sturm und Drang* নামের উৎপত্তি হয়। এঁদের মধ্যে গ্যয়ঠের রচনাতেই উত্তেজনার স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। এঁরা বিদেশী সাহিত্যাদর্শের (তা সে গ্রীক অথবা ফরাসী যাই হোক) হাত থেকে জার্মান সাহিত্যকে মুক্ত করার জন্য বিশেষ প্রয়াস করেছিলেন।

১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে Schlegel এবং তাঁর অনুজ August Wilhelm—দুজনে মিলে *Athenoeum* (1798-1800) নামক পত্রিকায় সোচ্চারে প্রচার করলেন যে, ক্লাসিক আদর্শই একমাত্র আদর্শ নয়, আধুনিক সমালোচক ও শিল্পীর সৃষ্টি ও বক্তব্য প্রাচীন 'ধ্রুপদী' আদর্শের চেয়ে কোন দিক দিয়েই নিন্দনীয় নয়। এঁরা দুজনে জার্মান সাহিত্য ও সমালোচনাকে নিয়মকানুনের অন্ধ আনুগত্য থেকে উদ্ধার করে রোমান্টিকতার উদার আলোকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অবশ্য Sehlegel-এর প্রধান গ্রন্থ ১৯শ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়। যাই হোক, ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি ফরাসী দেশেও ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে পুরাতন পন্থাকে বাতিল করে নব্যরোমান্টিকতা, জীবন-বোধের বিশালতা ও সৌন্দর্যচেতনা সাহিত্যসমালোচনায় ক্রমেই যথাযোগ্য আসন লাভ করেছিল। জার্মান সমালোচনাতেও প্রায় একই সময়ে একই বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হবে।

ইংরেজী সমালোচনা

ইরেজী সাহিত্যে ১৭শ শতাব্দীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য সমালোচক হলেন বেন জনসন।[১] অবশ্য তিনি প্রধানতঃ নাট্যকার, গৌণতঃ সমালোচক। নাট্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতে তাঁকে পুরোপুরি গ্রীক ক্লাসিকপন্থী বলে মনে হয়। তিনি নিজেও অ্যারিস্টোফেনিসের আদর্শ অনুসরণ করে কমেডি লিখেছিলেন। তাঁর সময় থেকে অসংযত রোমান্টিকতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। তিনি তাকে রুখতে গিয়ে ক্লাসিকতার

আসল নাম—Benzamin Jonson (1572-1637)

গজকাঠি বেছে নিলেন। অবশ্য সাহিত্যবিচারে তিনি কোন নতুন কথা বলতে পারেন নি, অ্যারিস্টট্‌লকে পদে পদে অনুসরণ করেছেন। মাঝে মাঝে তিনি ক্লাসিক অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসে এমন কথাও বলেছেন যাতে তাঁর মনের উদারতা ও আধুনিকতা ধরা পড়েছে। তিনি কাব্যে ব্যাকরণের প্রভাব সম্বন্ধে স্পষ্টই বলেছেন, "I am not of that opinion to conclude a poet's liberty within the narrow limits of laws which either the grammarians or the philosophers prescribe." তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি "To judge of poets is only the faculty of poets"—আজকের পাঠকের কাছে যেভাবেই গৃহীত হোক না কেন, একদা এই উক্তিটি প্রায় সূক্তির আকারে চলেছিল। বেন জনসনকে বাদ দিলেও ১৭শ শতাব্দীতে আরও নানাজনে ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্যের কলেবর পরিপূর্তির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কাম্পিয়ানের *Observations in the Art of English Poesie* (1602) এবং স্যামুয়েল ডানিয়েলের *Defence of Rhyme* (1603) গ্রন্থ দুটিতে কাব্যক্ষেত্রে ইংরাজী শব্দ ও ছন্দ প্রয়োগ প্রভৃতি নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

১৭শ শতাব্দীর শেষের দিকে যিনি সমালোচনাক্ষেত্রে একাধিপত্য করেছিলেন তিনি কবি জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০)। বেন জনসন ১৭শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ক্লাসিক সাহিত্যরীতিকেই বরমাল্য দিয়েছিলেন। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষ ভাগে ড্রাইডেন ইংরেজী সমালোচনাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁকে ডক্টর জনসন বলেছেন, "Father of English Criticism"—কথাটা আদৌ অতিশয়োক্তি নয়। ড্রাইডেন সর্বপ্রথম গ্রীক-রোমান ক্লাসিক-বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করে ইংরেজী সাহিত্যকে স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যে মুক্তি দিতে চাইলেন। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি আধুনিক সাহিত্যিক, সমালোচক ও পাঠকের কাছে বেদমন্ত্র বলে

গৃহীত হতে পারে : "It is not enough that Aristotle has said so, for Aristotle drew his models of tragedy from Sophocles and Euripides; and if he had seen ours, might have changed his mind." এই উক্তির দ্বারা তাঁর নির্মোহ মনের ঋজুগতি এমন অভ্রান্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে, তাঁকে এখনও সাধুবাদ দিতে ইচ্ছে হয়। তিনি আরও দুটি উল্লেখযোগ্য মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে তুলনামূলক বিচারই যথার্থ সাহিত্যবিচার। দ্বিতীয়তঃ তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত হল: সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দদান, শিক্ষাদান গৌণ ব্যাপার। "Delight is the chief, if not the only end of poesy; instruction can be admitted but in the second place; for poesy only instructs as it delights." তাঁর প্রসিদ্ধ স্বীকারোক্তি—"My chief endeavours are to delight the age in which I live"—সর্বকালের শিল্পী ও সাহিত্যিকের মনের কথা বলে গৃহীত হতে পারে। ড্রাইডেনের *Essay on Dramatic Poesy* (1668) শুধু ১৭শ শতাব্দীর নয়, ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এক স্মরণীয় গ্রন্থ বলে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ড্রাইডেনের সমকালে বা একটু পরে ইংরেজী সমালোচনায় যেন বান ডাকল। কাব্যতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, কাব্যরচনার নীতিনিয়ম, নাট্যসাহিত্য প্রভৃতি নিয়ে অনেকেই আলোচনা ও গবেষণায় অবতীর্ণ হলেন—অবশ্য সে আলোচনাগুলি উচ্চ স্তরের নয়। তবু এই শতাব্দীর ইংরেজী সমালোচনায় একটা বিপুল প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে, যা সমকালীন ফরাসী ও জার্মান সমালোচনায় ততটা সুলভ নয়।

১৮শ শতাব্দীতেও এই ধারা অনুসৃত হল। পৃথক গ্রন্থ ও বিশেষ কবির প্রতি সমালোচকের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। অ্যাডিসনের প্যারাডাইজ লস্টের সমালোচনা (১৭১২), পোপের

ইলিয়াড কাব্যের ভূমিকা (১৭১৫) এবং অডিসি কাব্যের উপসংহার (১৭২৬), *Rambler* পত্রে ডক্টর জনসন কর্তৃক মিলটনের ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা, টমাস ওয়ারটনের *History of English Poetry* (1774-81) এবং ডক্টর জনসনের *Lives of the English Poets* (1779-81) নামক আলোচনা ও সমালোচনা-গ্রন্থকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আলেকজাণ্ডার পোপ *Essay on Criticism* (1711) নামক ছন্দে-লিখিত সমালোচনা-গ্রন্থে তদানীন্তন কাব্যের কী আদর্শ হওয়া উচিত তা নিয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। জনসনের *Lives of the English Poets* গ্রন্থে প্রায় বাহান্ন জন কবির জীবনী ও কাব্য-সমালোচনা স্থান পেয়েছে। অবশ্য এই গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর মতামত হয়তো আজ যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হবে না, তবু এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম কবিজীবনী ও কবিকৃতিকে একসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করা হয়। *Spectator* কাগজে অ্যাডিসন অনেকটা রম্যরচনার ছাঁদে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট রসগ্রাহী সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন; গোল্ডস্মিথের *Enquiry into the Present State of Polite Learning in Europe* (1759) গ্রন্থে সমালোচনার বিষয় ও সীমা আরও বর্ধিত হল।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, সমগ্র ১৭শ-১৮শ শতাব্দী ধরেই নব্য-ক্লাসিকতার ধারা সমালোচনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল; কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইংরেজ সমালোচকেরা গ্রীক আদর্শের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ ত্যাগ করে ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্যের স্বাভাবিক প্রবণতা ও সুস্থ প্রাণশক্তি বুঝবার চেষ্টা করছিলেন। ১৭৫৯ সালে গোল্ডস্মিথ "a national system of Criticism"-এর কথা বলেছিলেন। এত দিন ধরে ক্লাসিকপন্থী সমালোচকেরা পুরাতন গ্রীক-রোমান আদর্শকেই আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। গোল্ডস্মিথের এই উক্তিতে তাতে ফাটল ধরল। জার্মানিতে তখন লেসিং ও শ্লেগেল

সমালোচনায় নতুন সুর সংযোজনা করেছেন। শ্লেগেলের বিখ্যাত উক্তি তখন সারা য়ুরোপের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল: "Literature is the comprehensive essence of the intellectual life of a nation." সুতরাং বাইরের সাহিত্যাদর্শের মাপকাঠি দিয়ে জাতীয় সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করা যাবে কী করে? ইতিমধ্যে নব্যরোমান্সের আদি গুরু জাঁ জ্যাক রুশো তখন জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নতুন মুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন। সমস্ত বন্ধনের বিরুদ্ধে তাঁর বজ্রবাণী আসন্ন বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করল; কাজেই ১৮শ শতাব্দীতে য়ুরোপের সাহিত্যগগন থেকে ক্লাসিকতার উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হল। মানুষ আর পূর্বসূরীর অঙ্গুলিনির্দেশে পরিচালিত হতে চাইল না। ইংরেজী সমালোচনাতেও তার ঢেউ এসে প্রতিহত হল, ১৯শ শতাব্দীর গোড়াতেই ইংরেজী কাব্যে যেমন উদয়প্রত্যূষ সূচিত হল, তেমনি সমালোচনাও সৌন্দর্য ও জীবনরসে আর্দ্র হয়ে উঠল, জীবন ও সাহিত্যের সীমা অনেক বেড়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে রুশীয় সমালোচনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। রুশ জাতি মহামতি পিটারের চেষ্টায় ১৮শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে। এই সময় থেকে আধুনিক রুশীয় সাহিত্যের বিকাশ হয়; রুশীয় সমালোচনাসাহিত্যের জন্মনীড়ও এই শতাব্দীতেই নিহিত। অবশ্য প্রকৃত সমালোচনা বলতে যা বোঝায় ১৮শ শতাব্দীর রুশীয় সাহিত্যে তার দীনতা প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

১৮শ শতাব্দীতে ফরাসী ও ক্লাসিক আদর্শে রুশ সাহিত্যকে নতুন করে গড়ে তোলবার ঐকান্তিক চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ছন্দ নিয়ে প্রথম গবেষণা ও তত্ত্বরূপ নির্ধারণ করেন আধুনিক রুশীয় সাহিত্যের প্রথম সমালোচক Vasily Kirilovich Tredyakovsky (1703-69)। তিনি রুশীয় কবিতায় স্বরাঘাতপ্রধান

ছন্দ প্রবর্তনার গৌরব দাবি করতে পারেন। এই নতুন ছন্দ এবং অন্যান্য আধুনিক সাহিত্যকৌশল গ্রহণ করে আবির্ভূত হলেন Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1708-65)। তাঁকে রুশ সাহিতের জনক আখ্যা দেওয়া হয়। তিনি একদিকে যেমন নতুন রচনারীতি ও ছন্দপ্রকরণ গ্রহণ করলেন, তেমনি আবার সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সমালোচক Boileau-এর সাহিত্যাদর্শকে নিজ আদর্শ বলে স্বীকার করে সাহিত্যরচনায় ব্রতী হলেন। তাঁর ভাষা-প্রয়োগরীতি, ছন্দ-পরীক্ষা প্রভৃতির ফলে আধুনিক রুশ সাহিত্যের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমি রচিত হয়েছে।

Lomonosov-এর ছন্দ-রীতিকে ফরাসী রীতির আদর্শে আরও সুন্দর করে তুললেন Nikolay Mikhaylovich Karamzin (1766-1826)। রুশ সাহিত্যে রোমাণ্টিকতার সূত্রপাত করলেন Vasily Andreyevich Zhukovsky। পুশকিন প্রভৃতি এঁরই আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন।

ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী প্রভৃতি সমালোচনার তুলনায় রুশ সমালোচনার আদি পর্ব অত্যন্ত দুর্বল, শ্রীহীন ও সঙ্কুচিত। কারণ সহজেই অনুমেয়। ১৮শ শতাব্দীর কিছু পূর্ব থেকে রুশ জাতি রাষ্ট্রে ও সমাজে সেমীয়-তাতার প্রতিপত্তি এবং ধর্মে বাইজাণ্টাইন প্রভাব ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছিল। কাজেই ১৮শ শতাব্দীতেও রুশ সাহিত্য ও সমালোচনা কখনও ফরাসী, কখনও বা ক্লাসিক রীতি অনুসরণ করে য়ুরোপের অন্যান্য সাহিত্যের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করছিল।

সাত

॥ পাশ্চাত্য সাহিত্যবিচারের ধারা ॥

আধুনিক পর্ব : ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী

প্রতীচ্য জগতে উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যে য়ুরোপীয় সমালোচনার যে রকম বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে, মতভেদ ঘটেছে এবং মূল্যমানের খোলনলচে বিলকুল পালটে গেছে, এর পূর্বে সাহিত্যবিচারের সে রকম মূল্যবিভ্রাট দৃষ্টিগোচর হয় নি। ১৯শ শতাব্দীর পূর্বে সমালোচনার দ্বন্দ্বটা প্রধানতঃ ক্লাসিক ও রোমান্টিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯শ শতাব্দী থেকে সাহিত্যসমালোচনা যেমন বৈচিত্র্যে অভিনব হল, তেমনি নানা দার্শনিক প্রত্যয় এসে সাহিত্য ও সাহিত্যবিচারকে তর্কমুখর ও সংশয়সঙ্কুল করে তুলল। এই দেড়শ বছর ধরে সমাজ, রাষ্ট্র, দার্শনিকতা, মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতির এমন দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে যে, তার উত্তাপ সাহিত্য ও সমালোচনাকেও আতপ্ত করে তুলেছে। আলোচ্য প্রস্তাবে আধুনিক য়ুরোপীয় সমালোচনার সেই বৈচিত্র্য ও মূল্যনির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

ইতালীয় সমালোচনা

১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইতালীয় সমালোচনার একটা প্রধান লক্ষণ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই লক্ষণটি হল সাহিত্যবিচার-পদ্ধতিতে রোমান্টিকতার জয়জয়কার। এই অর্ধ শতাব্দীর অধিকাংশ সমালোচক সাহিত্যবিচারে রোমান্টিকতা, ব্যক্তিগত মনোভাব ও সৌন্দর্যবাদের দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ১৮১৬ সালে প্রসিদ্ধ ফরাসী মহিলাসমালোচক Mme. de Stael ইতালীয় পত্র *Biblioteca Italiana*-য় একটি প্রবন্ধ রচনা করে

বলেন যে, জ্ঞানের পরিপূর্তির জন্য শুধু নিজের দেশের সাহিত্য নয়, প্রচুর পরিমাণে বিদেশী সাহিত্যও অধ্যয়ন করা উচিত। তারপর থেকে ইতালীয় সমালোচনার সঙ্কীর্ণতা কেটে গেল, রোমাণ্টিক বিচারপদ্ধতি নিজ অধিকার স্থাপন করল। রোমাণ্টিক সমালোচকেরা ক্লাসিক 'ধ্রুপদী' সমালোচনাকে অস্বীকার করলেন, বিদ্রূপ করলেন। Giovanni Berchet ঐ ১৮১৬ সালেই *Littera Semiseria di Grisostomo* নামক বিদ্রূপাত্মক সমালোচনায় ক্লাসিকপন্থীদের আক্রমণ করেন। এই গ্রন্থটিকে ইতালীয় রোমাণ্টিক সমালোচনার ঘোষণাপত্র বলা যায়। ক্লাসিকপন্থীদের বাধা দেওয়ার জন্য Silvio Pellies-এর সম্পাদনায় *Il Conciliatore* নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে রোমাণ্টিক তত্ত্ব ও বিচারপদ্ধতি ব্যাখ্যাত ও অনুসৃত হয়েছিল। এই পত্রিকাতেই Romagnosi ঘোষণা করলেন যে, ক্লাসিক আদর্শের অনুকরণের অর্থ হল ইতালীয় কাব্যের অপমৃত্যু। এই রোমাণ্টিক সমালোচকদের নেতৃত্বের ভার পড়ল Alessandro Manzoni-র ওপর। তিনি নিজে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক ছিলেন এবং রোমাণ্টিক আদর্শ অনুসরণ করতেন। তাঁর মতে বাইরের থেকে আরোপিত কোন নিয়মকানুনের (তা সে গ্রীক রোমান যাই হোক) দ্বারা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে না।

১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও রোমাণ্টিক ও ক্লাসিক কলহের অবসান হল না। এই শতকের ইতালীয় সমালোচনার জনকস্থানীয় সুবিখ্যাত Francesco De Sanctis (1817-83) তাঁর দুখানা গ্রন্থে (*Storia della letteratura italiana* এবং *Saggi critici*) সাহিত্যবিচারের ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণী রীতি পরিত্যাগ করে সৌন্দর্যপদ্ধতি এবং সংশ্লেষণরীতিকেই অবলম্বন করেছিলেন। হেগেলের দর্শন ও ভিকোর সমালোচনার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তিনি বিষয়বস্তুর (matter) চেয়ে রচনারীতির (form) ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর

মতে সমালোচনার অর্থ—সৌন্দর্যোপভোগ ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দলাভ। তিনি তাঁর ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাসে (*Storia della letteratura italiana*) গ্রীক ও রোমান ক্লাসিকতাকে বাদ দিয়ে দান্তে থেকে ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাস আরম্ভ করেন।

অবশ্য রোমান্টিকতার প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্লাসিকতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার দিকেও কেউ কেউ আকৃষ্ট হলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও অধ্যাপক Giosue' Carducci যদিও রসবাদী সমালোচক ছিলেন, তবু পাণ্ডিত্যের দৃষ্টির দ্বারা ক্লাসিক সাহিত্যকেও সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করেছেন; পাণ্ডিত্য ও রসবোধ এবং রোমাণ্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও ক্লাসিক তথ্যনিষ্ঠা তাঁকে আদর্শ সমালোচকের অম্লান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি এবং তাঁর শিষ্য Alessandro D' Ancona, Adolfo Bartoli Pio Rajna প্রভৃতির চেষ্টায় সাহিত্যের ইতিহাসের বস্তুভিত্তিক সূচনা হল। মতবাদের দিক থেকে কারডুচ্চি ও তাঁর শিষ্যেরা ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক পন্থার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন।

১৯শ শতাব্দীর শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে শুধু ইতালির নয়, সমগ্র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচকের আবির্ভাব হল। তিনি হলেন সুপ্রসিদ্ধ Benedetto Croce (1860-1952)। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি কারডুচ্চি আর তাঁর শিষ্য-সম্প্রদায় রুচির দিক থেকে রোমাণ্টিক হলেও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ক্লাসিক-পন্থার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগের ইতালীয় সমালোচক এই জাতীয় তথ্যভারমন্থর গবেষণাকে 'জার্মান সমালোচনা' বলে বিদ্রূপ করতেন। এই সময়ে ক্রোচের আবির্ভাব হল। তিনি সমালোচনার দিক থেকে হেগেল, ভিকো ও ডি সাংকৃটিসের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। সাহিত্যপাঠের ফলে পাঠকের মনে যে ভাবানুষঙ্গ জন্মলাভ করে—তাঁর মতে তাই যথার্থ সমালোচনা। লেখকপ্রতিভা যেমন সৃষ্টিশীল, পাঠকের মনও অনুরূপভাবেই ক্রিয়াশীল ও সৃষ্টিক্ষম। দুয়ের

মিলনে সমালোচনার উদ্ভব। এই প্রসঙ্গে তিনি কাব্যবিচারে *poesia* ও *non-poesia* শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যেও ভালো কবিতার (*poesia*) সঙ্গে এমন অনেক অংশ থাকে, যা কাব্যপদবাচ্য নয় (*non-poesia*)। অবশ্য তাঁর এ মত অনেকে মেনে নিতে পারেন নি। সাহিত্য সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার্য। কাব্য গোটা আকারেই মনোহরণ করে; তার কোন্টুকু *poesia*, আর কোন্টুকু *non-poesia*, তা নির্ধারণ করা নিষ্প্রয়োজন। যাই হোক, ক্রোচের মতে দার্শনিক মনন ও বোধিদৃষ্টি না থাকলে সুসমালোচক হওয়া যায় না। *La Critica* নামক পত্রিকায় তাঁর যে সমস্ত প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, সেইগুলি পরে *La letteratura della nuova italia* নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর শিষ্যের দল বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও ক্লাসিক পন্থা ত্যাগ করে সৌন্দর্য ও 'স্বজ্ঞা'র (intuition) ওপর বেশি নির্ভর করেছেন। ক্রোচের মতকে সমর্থন করে ফ্লোরেন্স থেকে দুজন রসিক সমালোচক Giuseppe Prezzolini এবং Giovanni Papini তাঁদের সম্পাদিত *Il Leonardo* (১৯০০-৭) পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করেছেন প্রচুর। এঁদের আর একখানি পত্রিকা *La Voce* অতিশয় বিখ্যাত হয়েছিল। বিশ শতকের নব ইতালির সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন-শিল্পকলার যা কিছু অভিনবত্ব—সবই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল; ক্রোচে নিজেও এতে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখতেন। ক্রোচেপন্থীরা সমালোচনায় পাণ্ডিত্য, বৈজ্ঞানিকতা, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা প্রভৃতিকে বাহুল্য ও অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করতেন। তাঁরাও সাহিত্যবিচারে বুদ্ধিকে (intellect) ছেড়ে 'স্বজ্ঞা'কে (intuition) গ্রহণ করেছিলেন। এই স্বজ্ঞাবাদী সমালোচনা (intuitive criticism) সৌন্দর্যবাদী সমালোচনা নামেও পরিচিত। এখনও এই মতের যথেষ্ট প্রাধান্য আছে; শুধু ইতালিতেই নয়, অন্যান্য দেশেও শিল্পবিচারে ক্রোচেপন্থীরা এখনও সক্রিয়। অবশ্য স্বজ্ঞাবাদী সমালোচনা 'অদীক্ষিতে'র

হাতে পড়লে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমনের অবারিত উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্তুতিবাদে পরিণত হয়—যা প্রায়ই লঘুচিত্তের পরিচয় দিয়ে থাকে।

সর্বশেষে একজন আদর্শবাদী সমালোচকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি হলেন G. A. Borgese; ইনি নাট্যকার, কবি ও সমালোচক। ইনিও ক্রোচের মতো স্বজ্ঞাপন্থী এবং ব্যক্তিগত সমালোচনার পক্ষপাতী; অবশ্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতিকে ইনি স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে, শ্রেষ্ঠ সমালোচনা ও শিল্পবিচার সব সময়ে স্বজ্ঞাধর্মী হলেও উল্লিখিত বস্তুভিত্তিক পূর্বসূত্রগুলি সমালোচনার পক্ষে বাধা না হয়ে বরং সাহায্যই করে থাকে। ইনি পরে আমেরিকায় বাস্তুনির্মাণ করেন এবং ইংরেজী ভাষায়ও অনেক সাহিত্যপ্রবন্ধ রচনা করে বিখ্যাত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ইতালির শিল্পসংস্কৃতি ও শিল্পবিচারপদ্ধতি রাষ্ট্রযন্ত্রের কবলিত হয়ে রাজনীতির দাসত্ব করতে বাধ্য হয়েছে। সাহিত্য ও সমালোচনাই এই যুদ্ধের ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুরাতন মূল্যমান ভেঙে পড়েছে, নতুন মূল্যমানও গড়ে উঠতে পারে নি। ইতালিতে ক্রোচের পর নতুন সমালোচকের জন্ম হতে এখনও বিলম্ব আছে।

ফরাসী সমালোচনা

উনিশ ও বিশ শতকের ফরাসী সমালোচনাও নানা মতের দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। গোটা উনিশ শতক ধরে ফরাসী সমালোচকেরা সাহিত্য ও সমালোচনায় রোমাণ্টিক, ক্লাসিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক—কোন্ রীতিটি অধিকতর গ্রাহ্য হবে তাই নিয়ে বিষম সমস্যায় পড়েছিলেন। ইতিপূর্বে Sainte-Beuve, Renan ও Taine এসে সমালোচনার পথটি প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন; এঁদের মধ্যে Sainte Beuve-এর সমালোচক হিসাবে খ্যাতি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। আপেক্ষিক ও তুলনামূলক

সমালোচনার পথপ্রদর্শিকা Mme. de Stael (1766-1817) ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তুলনামূলকভাবে সমালোচনার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন। সমাজ সাহিত্যকে নিয়ত প্রভাবান্বিত করছে। Mme. Stael তাঁর দুখানা গ্রন্থে (*De la litterature Consideric dans ses rapports avec les institutions sociales* এবং *De l' Allemagne*) তাঁর এই মতবাদ ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি ফরাসী সাহিত্যকে দুভাগে ভাগ করেছিলেন— (১) দক্ষিণের সাহিত্য (অর্থাৎ ক্লাসিক—যার আদর্শ অন্যদেশীয়), (২) উত্তরের সাহিত্য (অর্থাৎ রোমাণ্টিক—যার আদর্শ স্থানীয়)। তাঁর সমালোচনায় প্রাদেশিকতাবর্জিত উদারতা ও মনের ব্যাপ্তি পরবর্তিকালের ফরাসী সমালোচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল।

এর পর সেই পুরাতন কলহ দেখা দিল: ফরাসী সাহিত্য কোন্ আদর্শ গ্রহণ করবে? রোমাণ্টিক, না ক্লাসিক? Chateau-briand (1786-1848) পুরাতন গ্রীক ক্লাসিক পন্থাকে জয়যুক্ত করতে চাইলেন; প্লেটোর ভাবজগতে স্বেচ্ছাবন্দী এই সমালোচক তদানীন্তন সাহিত্যের প্রতি আদৌ সুবিচার করেন নি। Gustave Planche এবং Nisard-ও প্রাচীন আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এঁরা দুজনে ক্লাসিক সাহিত্যের প্রতি অতিভক্তিবশতঃ ১৯শ শতকের সাহিত্যকে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন নি। Charles Maurras নামক এক প্রতিক্রিয়াশীল সমালোচক *Action Francaise* পত্রিকায় 'R'-আদ্যক্ষরযুক্ত তিনটি আধুনিক আন্দোলনকেই তীব্র আক্রমণ করেছিলেন; সে তিনটি হল— Reformation, Revolution, Romanticism। সুতরাং এই ক্লাসিকপন্থী সমালোচকের মনোভাব সহজেই বোধগম্য হবে। কিন্তু এতে রোমাণ্টিক সমালোচনা যে হতবল হয়ে পড়ল তা নয়। সেণ্ট্‌ বোভ স্বয়ং ফরাসী রোমাণ্টিকতার সঙ্গে একদা অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত ছিলেন; তাঁর রসবোধ ও অনুভূতির উত্তুঙ্গতা এখনও

পাঠকের কাছে বিস্ময়কর ও মনোহারী। একদিকে রোমান্টিকতা এবং অপরদিকে বৈজ্ঞানিক নিপুণতা, খুঁটিনাটি তথ্যপ্রীতি, ঐতিহাসিক ট্র্যাডিশন প্রভৃতি ক্লাসিক পন্থাতেও তাঁর অপ্রীতি ছিল না। অবশ্য সেণ্ট্‌বোভ মাঝে মাঝে সমসাময়িক লেখকদের প্রতি কিছু উষ্মা প্রকাশ করে ফেলেছেন। বালজাক, ফ্লোবেয়ার, বোদ্‌লেয়র প্রভৃতি ঔপন্যাসিক ও কবি সম্বন্ধে তাঁর মতামত বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। তাঁর *Port-Royal* (1837-38) গ্রন্থে রোমাণ্টিকতার সঙ্গে ক্লাসিক পাণ্ডিত্যের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে। তাঁব পত্রগুচ্ছ (*Correspondance générale*) পরবর্তী সমালোচকের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৯শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে বা কিছু পূর্বে রোমাণ্টিক-ক্লাসিক কলহ খানিকটা প্রশমিত হল এবং সমালোচনার আরও নানা তত্ত্বদর্শন, মতবাদ ও বিষয়বৈচিত্র্য দেখা দিল। Ernest Renan (1823-92) অতীন্দ্রিয়বাদ ও ধর্মীয় চৈতন্যের শীর্ষচূড়া থেকে সাহিত্যবিচার আরম্ভ করলেন; তাঁর *De la poésie des races celliques* (1854) গ্রন্থে সাহিত্যবিচারে ধর্মচেতনা ও রহস্যবাদের পন্থাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এঁর সমসাময়িক Taine (1828-93) সেণ্ট্‌বোভের মতো গভীর অনুভূতির পরিচয় দিতে না পারলেও সাহিত্যবিচারে বস্তুগত পূর্বহেতু এবং ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সমালোচনার নতুন পথ নির্মাণ করলেন। তিনি ফরাসী ভাষায় ইংরেজী সাহিত্যের যে বিরাট ইতিহাস রচনা করেছিলেন (*Histoire de la literature anglaise* (1864-69), তাতে তিনি ইংরেজ জাতির মানস-মানচিত্রের জন্য বাহ্যমানচিত্র (race, milieu, moment) ও ঐতিহাসিক কালক্রমের ওপর অধিকতর নির্ভর করেছিলেন। তাঁর *Philosophie de l' art* (1882) গ্রন্থেও সাহিত্য ও শিল্পবিচারে বাহ্য পূর্বহেতুকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। Taine-এর পথ ধরে চলেছিলেন P. Bourget

(1852-1935) ; তিনি উপন্যাসও লিখেছিলেন, বলা বাহুল্য তাতে Taine-এর মতই অনুসৃত হয়েছে। তাঁর *Essais de psychologie contemporaine* (1883) গ্রন্থে সাহিত্যবিচারে সমাজচেতনাকে প্রধান মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষতঃ শেষের দিকে ফরাসী সমালোচনাও নানা প্রকার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক এমিল জোলা (১৮৪০ ১৯০৩) সাহিত্যে Determinism-এর প্রভাবদর্শনে উৎসুক হয়েছিলেন। এই দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক মতের অর্থ হল, মানুষের নিয়তি ও এষণা যুক্তিহীন অনুভূতি, প্রবৃত্তির তাড়না এবং অচেতন-অবচেতন চিৎসত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জোলা, ড্রেসার ও লরেন্সের সাহিত্যে এই মতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে। জোলা ১৮৮০ সালে এই মতের ব্যাখ্যা করে *Le Roman experimental* নামক গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর মতো F. Brunetiere (1849-1906) ১৯শ শতাব্দীর শেষে বিজ্ঞান ও শিল্পের মিল ঘটিয়ে সাহিত্যবিচারে নতুন করে ডারউইন-তত্ত্ব প্রচার করেন তাঁর বিখ্যাত সমালোচনা-গ্রন্থে—*L' Evolution de la poesie lyrique en France* (1894)। অবশ্য তিনি পরে রোমের শিল্পকলা ও দর্শনে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পারলেন। এই সময়ে Anatola France (1844-1924) সাহিত্যক্ষেত্রে নতুনের মন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তাঁর মতে, যে-সমালোচনায় সমালোচকের ব্যক্তিসত্তার প্রভাব অধিকতর পরিদৃশ্যমান, তাই শ্রেষ্ঠ সমালোচনার প্রশংসা দাবি করতে পারে। তাঁর *La Vic literaire* (1887-93) গ্রন্থে তিনি সমালোচনায় ব্যক্তিগত রসরুচিকে অধিকতর মূল্য দিলেও তাঁর সাহিত্য ও সমালোচনার অন্তরাল দিয়ে মানবিকতা ও ক্লাসিকতার ধারা বহমান।

এই শতাব্দীর শেষের দিকে সমালোচনায় ব্যক্তিগত রুচি ও সৌন্দর্যবোধ বেশ প্রাধান্য অর্জন করেছিল। Remy de

Gourmont (1858-1915) বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যবিচার শুরু করেন এই শতাব্দীর শেষার্ধে। তিনি প্রায় পঁচিশ বছর ধরে প্রসিদ্ধ সাহিত্যপত্র *Mercure de France* যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর মধ্যে সত্যকার রুচিবান, উদারমতাবলম্বী, স্নিগ্ধ-প্রসন্ন ও উজ্জ্বল ফরাসী মননের সার্থক পরিচয় পাওয়া যাবে। সাহিত্যবিচারের পূর্বতন ধারা অর্থাৎ রোমান্টিক ও ক্লাসিকের দ্বন্দ্ব, সৌন্দর্যবোধ ও মিস্টিক চেতনা, বাস্তব ও অতিবাস্তব, দার্শনিকতা ও বৈজ্ঞানিকতা প্রভৃতি সংক্রান্ত নানা মতবাদ ফরাসীদেশের ১৯শ শতাব্দীর সাহিত্যসমালোচনাকে অব্যবস্থিত ও চঞ্চল করে তুলেছিল।

আধুনিক কালে অর্থাৎ বিশ শতকেও ফরাসী সমালোচনা দ্বন্দ্বাতীত স্থৈর্য লাভ করতে পারে নি; অনেক দিন ধরে বিগত শতাব্দীর জের চলেছে, রোমান্টিক-ক্লাসিক দ্বন্দ্ব, ঐতিহাসিক সমালোচনা, তুলনামূলক সাহিত্যবিচার, নানা রকম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বুদ্ধিবাদ বিশ শতকের ফরাসী সাহিত্য ও সমালোচনাকে আচ্ছন্ন করেছে। বিশ শতকের গোড়ার দিকেও Taine, Saint Beuve, Brunetière প্রভৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। একদল সমালোচক তুলনামূলক সমালোচনাকেই একমাত্র পদ্ধতি বলে প্রমাণ করতে চাইলেন। *Reuve de litterature Comparée* পত্রিকার কর্ণধার Fernand Baldensperger এবং Paul Hazard ইংরেজী ও জার্মান সাহিত্যকে ফরাসী সমালোচনায় অতিশয় প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং Paul Van Tieghem স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সাহিত্য নিয়েও গবেষণা করেছেন। এইভাবে ফরাসী সাহিত্য ও সমালোচনা য়ুরোপ মহাদেশের বৃহৎ জীবনস্পন্দনকে সাগ্রহ স্বীকৃতি দিয়েছে। কেউ কেউ ইতিহাস, সমাজচেতনা, পরিবেশ প্রভৃতিকে উনিশ

শতকের মতো প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্যবিচারের পুরাতন পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন এবং অল্পদিনের মধ্যে আবার রোমাণ্টিক ও ক্লাসিকের মধ্যে মতান্তর দেখা দিল। ১৯২৭ সালে রোমাণ্টিক-পন্থীরা রোমান্সের শতবার্ষিক উৎসবের আয়োজন করলে এই মতভেদ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করল। Pierre Lasserre এবং Louis Reynaud—এই দুজনে মিলে রোমান্টিক সমালোচনার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তার প্রতিবাদে Abbe´ Henri Bremond আবার সগর্বে রোমাণ্টিকতাকে সমর্থন করলেন।

এই সময়ে আরও একটি সাহিত্যান্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, যা মূলতঃ কাব্যাশ্রয়ী। এই আন্দোলন কাব্যে বিশুদ্ধিবাদ (*Poesie pure*) নামে পরিচিত। Paul Vale´ry, Henry Bremond প্রভৃতি কবি ও সমালোচক কাব্য থেকে নীতি, সমাজ, বাগ্মিতার উচ্চ সুর প্রভৃতি বাদ দিয়ে সাঙ্কেতিকতার সাহায্যে বিশুদ্ধ কাব্যতত্ত্ব প্রচার আরম্ভ করলেন। এই একই সময়ে সাহিত্য ও সমালোচনা নিয়ে আরও নানা রকমের বাদপ্রতিবাদ উঠেছিল। Dadaism,[১] Populism, Unanimism প্রভৃতির উৎপত্তি হল। ডাডাবাদ বিশ শতকের ফরাসী সমালোচকের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে পড়ল; সাধারণ বাস্তব থেকে পরাবাস্তবে ধাবিত হওয়া এই মতের প্রধান লক্ষ্য। পরাবাস্তবের বস্তুগ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়ময় স্বরূপ নেই; ফলে সাহিত্যজগতে এই মত যে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে, তাতে আর সন্দেহ কি? Populism (গণবাদ) মূলতঃ রুশিয়ার একপ্রকার রাজনৈতিক দর্শন; ১৮৬০ সালের দিকে রুশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই মতের উদ্ভব হয়েছিল। এর মূলকথা—জনসাধারণ ও জনকল্যাণ। বিশ শতকে এই মত ফরাসী শিল্প ও সাহিত্যবিচারে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রকৃতিবাদ (Naturalism) থেকে গীতিকাব্যোচিত ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিয়ে এই মত ১৯৩০ সালের দিকে ফরাসী সমালোচনায় প্রাধান্য লাভ করে। Unanimism

---

১ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। পৃ. ৪১

বা বিশ্বৈক্যবাদ সমকালীন সাহিত্যবিচারপদ্ধতিরূপে বিশেষ আদৃত হয়েছে। এই মতের অর্থ—অসাধারণ প্রচণ্ড গতিশীলতার দ্বারা ব্যষ্টির সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বৈক্যতত্ত্ব প্রচার। Duhamel-এর লেখায় প্রচ্ছন্নভাবে এই মতবাদ বর্তমান ছিল, যাকে Jules Romains আরও পরিচ্ছন্নাকারে ব্যাখ্যা করেছেন। এঁরা ব্যক্তির স্থলে সমাজগত গোষ্ঠীচেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার স্বরূপ সাহিত্যে উদ্‌ঘাটিত করতে অভিলাষী। এই যুগটাতে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রকট আকারে ধরা পড়েছে। নানা উদ্ভট মতবাদ ও অভিনব তত্ত্বদর্শন যেমন ফরাসী সাহিত্য ও সমালোচনাকে নিত্য নতুন ইঙ্গিতে বিচঞ্চল করে তুলছে, তেমনি আবার এর প্রতিক্রিয়ার ফলে একদল সমালোচক ভোল্‌তেয়রের মধ্যবিত্ত-নির্ভর ঐতিহ্যে বিশ্বাসী হয়েছেন। এঁদের নেতা Paul Sonday *Le Temps* নামক গ্রন্থে এই মত ব্যাখ্যা করেছেন। আবার আর একদল বিশুদ্ধ গবেষণাকে সমালোচনার একমাত্র মানদণ্ড বলে গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর। Rene´ Doumic এই ধরনের গবেষণাকেন্দ্রিক সমালোচনার নেতৃপদ লাভ করেছেন; কিন্তু Remy de Gourmont পাণ্ডিত্যের আস্ফালনপূর্ণ গবেষণাকে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন নি।

এই আশঙ্কা ও অশান্তির যুগে হেনরি বার্গসঁয়ের দার্শনিক চিন্তা বিশেষভাবে ফরাসী সমালোচনার ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর দর্শন জড়বাদবিরোধী, স্বজ্ঞাপন্থী (intuitive), অবচেতন সত্তা থেকে জাত গতিবাদের অভিনব স্বরূপে আস্থাশীল। ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা তাঁর নতুন মত ও পথের জন্য তাঁকে মুক্তিদাতা বলে শ্রদ্ধা করেন। সাহিত্যবিচারে তাঁর দার্শনিক চিন্তা গ্রহণ করেছেন Marcel Proust, Charles Pe´guy প্রভৃতি চিন্তা-নায়কগণ। আঁদ্রে জিদ্-ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে ফরাসী সাহিত্যসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

বিশ শতকের ফরাসী সমালোচনায় এই রকম বিভিন্ন ও বি-ষম মতবাদ দেখা গেলেও কোন কোন সমালোচক সাহিত্যে সত্যযুগের কল্পনা করে 'আশাবায়ুতে' মুগ্ধ হয়েছেন। Charles Pe´guy 'Harmonious City'-র কল্পস্বর্গ রচনা করেছেন; প্রসিদ্ধ প্রাবন্ধিক Andre´ Rouseaux-ও সাহিত্যক্ষেত্রে 'Lost Paradise'-এর অবতরণ দেখতে চান।

সম্প্রতি ফরাসী সমালোচনায় একক প্রতিভার দিন চলে গেছে, ক্রোচে-বার্গসঁয়ের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন নানা মতের নানা কোলাহল ফরাসী সমালোচনার প্রাঙ্গণ মুখরিত করে তুলেছে। কেউ সর্ব সংস্কার বিসর্জন দিয়ে সাহিত্যবিচারে সচেষ্ট (Marcel Thiebaut), কেউ বিদেশী সাহিত্যের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে সমালোচনায় প্রাদেশিক সীমালঙ্ঘনের প্রয়াসী (Edmond Jaloun, Benjamin Cre´micun প্রভৃতি), কেউ এমন একটা নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা আবিষ্কার করতে চাইছেন যাতে আধুনিক মানুষের চিত্তলোকের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি লাভ করবে (Jean Richard Bloch)। কেউবা নীৎশে, এমারসন, হুইটম্যানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমালোচনার স্বপ্ন দেখছেন (Elie France)।

গত চল্লিশ বছরের (১৯০০-৪০) ফরাসী সমালোচনার পরিচয় নিলে বিশেষ কোন প্রতিভাবান সমালোচকের সন্ধান পাওয়া যাবে না; বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঘাতে ফরাসী জাতির জীবন, সাধনা ও নীতিবোধ যে-ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তাতে এখন কোন সৃষ্টিশীল সাহিত্যসমালোচনা আশা করাই যায় না। সাহিত্যক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অরাজকতা ও নৈরাজ্যবাদ প্রভাব বিস্তার করেছে, তাকে Marcel Arland বলেছেন, "A complete anarchy." সমালোচনার এই বিভ্রান্তিকে দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করে Jacques Rivie´ra বলেছেন, "A crisis of the concept of literature." আজ ফরাসী সমালোচক 'সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য'—

এ কথা ভুলে গিয়ে নানারকম সমাজনীতি, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও রাজনীতির আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছেন। কাজেই সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর স্পষ্ট সীমারেখা অবলুপ্ত হতে চলেছে, নির্মিতি বা techniqueকে ছেঁড়া কাগজের মতো ফেলে দেওয়া হচ্ছে। নব্য হিউম্যানিজম্ ও বিশ্ববাদের ছাঁকনি দিয়ে সাহিত্যকে ছেঁকে তুলবার চেষ্টা হচ্ছে—ফলে অধুনা ফরাসী সমালোচনা ও সমালোচক অস্থির ও অব্যবস্থিতচিত্ত। নতুন সৃষ্টির দিগন্ত আলোকিত হবার পূর্বাভাস এখনও গাঢ়তমিস্রার মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে আছে।

জার্মান সমালোচনা

য়ুরোপের অন্যান্য দেশের সমালোচনা যেমন উনিশ-বিশ শতকে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মূল্যমানের ঘন ঘন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, জার্মান সমালোচনার মধ্যেও অনুরূপ লক্ষণ দেখা যাবে। রোমান্টিকতা, ক্লাসিকতা, বৈজ্ঞানিকতা, সমাজতন্ত্রবাদ, Activism, Expressionism, Nazism প্রভৃতি নানাবিধ তত্ত্ব ও আদর্শের ধাক্কায় জার্মান সমালোচনা যে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে আন্দোলিত হবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্মান সমালোচনায় পাণ্ডিত্য, মতবাদ, দার্শনিকতা, খুঁটিনাটি তথ্যসমারোহ এত প্রাধান্য পেল যে, রোমান্টিকতা ও সৌন্দর্যবোধ সমালোচনাসাহিত্যে কিছু স্তিমিত হয়ে পড়ল। জার্মান-দর্শনের অত্যধিক প্রভাবের ফলে এই সমালোচনা বুদ্ধিগ্রাহ্য ও তত্ত্বকেন্দ্রিক আবহাওয়াকে পুরোপুরি স্বীকার করে নিল। ফলে এই রকম মুষ্টিমেয় পাণ্ডিত্যের তর্ককণ্টকিত সমালোচনা জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। জীবন থেকে বিচ্যুত পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্যচিন্তা কিন্তু দীর্ঘজীবী হতে পারল না। উদারনৈতিক মত ও হেগেলীয় দর্শনের প্রভাবের ফলে জীবনবিমুখ ও তত্ত্বগভীর জার্মান সমালোচনার

কিছু পরেই আবার রোমাণ্টিক আবহাওয়া ফিরে এল, এবং অচিরে রোমাণ্টিক ও অ-রোমাণ্টিক সমালোচনার মধ্যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে গৃহবিবাদ শুরু হয়ে গেল। যাঁরা সমালোচনা ও সাহিত্য-বিচারে উপযোগবাদী (Utilitarian), তাঁরা বললেন, সমালোচনার কাজ আদর্শ প্রচার; শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের যন্ত্র হচ্ছে সমালোচনা। সাংবাদিকতা সমালোচনাকে গ্রাস করল, নীতিবাদ ও সমাজবাদ সমালোচনার সৌন্দর্য-বস্ত্রহরণে সচেষ্ট হল। রীতি-প্রকরণের (form) চেয়ে বিষয়টাই (content) প্রাধান্য পেল। অবশ্য এই রকম একদেশদর্শী সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠতেও বিলম্ব হল না। Ludolf Wienbarg তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Aesthetisch Feldzuge* (1834)-এ সৌন্দর্যবাদ ও সাহিত্য সম্পর্কে নতুন কথা বললেন এবং এই একই সময়ে Georg Gervinus (1805-71) প্রথাবদ্ধ গবেষণাপূর্ণ পাণ্ডিত্যকে সমালোচনার একমাত্র মাপকাঠি বলে প্রচার করতে লাগলেন।

নতুন বাস্তবপন্থী কাব্যধারার উৎপত্তিও এই শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যের সবচেয়ে বড় ঘটনা! এই দল বাস্তবপন্থা বলতে একটা মধ্যপন্থার নির্দেশ করলেন, যার অর্থ—কাব্য কবির স্বপ্নলোকের কাহিনী নয়, কিংবা রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রচারের দলগত মুখপত্রও নয়। ১৯শ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া, যন্ত্রদর্শন ও মনোদর্শনের বিপ্লবী তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন প্রভৃতি আধুনিক ব্যাপার জার্মান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করল এবং তার ঢেউ এসে জার্মান সমালোচনার তটেও আঘাত করল। এক দিকে সাহিত্যের শিল্পসৌন্দর্য, আর এক দিকে নবাবিষ্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞান—সাহিত্যে এর তুল্যমূল্য প্রভাব ও স্থান নির্দেশ সম্পর্কে সমালোচক রূপে অবতীর্ণ হলেন Julien Schmidt, Vischer, Hermann Hetter প্রভৃতি। এই যুগের বিখ্যাত সমালোচক Hebbel ট্র্যাজেডি সম্পর্কে নতুন কথা বলে জার্মান সমালোচনায় মুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করলেন।

ইতিপূর্বে যাঁরা সাহিত্যে বাস্তববাদের কথা বলেছিলেন, তাঁদের বাস্তবচেতনা শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিবাদে (Naturalism) পরিণত হল; ১৯শ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত জার্মান সমালোচনায় প্রকৃতিবাদী সমালোচকদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এঁরা সাহিত্য, জীবন ও সমাজের সম্পর্ক আবিষ্কার করাকেই সমালোচকের একমাত্র কর্তব্য স্থির করলেন। তাঁদের মত—সাহিত্যিক নিঃস্পৃহ নিরাসক্ত ভাবে সমাজজীবনের ছবি আঁকবেন। জোলা, ইবসেন, টেইন প্রভৃতির প্রভাবে প্রকৃতিবাদী সমালোচকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল। এঁরা বললেন, সাহিত্য বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক পূর্বহেতুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে; সুতরাং সাহিত্যবিচারে বংশক্রম, পরিবেশ, কার্যকারণতত্ত্ব প্রভৃতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এঁদের মতে রচনারীতির চেয়ে রচিত বস্তুই অধিকতর মূল্যবান। Conrad, Conrad Alberti প্রভৃতি প্রকৃতিবাদী সমালোচক প্রধানতঃ জোলার সাহিত্যসৃষ্টির দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হলেন। এঁরা দুখানি পত্রিকার (*Die Gesellschaft* এবং *Die freie Buhne*) সাহায্যে নিজ নিজ দলগত মতপ্রচারে ব্রতী হলেন। এই যে বুদ্ধিবাদী পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা ও প্রকৃতিবাদী সাহিত্যবিচারপদ্ধতি—এর বিরুদ্ধে রোমান্টিক ও সৌন্দর্যবাদীদের পুনরুত্থান ১৯শ-২০শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সমালোচনার একটা সাধারণ লক্ষণ বলে গৃহীত হতে পারে। ইতালি, ফরাসী, জার্মানি—এমন কি রুশিয়াতেও সাহিত্য-সমালোচনা এই একই প্রকার দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। জার্মানিতে ১৯০০-১৯১০ সাল,—মোট দশ বছরের মধ্যে সাহিত্যসমালোচনায় রোমান্টিকপন্থীরা প্রাধান্য লাভ করলেন—এঁদের নব্য রোমান্টিকপন্থী (Neo-Romanticists) বলা হলেও এঁরা পুরাতন রোমান্টিক আদর্শকেই নতুন ছাঁচে ঢেলে নতুন করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তা, বর্তমান যুগ থেকে অতীতের 'বীর যুগে' ('heroic

age') প্রত্যাবর্তন, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যাভিসার—এগুলি হল রোমাণ্টিক সমালোচকের অবলম্বিত বিচারপদ্ধতি। ১৯১০-১৯২৫ সাল, মোট পনেরো বছরের মধ্যে রোমাণ্টিকপন্থিগণ সমালোচনায় অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করলেন। এঁরা বললেন, সাহিত্যের অর্থ—বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শিল্পচেতনার সমন্বয়; দার্শনিক ও সৌন্দর্যবিষয়ক আলোচনাই হবে সমালোচনার গজকাঠি, স্টাইল সেই বিচারে প্রাধান্য পাবে; সাহিত্যিকের জীবনের মধ্যেই সাহিত্যের যথার্থ রস সন্ধান করতে হবে। এঁদের রীতিকেই কেউ কেউ সমালোচনায় Expressionism নাম দিয়েছেন।

অবশ্য ১৯০০-২৫ সাল, মোট পঁচিশ বছরের মধ্যে রোমাণ্টিক রীতি প্রাধান্য লাভ করলেও ক্লাসিকতার ধারাও একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি। ক্লাসিকপন্থিগণ নব্য-ক্লাসিক (Neo-Classic) নাম নিয়ে নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে সাহিত্যবিচারের চেষ্টা করেছিলেন। Paul Ernest, Wilhelm Von Scholz প্রভৃতি সমালোচকগণ নব্য-ক্লাসিকতার আদর্শ অবলম্বন করে, শুধু সাহিত্যের বিষয়বস্তু নয়—তার রচনাভঙ্গিমা, সমাজপরিবেশ প্রভৃতিকেও আলোচনার আওতায় আনলেন। এঁদের নব্য ক্লাসিকতা থেকে Activism মতবাদের উৎপত্তি হয়। Activist সমালোচকদের বক্তব্য—সামাজিক সংস্কারের দ্বারা সমাজ ও গোষ্ঠী-জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলা যায় এবং সাহিত্যের দ্বারা তা সম্ভব।

১৯শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক পর্যন্ত সাহিত্যসমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে নানা দলাদলি ও মতামতের ঝড়তুফান চলছিল। কিন্তু ১৯৩৩ সালের পর যখন *Nazional socialistisch Deutsche Arbeitesparter* (অর্থাৎ নাজিদল) দলের অধিনায়ক অ্যাডল্ফ হিটলার জার্মানির ভাগ্যবিধাতা হলেন তখন তাঁর নির্দেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতি 'জার্মান-শ্রেষ্ঠত্ব' নামক ভৌতিক তত্ত্বের ওপর নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হবার

দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল। সাহিত্য ও সমালোচনা নাজিপ্রচারের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে পড়ল; পুরাতন সমালোচনারীতি ও পরিভাষা ত্যাগ করে নাজি আদর্শের অনুকূলে সাহিত্যসমালোচনার নতুন পরিভাষা সৃষ্টি হল। পুরাতন জার্মান সাহিত্যের যেখানে যেটুকু নাজিমত কাজে লাগানো যায়, শুধু সেইটুকুই স্বীকৃত হল, অবশিষ্ট সমস্ত কিছু নির্মমভাবে উপেক্ষিত হল। Adolf Bartels, Wilhelm Stapel, Will Vesper প্রভৃতি নাজিপন্থী সমালোচকগণ সাহিত্য ও সমালোচনাকে পুরোপুরি হিটলারের National Socialism প্রচারে নিয়োগ করলেন। Heinz Kindermann, Helmuth Laugenbucher—প্রভৃতি তাত্ত্বিক ও গবেষকগণ নতুন আদর্শকে দার্শনিক ও শিল্পসম্মত রূপ দেবার চেষ্টা করলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ছিন্নমস্তা *Deutschland*-এর সাহিত্য ও সমালোচনার দুর্দশা সহজেই অনুমেয়। এখন রাজনৈতিক কারণে পশ্চিম জার্মানিতে ইংরেজী ও আমেরিকার সাহিত্যের ছড়াছড়ি; অপরদিকে পূর্ব জার্মানিতে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রচার সর্বাধিক। অবশ্য এই উৎকট অশান্তির মধ্যেও প্রটেস্টাণ্টপন্থী Rudolf Alexander Schroder এবং ক্যাথলিকপন্থী Gertrud Von Le Fort, Hans Von Savigny প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নিজ নিজ দলীয় মত অবলম্বনে সাহিত্য রচনা ও বিচার করছেন। দ্বিধাভিন্ন জার্মানির সাহিত্য ও সমালোচনায় ১৯শ শতাব্দীর মতো প্রাধান্য অর্জন করতে কত সময় লাগবে, কে জানে?

ইংরেজী সমালোচনা

১৯শ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে দেখা যাবে নব্যক্লাসিকতার শুষ্ক নীতিনিয়মের বাঁধনকে অস্বীকার করে নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের নেশায় ইংরেজ সমালোচক উল্লসিত হয়ে পড়েছিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোল্‌রীজের যুগ্ম প্রবর্তনায় প্রকাশিত *Lyrical*

Ballads (1798) কাব্যগুচ্ছের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮০০) যে ভূমিকা সংযোজিত হল, তাতে শুধু কাব্যরচনার ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যবিচারেও অভিনব পথের সন্ধান মিলল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বললেন, ইংরেজী কাব্য কৃত্রিম বাঁধনে গতপ্রাণ হতে বসেছে। "All good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings"—তাঁর এই কথাটি নতুন সুরে বেজে উঠল। অতি সাধারণ সামান্য মানুষের প্রাণের কথাটিকে যদি কবি দৈববাণীর মতো মহৎ ও সুন্দর করে তুলতে না পারলেন, তা হলে নব্য ক্লাসিকতার অষ্টপাশের দ্বারা সাহিত্যের কোন উপকার হবে না। *Biographia Litcraria* (1817)-তে কোল্‌রীজ কল্পনাশক্তির মহাকাশসঞ্চারী বিপুল ব্যাপ্তিকে জয়মাল্য দিয়ে অনুভূতির সর্বব্যাপিত্ব ("An excited state of the feelings and faculties") স্বীকার করে নিলেন। শেলী *Defence of Poetry* (1821)-তে কবিতার সংজ্ঞা দিলেন, "Poetry in a general sense, may be defined to be 'the expression of the imagination'." কবি উইলিয়ম ব্লেক-ও ক্লাসিকতার বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষে বললেন, "It is the classics, and not Goths nor monks that Desolate Europe with Wars". ক্লাসিক সম্পর্কে কবি ও মরমী ব্লেকের মন্তব্য কিছু উগ্র হলেও তিনি ক্লাসিকতার শিকল থেকে কবিতাকে মুক্ত করতে অভিপ্রয়াসী হলেন। তিনিও নীতিনিয়ম ছেড়ে বোধিদৃষ্টি, অনুভূতি ও মরমিয়া মতকেই প্রাধান্য দিলেন। কাজেই ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাহিত্য ও সমালোচনায় বন্ধন-অসহিষ্ণু প্রাণের আবেগ ও অবাধকল্পনার মহাকাশবিচরণ নব্যক্লাসিকতার নিষ্প্রাণ মর্মর পাথরে ফাটল ধরিয়ে দিল।

ইংলণ্ডে দ্বিতীয় রিফর্ম বিল (১৮৬৭) পাস হয়ে গেলে যেমন সমাজজীবনে পরিবর্তন দেখা দিল, সেই রকম সাহিত্য ও সমালোচনাতেও নতুন ভাবাদর্শের পদসঞ্চার প্রতিধ্বনিত হল।

ইতিপূর্বে সমাজে অভিজাতসম্প্রদায় প্রাধান্য পেয়ে আসছিলেন ; কিন্তু দ্বিতীয় রিফর্ম বিল পাস হবার পর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করলেন। অপরদিকে তখন এদেশে যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতি শুরু হয়ে গেছে, যার ফলে দীর্ঘকালপোষিত ইংরেজী সংস্কার ও সমাজব্যবস্থায় চাঞ্চল্য দেখা দিল। ভিক্টোরীয় যুগের (১৮৩২-৬৭) সমালোচকগণ পূর্বতন রোমান্টিকতার সঙ্গে এই আশঙ্কা ও বেসুরো আদর্শকে সমালোচনায় মেলাতে চাইলেন। কিন্তু যখন এই সামাজিক সঙ্কট ও আশঙ্কার যুগে যে-কোন প্রকারে সুরবৈষম্যকে দূরীভূত করার চেষ্টা করা হচ্ছিল, তখন ম্যাথু আর্নল্ডের *Culture and Anarchy* (1867)-তে আপোসবিরোধী ঋজু আদর্শ সোচ্চারে প্রচারিত হল।

ভিক্টোরীয় যুগে সমালোচনা মূলতঃ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল : (১) যুক্তিপন্থী জন স্টুয়ার্ট মিল-সমর্থিত নৈতিক যুক্তিবাদ (Ethical Rationalism) এবং (২) ওয়াল্টার পেটার অবলম্বিত কৈবল্য শিল্পবাদ (Art for Art's sake)। এই কৈবল্য শিল্পবাদ প্রথমে রাসকিনের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল। এই সময়ে কবি ও সাহিত্যিকেরাও সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করছিলেন ; তার প্রমাণ মিলল বায়রনের *English Bards and Scotch Reviewers* (1809), শেলীর *Defence of Poetry* (1821) এবং মেকলের সাহিত্যবিষয়ক বিবিধ রচনায়। এই সময় মুদ্রাযন্ত্রের প্রাচুর্যের জন্য সুলভ মূল্যের সাহিত্যপত্রিকার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ঐ পত্রিকায় পুস্তক-পরিচয়ের আকারে প্রকাশিত সমালোচনা মধ্যশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। আর্নল্ডের পূর্বে এবং পরে ইংরেজী সমালোচনায় জাতীয় মনোভাবের উগ্রতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল ; রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের প্রাধান্যের ফলে সমালোচকেরা শুধু মুষ্টিমেয় রসিকগোষ্ঠীর দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি না হয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হলেন। এর ফলে

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই সমালোচনা একদিকে যেমন পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ও গবেষণাধর্মী হল, তেমনি অপরদিকে সাধারণের বোধ-গম্যতার জন্য সাহিত্যবিচারে হালকা চালের সুরও সংযোজিত হল। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতীয় মনোভাবের সঙ্গে নানারকম গোষ্ঠীগত মনোভাবও সমালোচনার নিয়ন্ত্রীশক্তি হয়ে দাঁড়াল—যাকে আর্নল্ড ক্ষোভের সঙ্গে আক্রমণ করে বলেছেন, "Our organs of criticism are organs of men and parties having practical ends to serve...." তাঁর এই তীব্র মন্তব্যের পর ১৮৬৫ সালে বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকা *Fortnightly Review* প্রকাশিত হয় এবং এই পত্রে আর্নল্ডের মতবাদসমূহ প্রচারিত হয়। আর্নল্ড সাহিত্যসমালোচনায় রোমান্টিকতাকে বিশেষ আমল না দিলেও ল্যাম্ব, লে হাণ্ট, হ্যাজলিট, ডিকোয়েন্সি প্রভৃতি রসশিল্পীরা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে পুরাতন এলিজাবেথীয় যুগের মধ্যে নতুন রূপ ও রস আবিষ্কার করলেন।

১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোল্‌রীজের সমালোচনার মধ্যে রসবোধ, তত্ত্বদৃষ্টি ও বিচারবিশ্লেষণের যে মৌলিক রূপ ফুটে উঠেছিল তার তুলনা ইংরেজী সমালোচনায় প্রায় দুর্লভ বললেই চলে। আর্নল্ড তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছিলেন, "His action will still be felt as long as the need for it continues." কোল্‌রীজের পাণ্ডিত্য, ইংরেজের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে অভ্রান্ত জ্ঞান, জার্মান দর্শনে পারঙ্গমত্ব, চেতন-অচেতন মনোজগৎ সম্পর্কে অপার কৌতূহল তাঁকে ড্রাইডেনের সমপর্যায়ে, কখনও-বা তাঁরও চেয়ে উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর *Biographia Literaria* (1817) শুধু তাঁর ব্যক্তিজীবনী নয়, এতে জার্মান দর্শনের পটভূমিকায় শিল্প ও সাহিত্যকে যে-ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা একমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব। কাণ্ট ও শেলিং-এর ভক্ত, শারীরিক অসুস্থ কোল্‌রীজ প্রথাবদ্ধ 'অ্যাকাডেমিক' পথে বেশি দূর যেতে পারেন নি, তবু তিনি গত

শতাব্দীতে যা বলে গেছেন, এই শতাব্দীর অনেক সমালোচকের মনে তা নতুন চিন্তা উদ্রেক করছে। তিনি মানুষের মন ও সৃষ্টি সম্বন্ধে বলেছেন, "All opposition is a tendency to re-union."—সমস্ত বিরোধকে মিলিয়ে দিয়ে সাহিত্য মানবসত্তাকে নিয়ে চলেছে পরম ঐক্যের দিকে—এ কথা তো আজকের আশাবাদী সমালোচকের মনের কথা।

আমরা দেখেছি, ভিক্টোরীয় যুগে রাষ্ট্র ও সমাজ-চেতনা সাহিত্য-সমালোচনায় ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছিল। দৈনন্দিন প্রয়োজন সাহিত্য- সৃষ্টি ও -বিচারে মুখ্য স্থান নেবার অভিপ্রয়াসী হয়েছিল। এই সময়ে একদল নীতিবাগীশ সমালোচক 'Beauty' ত্যাগ করে 'Duty'-র দিকে বেশি আকৃষ্ট হলেন, এবং সেই 'Duty' খ্রীষ্টান নীতিতত্ত্বের দ্বারা বিধৃত। রোমান্টিকতা নিন্দিত হল; শেলীর নাস্তিকতা, ডি কোয়েন্সির অহিফেনপ্রীতি, কীট্‌সের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র সৌন্দর্যাসক্তি প্রভৃতিকে এঁরা সহ্য করতে পারলেন না। ফলে সাহিত্যবিচার সাময়িক পত্রের অনাদৃত কোণে অবহেলায় পড়ে রইল। মেকলে, কার্লাইল, মিল এবং রাসকিন—এই চারজন সমালোচক এই সময়ে সাহিত্যকে সৌন্দর্যের বাতায়ন থেকে না দেখে নানাবিধ প্রসঙ্গ ও তত্ত্বের মাপকাঠির সাহায্যে শিল্প ও সাহিত্যেকে তৌল করতে আরম্ভ করলেন। মেকলের সঙ্কীর্ণ ইংরেজী দাম্ভিকতা, কার্লাইলের মিস্টিক অতীন্দ্রিয়প্রীতি, মিলের সমাজপরিবেশে আসক্তি এবং রাসকিনের খ্রীষ্টান নীতির আদর্শ সাহিত্যবিচারে মানদণ্ড বলে স্বীকৃত হল। এই সময়ে, ১৮৬৫ সালে আর্নল্ডের *Essays in Criticism* (First Series) প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'Function of Criticism at the Present Time' প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যসমালোচনার সঙ্কট এবং তা থেকে উদ্ধার পাবার পন্থা ঘোষণা করলেন। 'হেব্রায়িক' ও 'হেলেনিক' সংস্কৃতির পরিমিত সমন্বয়ের উপরেই ইংরাজী সমালোচনার জীবন নির্ভর করছে—এ কথাটাই তিনি

দৃঢ়স্বরে প্রচার করলেন। তাঁর মতে সাহিত্যে 'Beauty' ও 'Duty'-র মিলন চাই। তাঁর উক্ত সমালোচনাগ্রন্থ প্রকাশের এক বৎসর পরে সুইনবার্নের *Poems and Ballads* (1866) প্রকাশিত হলে ইংরেজ সমালোচকের দল দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। সুইনবার্নের এই কাব্যগুচ্ছে খ্রীষ্টানবিরোধী পেগান সৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়াসক্তি শ্রদ্ধা পেয়েছে বলে একদল সমালোচক অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা মনে করলেন, বিশুদ্ধ পেগান সৌন্দর্য যদি ইংরেজী কাব্যের নিয়ন্ত্রী শক্তি হয়, তাহলে ইংরেজের জাতীয় আদর্শ ও ইংরেজী সাহিত্যের মহান ঐতিহ্য অচিরে লোপ পাবে। এর বিরোধী দল (যাঁরা 'Hedonist' বা ঐহিক সুখবাদী বলে পরিচিত) প্রেম, সৌন্দর্য ও সুখকেই সাহিত্যের অবলম্বন বলে প্রচার প্রচার করলেন। এঁদের মধ্যে কবিশিল্পী ফিট্জ্ জেরাল্ড, রসেটি, মরিস, সুইনবার্ন, অস্কার ওয়াইল্ড্ এবং সমালোচকদের মধ্যে ওয়াল্টার পেটার ও সাইমণ্ডসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত কবিশিল্পীরা রসসাহিত্যে এবং পেটার তাঁর *Studies in the History of the Renaissance* (1872), *Plato and Platonism* (1893) *Appreciation* (1889) এবং সাইমণ্ডস্ *The Renaissance in Italy* (1875-86) নামক গ্রন্থে সৌন্দর্যবোধ ও গ্রীক শিল্পাদর্শের উদারতা গ্রহণ করেছিলেন। যুক্তিপন্থী সমালোচকেরা—যাঁরা সৌন্দর্যাত্মক সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি ততটা খুশী ছিলেন না, তাঁরাও ধীরে ধীরে সাহিত্যবিচারে যুক্তিনির্ভরতা ত্যাগ করতে লাগলেন। মর্লে এককালে সুইনবার্নের সৌন্দর্যপ্রীতিনিষিক্ত গ্রীক ইন্দ্রিয়ময়তার ঘোর বিরোধী ছিলেন ; কিন্তু তিনিও সুইনবার্নের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ম্যাথু আর্নল্ড কথিত "Free play of ideas"—মনন ও চিন্তার উদার ব্যাপ্তি ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধকে নানা ঐশ্বর্যে ভরিয়ে তুলল। একদিকে গভীর' পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা, আর একদিকে শিল্প ও সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ১৯শ শতাব্দীর শেষে ইংরেজী সমা-

লোচনাকে য়ুরোপে মহত্তম গৌরব এনে দিল। গ্রীক আদর্শ ও ইংরেজী জাতীয় আদর্শের সার্থক সমন্বয় আরম্ভ হল। শিল্পীরা খ্রীষ্টানী বাতায়ন ছেড়ে গ্রীক সৌন্দর্য ও উনিশশতকী মানবতার উদার প্রাঙ্গণে মিলিত হলেন। রসেটি, সুইনবার্ন, ওয়াইল্ড এবং আর্নল্ড, পেটার, সাইমণ্ডস্—এঁরা দ্বৈপায়ন ইংরাজ জাতি ও জাতিগৌরবে-দিবান্ধ ইংরেজী সমালোচনাকে দক্ষিণসমুদ্রতীরের স্বর্ণবালুকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। কোল্‌রীজ যার সূচনা করলেন, তাই নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মারফতে ১৯শ শতাব্দীর শেষে সুদৃঢ় সাহিত্যবিচারপদ্ধতিতে পরিণত হল। পরবর্তী শতাব্দীতে এলিয়ট, রিচার্ড্‌স, টিলিয়ার্ড, হার্বার্ট রীড যে নতুন পথে অগ্রসর হয়েছেন, তার মূল ১৯শ শতকের শেষার্ধে নিহিত রয়েছে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজী সমালোচনায় প্রতিভার দ্যুতি বা গবেষণার প্রাচুর্য কোন দিকেই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। ১৮৮৮ সালে ম্যাথু আর্নল্ড্ এবং ১৮৯৪ সালে ওয়াল্টার পেটার গতায়ু হলেন। এঁদের কিছু আগে কার্লাইল (১৮৮১) এবং কিছু পরে (১৯০০) রাসকিনের মৃত্যু হল। সুতরাং বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজী সমালোচনায় উর্বর-ক্ষেত্র ফসলহীন শূন্য প্রান্তরে রূপান্তরিত হল। তখনও অবশ্য আর্নল্ডের 'high seriousness' এবং পেটারের সৌন্দর্যতত্ত্ব ইংরেজী সমালোচনায় প্রভাব রক্ষা করে চলছিল। তবে বিশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজী সমালোচনায় প্রতিভার দীপ্তি ম্লান হয়ে এল; যাঁরা সমালোচনায় ব্রতী হলেন, তাঁরা বুদ্ধি ও পরিশ্রম-লব্ধ পাণ্ডিত্য-গবেষণা-সংগ্রহ প্রভৃতির সাহায্যে academic সমালোচনার নিশ্চিন্ত নির্ভরযোগ্য বাঁধা পথ অবলম্বনের চেষ্টা করলেন। সেন্টসবেরির কিঞ্চিৎ বাগ্‌বাহুল্যপূর্ণ প্রথাসিদ্ধ আলোচনা, এডমণ্ড গসের ব্যক্তিগত অভিরুচি-নিয়ন্ত্রিত সাহিত্য-সম্ভোগ, ডাওডনের সাবধানী ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা, কল্‌ভিনের জীবনীমূলক সমালোচনা, কার্টহোপের ইংরেজী কাব্য-

সাহিত্যবিষয়ক বিস্তারিত ঐতিহাসিক গবেষণা, কোল্‌রীজপন্থী ব্র্যাড্‌লে ও হারফোর্ডের গভীর তথ্যনিষ্ঠ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, ডবলিউ. পি. কার-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ সাহিত্যবিচার, অ্যাণ্ড্রু ল্যাঙ-এর জ্ঞানভূয়িষ্ঠ নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ সাহিত্যসমালোচনা—বিশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজী সাহিত্যবিচারের হাঁটুজলে কিছু আলোড়ন তুলেছিল। কার্টহোপের *History of English Poetry* (1895-1910), সেণ্টস্‌বেরির *History of Criticism* (1900-4), ডাওডনের *Shakespeare, his Mind and Art* (1875), ব্র্যাড্‌লের *Shakespearean Tragedy* (1904), *Oxford Lectures* (1909) প্রভৃতি গবেষণামূলক সমালোচনা ও সাহিত্যের ইতিহাসগুলি ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে রচিত। এই গ্রন্থগুলি আধুনিক ইংরেজী সমালোচনার সার্থক উদাহরণ বটে, কিন্তু এতে যে-পরিমাণ সঞ্চয়-সংগ্রহ আছে, সেই পরিমাণে সর্বত্র শ্রেষ্ঠ সমালোচক-প্রতিভার পরিচয় নেই। পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা ও নিপুণ বিশ্লেষণের দিক থেকে এই গ্রন্থগুলি মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যে ইংরেজী সমালোচনা যে ভাবে অগ্রসর হয়েছে, বিশ শতকের প্রথম দু দশকে তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ইংরেজী সাহিত্যে নতুন সমালোচনার আবির্ভাব হল। ইতিপূর্বে কবি এজরা পাউণ্ড ১৯০৯ সালে ধ্রুপদী ক্লাসিক আদর্শ ত্যাগ করে নতুন আদর্শে কবিতা রচনার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর দুখানি কাব্য *Perrsonae* ও *Exultation* ঐ বছরে প্রকাশিত হলে কাব্যকলা, শিল্পতত্ত্ব ও প্রকরণে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য সগর্বে আত্মপ্রকাশ করল। এঁর অল্প পরে অধিকতর সম্ভাবনা ও ব্যাপক আদর্শ নিয়ে কাব্য- ও সাহিত্যবিচার -ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন টি. এস. এলিয়ট। ১৯১৭ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে তাঁর *Prufrock, Poems, The Waste*

Land প্রভৃতি প্রকাশিত হল। তারপর ১৯৩০ সালের দিকে ইংরেজী কাব্যে আরও অনেক নতুন কবিপ্রতিভার উদয় হল। অডেন, ডেলুইস, স্পেণ্ডার—সকলের কাব্য-সঙ্কলন ১৯৩৯ সাল এবং তার কিছু পূর্বে প্রকাশিত হয়ে পুরাতন কাব্যাদর্শের সমাধি রচনা করল। এঁদের মধ্যে এলিয়ট *Egoist* (১৯১৭) পত্রিকা সম্পাদন-কালে 'Imagist' গোষ্ঠীর[২] মত গ্রহণ করলেন। এই পত্রিকায় তাঁর অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তাঁর সম্পাদিত *The Criterion* (পরে *The New Criterion*) পত্রিকাতেও তিনি নানাভাবে সাহিত্যাদর্শ ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরভিং ব্যাবিটের কাছ থেকে নতুন মন্ত্র গ্রহণ করলেন; এই মতে ব্যক্তিগত রোমান্টিকপ্রবণতা গ্রহণযোগ্য নয়। এই মতের প্রতিক্রিয়ায় Individualism, Subjectivism, Impressionism প্রভৃতি বিবিধ বাদপ্রতিবাদের সাড়া পড়ে গেল। Imagist গোষ্ঠীর জনকস্থানীয় T. E. Hulme-এর ভাবাদর্শ এলিয়টকে কিছুটা প্রণোদিত করেছিল। Hulme-এর মতে নীরস, আবেগ-বর্জিত, ব্যক্তিপ্রভাবহীন শুষ্ক কল্পনাই Imagist কাব্যের আদর্শ হওয়া উচিত।

আধুনিক কবিতার স্বরূপ নিয়ে এখনও ইংরেজী সাহিত্যে নিত্যই কত পরীক্ষা চলছে। কিন্তু যাঁরা পুরাতন ও ধারাবাহিক ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, তাঁর সেই চিরাচরিত ১৯শ শতাব্দীর খনিত পথেই চলেছেন। অ্যাবারক্রম্বি, মিডল্টন মারি, লুকাস, লিউইস প্রভৃতি সমালোচকগণ পুরাতন সমালোচনাপদ্ধতির সঙ্গে এখনও সংযোগ রক্ষা করেছেন।

---

২ Imagist Group—T. E. Hulme-এর নেতৃত্বে বিশ শতকের গোড়ার দিকে এই দল গড়ে ওঠে। ভাবাবেগবর্জিত শুষ্ক যথাযথ কল্পনাকেই অবলম্বন করে ইনি Imagist কবিতার পত্তন করেন। ১৯১২ সালের দিকে এজরা পাউণ্ড এই দলের সংগঠক হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে পাউণ্ড এই মত ত্যাগ করে 'Vorticism' মত (শিল্পী P. W. Lewis পরিকল্পিত নির্বস্তুক চিত্রবিদ্যা বা abstract painting) গ্রহণ করেন। তারপর আমেরিকায় মহিলা-কবি Amy Lowell এই Imagist গোষ্ঠীর নেত্রী হন।

১৯২০ সালের দিকে যেমন ইংরাজী কাব্যে নতুন রূপ ও রীতির পরীক্ষা শুরু হল, তেমনি রিচার্ডসের (I. A. Richards) প্রচেষ্টায় সাহিত্য- ও শিল্প-বিচারে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য স্থাপিত হল। তাঁর মতে সাহিত্যের বিষয়বস্তু, শিল্পপ্রকরণ, চিত্তপ্রবণতা—সমস্ত কিছুই মনস্তত্ত্বের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক কালে হার্বার্ট রীড, উইলিয়ম এম্পসন প্রভৃতি সমালোচক আবার সচেতন মনস্তত্ত্ব ত্যাগ করে অবচেতন ও নির্জ্ঞান মনের তলে অবগাহন করে শিল্প-তত্ত্বের মুক্তাটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন। 'Bloomsbury Group"-এর অন্তর্ভুক্ত ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-এর নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর *Common Reader* গ্রন্থে শিল্পী ও শিল্পিমানসের অন্তরালবর্তী পরিবেশের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

বিশ শতকে যেমন মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে শিল্পতত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করা হচ্ছে, তেমনি মার্কসীয় পন্থাও সাহিত্যবিচার-পদ্ধতিকে নানা দিক দিয়ে প্রভাবান্বিত করবার চেষ্টা করছে। রিক্‌ওয়ার্ড, জ্যাকসন, র‍্যাল্‌ফ ফক্স প্রভৃতি মার্কস্‌বাদী সমালোচকগণ সমাজচেতনাকেই সাহিত্য ও শিল্পের মূলীভূত প্রেরণা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এই যুগের অনেক তরুণ কবি (অডেন, স্পেণ্ডার, ডে-লুইস প্রভৃতি) এই মত কিয়দংশে গ্রহণ করলেও কেউ কেউ আবার তা অচিরে ত্যাগ করেছেন। এই মত-প্রতিষ্ঠায় যিনি গভীর তত্ত্বদর্শন ও যুক্তিসিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর নাম কডওয়েল (আসল নাম—ক্রিস্টোফার সেণ্টজন স্প্রিগ)। তাঁর *Illusion and Reality* গ্রন্থে শিল্পবিচারে মার্কস্‌বাদী দর্শনের প্রভূত সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

---

৩ 'Bloomsbury Group'—লণ্ডনের একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চলের নাম ব্লুমস্‌বেরি। এ অঞ্চলে ব্রিটিশ মিউজিয়ম, য়ুনিভার্সিটি কলেজ, সেনেট হাউস এবং লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির লাইব্রেরি অবস্থিত। শ্রীমতী ভার্জিনিয়া স্টিফেন (পরে উল্‌ফ) এখানে তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বাস করতেন। তাঁদের বাড়িতে কেম্‌ব্রিজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ও সাহিত্যিকগণ মিলিত হতেন। এঁরাই 'Bloomsbury Group' নামে পরিচিত। লিটন স্ট্র্যাচি, জি, ই, মুর ডানকান গ্রাণ্ট, ডেভিড গারনেট, লিওনার্ড উল্‌ফ (ভার্জিনিয়ার স্বামী) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও শিল্পীর মিলনকেন্দ্র ব্লুমস্‌বেরি অঞ্চল প্রথম মহাযুদ্ধের পর বুদ্ধিজীবী-কেন্দ্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ইংরেজী সমালোচনার নানা মত ও দলের কথা উল্লেখ করা হল। অবশ্য এখনও এঁদের মধ্যে এমন দু-একজন আছেন যাঁরা বিশেষ কোন মতের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে নিজস্ব মতামত ও সিদ্ধান্ত অনুসারে সাহিত্যবিচার অধিকতর সমর্থন করেন। উদাহরণস্বরূপ এডুইন মুইরের নাম করা যেতে পারে। ইনি সমালোচনায় মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করেও নিজস্ব মতে অটল আছেন।

বর্তমান ইংরেজী সমালোচনায় একদিকে যেমন একদল আধুনিক গোষ্ঠী নানারকম শিল্পরীতির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ও তত্ত্ববাদ নিয়ে আলোচনা করছেন, তেমনি আর একদল গবেষণা ও তত্ত্ব-ব্যাখ্যানের চিরাচরিত সমালোচনারীতিকে এখনও আঁকড়ে ধরে আছেন। অলিভার এলটন, ওয়াল্টার র‍্যালে, কুইলার কাউচ, হার্বার্ট গ্রীয়ার্সন, সেলিনকোর্ট প্রভৃতি তাত্ত্বিক ও গবেষকগণ সেণ্টস্‌বেরির অনুরূপ আদর্শ অনুসরণ করে চলেছেন। এ ছাড়াও ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত নানা পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা যথার্থ স্থান করে নিয়েছে। *The New Age*, *New Criterion*, *Horizon*, *Times Literary Supplement*, *Sunday Times* প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায় সমালোচনা সম্পর্কে নব নব মত ও পথ নির্দিষ্ট হচ্ছে।

রুশীয় সমালোচনা

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, ১৮শ শতাব্দী থেকেই আধুনিক রুশীয় সাহিত্য ও সমালোচনার যথার্থ উদ্ভব হয়েছে। ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রুশীয় সমালোচনা একদল অভিজাত সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত হয়েছিল। তাঁরা মার্জিত ভাষায় সাহিত্য-বিচার ও মূল্যবিনির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। Zhukovsky, Pushkin, Baron Anton Antonovich Delvig প্রভৃতি সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা সমাজের উচ্চ স্তরেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে Delvig-এর *Literaturnaya Gazeta*

(1831) এবং Pushkin-এর *Sovremmenik* (1836) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এর অল্প পরে রুশীয় সমালোচনা মতবাদ ও মতভেদে কণ্টকিত হয়ে উঠল। একদল মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত বুদ্ধিজীবী শেলিং, ফিক্‌টে ও হেগেলের দার্শনিক মতের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য-বিচারের দুটো বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। এঁদের একদল রুশীয় সাহিত্য ও সমালোচনায় *Slavophiles* এবং অন্য দল *Westerners* নামে পরিচিত। প্রথম দল জাতীয় চরিত্রকেই সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন বলে গ্রহণ করলেন। এঁরা মতবাদের দিক থেকে ঈষৎ পুরাতনপন্থী; প্রাচীন রুশজাতির ঐতিহ্য থেকে এঁরা সরে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই *Slavophiles* দলের নেতৃস্থানীয় ছিলেন Ivan Sergeyevich Aksakov (1823-86)। পাশ্চাত্যপন্থী বা *Westerner* দলভুক্তগণ আধুনিক পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সাহিত্যকে আধুনিক প্রগতিশীল জীবনের বাহন বলেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রয়োজন হলে এঁরা রুশের জাতীয় ঐতিহ্যকেও সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে পশ্চিম য়ুরোপের জীবনবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতেন না। পাশ্চাত্য দলের নেতা Vissarion Grigoryvich Belinsky (1810-48) হেগেলের বামপন্থী দর্শন ও ফরাসী সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বলাই বাহুল্য এঁর সমালোচনা ও সাহিত্যচিন্তা প্রগতিশীল, আধুনিক ও সমাজতত্ত্বকেন্দ্রিক।

প্রথম নিকোলাসের (১৭৯৬-১৮৫৫) কুশাসনের ফলে রুশ সাহিত্য ও সমালোচনা ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিপ্লবী আকার ধারণ করল। সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা—এগুলো হল সাহিত্যের একমাত্র উপাদান; শিল্পকলা ও সৌন্দর্য সাহিত্যের অনাবশ্যক বাড়তি অঙ্গ বলে কিছু অবহেলিত হল। Nikolay Garilovich Chernyshevsky (1829-89) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য শুধু জীবনের চিত্রাঙ্কন নয়; সাহিত্য পাঠককে

জীবন সম্বন্ধে উদ্‌বুদ্ধ করবে—এটাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। ১৮৫৮ সালের পর তিনি সাহিত্যবিচারে পুরোপুরি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করলেন। জেলে বসে লেখা তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস *What is to be done*-এ এই আদর্শই গৃহীত হয়েছে। তাঁর মন্ত্রশিষ্য Nikolay Alexandrovich Dobrobyubov (1836-61) ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে বললেন, যে-সাহিত্য সমসাময়িক জীবনের সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না, তা সাহিত্যই নয়। তরুণ বিপ্লবী সমালোচক Dimitry Ivanovich Pisarev (1840-58) সাহিত্যবিচারে বিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্রবাদকে প্রাধান্য তো দিলেনই, এমন কি তাঁর সমালোচনা কিয়দংশে 'নিহিলিস্ট'পন্থী হয়ে পড়ল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে সাহিত্যবিচারে বিপ্লবী মতবাদ ও সমাজতান্ত্রিকতা আরও উগ্র হয়ে উঠল। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে Nikolay Mikhaylovsky (1842-1904) বললেন যে, যে-কালে তিনি বাস করেন, তার সঙ্গে যে শিল্পসাহিত্যের গভীর যোগ নেই, তাকে তিনি কিছুতেই গ্রহণ করবেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গোটা ১৯শ শতাব্দী ধরেই এই জাতীয় সমাজতান্ত্রিকতা ও বিপ্লবী চিন্তাধারা রুশীয় সমালোচনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। অবশ্য সাহিত্যবিচারে শিল্পসৌন্দর্যের অনুসন্ধান যে একেবারে বাতিল হয়ে গেল তা নয়। সমাজতন্ত্রবাদী সমালোচকদের তীব্র নিন্দা সত্ত্বেও Paul Vasilyvich Annenkov (1813-87) এবং Grigoryev (1822-64) সাহিত্যসমালোচনায় শিল্প সৌন্দর্য প্রভৃতি পুরাতন ঐতিহ্যকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। যদিও মার্কসীয় দর্শন ধীরে ধীরে রুশীয় সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি এবং শিল্পবিচার-পদ্ধতিকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল, তবু ১৯শ শতাব্দীর শেষে এবং বিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও সমালোচক সমাজতান্ত্রিকতা ও বস্তুদর্শন বাদ দিয়ে শিল্প, সৌন্দর্য, মরমীবাদ, ধর্মীয় এষণা প্রভৃতি পুরাতন ঐতিহ্যমানের

দ্বারা শিল্পসংস্কৃতির মূল্যবিনির্ণয়ে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নি। Vladimir Sergevevich Soloveyev (1853-1900) সাহিত্যে ধর্মীয় চেতনার কথা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। টলস্টয় তাঁর শিল্পতত্ত্ববিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ *What is Art* (1897)-এ পুরাতন সংস্কারকে অবলম্বন করে সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর প্রধান তত্ত্ব—সাহিত্য মূলতঃ 'infection'-ধর্মী, সংক্রামক। পাঠকচিত্তে সাহিত্যিক বিশেষ তত্ত্ব, অনুভূতি ও শিল্পবোধকে সঞ্চারিত করে দেন—এই হল সাহিত্যের প্রধান কাজ। অবশ্য তিনি ধর্মীয় চেতনাকেও অস্বীকার করলেন না।

এই একই সময়ে কোন কোন সমালোচক সমাজতন্ত্রবাদী বিচার-পদ্ধতিকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে সৌন্দর্যবাদী সমালোচনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হলেন। এঁদের মধ্যে A. Volynskyর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে নব্য রোমান্টিক দল ১৯শ শতাব্দীর শেষ দিকে *Syeverny Vyestnik* পত্রিকার সাহায্যে সাহিত্য ও শিল্পবিচারে সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন। এমন কি বিশ শতকে সমাজতন্ত্রবাদের যুগেও Merezhkhovsky, Rozanov, Leo Shestov প্রভৃতি সমালোচক ও সাহিত্যিকেরা সাহিত্যবিচারে ধর্ম ও দর্শনকে স্থান দিয়েছেন।

১৯১৭ সালের পর রোমান্টিক ও সমাজতন্ত্রবাদের দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক অগ্নিস্নানের পর ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল। রুশীয় সাহিত্য এবার সোভিয়েত সাহিত্য হল; রাষ্ট্র ও সমাজ হল এর প্রাণকেন্দ্র। মার্কস্‌পন্থী ও মার্কস্‌বিরোধী সমালোচকগণের মধ্যে দারুণ বিরোধ ঘনিয়ে এল। এমন কি মার্কস্‌বাদী সাহিত্যিকদের মধ্যেও সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ ও উদ্দেশ্য নিয়ে গৃহবিবাদ বেধে গেল। 'ফর্ম'-বাদী সমালোচকেরা বিষয়ের চেয়ে প্রকাশভঙ্গিমার প্রতি অধিক [illegible] দিলেন। এঁরা হলেন

অ-বাস্তববাদী (non-realistic) ও অতিবাস্তববাদী (sur-realistic)। কিন্তু এই সব উৎকট পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শঙ্কিত হয়ে এই সমালোচকেরা সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন : "Art is real, as life is. And like life itself, art it without aim and sense ; it exists because is cannot help existing." কিন্তু অতিবাস্তববাদী ও পরাবাস্তববাদী সমালোচকেরা বাস্তবযুক্তি ও প্রত্যয়ের অতীত দুরধিগম্য রহস্যবাদী ভাষাভঙ্গিমা (*Za-um*) ব্যবহার করে সাহিত্য ও শিল্পে নৈরাশ্যবাদকেই ত্বরান্বিত করলেন।

আর একদল এসব 'হিং টিং ছট' ও 'abracadabra' বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ তথ্যকেই সাহিত্যের রাজতখ্‌তে বসালেন। এঁদের মতে তথ্য, বস্তু-উপাদান, fact—এই হল সাহিত্য ; একেই এঁরা 'factography' বলেছেন—অর্থাৎ সাহিত্য ও 'factogrophy'-তে কোন ভেদ নেই। 'রিপোর্টাজ', নিঃস্পৃহ যথাবস্থিত ঘটনাবিবৃতিই উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা হবে। এঁরা মনে করেন, উপন্যাসের গল্প ও চরিত্র হচ্ছে "opium for the people" ; এই আফিমের নেশা থেকে সাহিত্যকে রক্ষা করা এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য।

গত তিরিশ বছর ধরে সোভিয়েত রুশিয়ায় মূলতঃ মার্কস্‌পন্থী শিল্পবিচারপদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। এই ধরনের সমালোচনা অনুসারে সাহিত্যিককে সকলের আগে *Diamat* (অর্থাৎ Dialectic Materialism) আয়ত্ত করতে হবে, তারপর অন্য কথা। এই Dialectic Materialism ও সাহিত্য-সমালোচনা নিয়ে ১৯১৭ সালের পর অনেক মতানৈক্য ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল ; তা চরমে উঠল ১৯৩২ সালের দিকে। এই মতকলহ এ রকম প্রচণ্ড আকার ধারণ করল যে, বাধ্য হয়ে সোভিয়েত সরকার সাহিত্য ও শিল্পের ওপর হস্তক্ষেপ করলেন। তাঁরা নির্দেশ দিলেন : অতঃপর রুশীয় শিল্পী ও সাহিত্যিক Socialist Realism বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকেই অনুসরণ

করবেন এবং এই মতবাদের দ্বারাই সমালোচক সাহিত্যবিচার করবেন। Maxim Gorky সাহিত্যে এই মত গ্রহণ করলেন এবং Usievich, Rozental প্রভৃতি সমালোচকেরা এই মতের স্বীকৃতি দিলেন। এঁরা বললেন যে, সনাতন বাস্তববাদ কিয়দংশে নেতিবাদী, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ এদিক থেকে অস্তিবাদী ও গঠনমূলক। এতে ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয় না, শোষণ-হীন সমাজের সঙ্গে তাল রেখে শিল্পী ও সাহিত্যিক আপন আপন ব্যক্তিচিত্তের প্রত্যয়গুলি বিবৃত করতে পারেন। অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ কালের ত্রিবিধ সত্তার মধ্যে বিধৃত যে প্রবহমানতা রয়েছে, তাকেও উপলব্ধি থেকে এঁরা তুচ্ছ করেন নি। এঁদের পর একটা কথা সাহিত্যে প্রচারলাভ করল; বিষয় ও রীতি (content ও form), এদের পরস্পর-নির্ভরতার ওপর সাহিত্য ও শিল্পের শিল্পত্ব নির্ভর করছে। কাজেই সোভিয়েত সমালোচনা বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যে রকম 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে তাল ঠুকছিল, এখন নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে তার রণহুঙ্কার অনেকটা কমে এসেছে; সাহিত্যবিচারপদ্ধতি যদিচ এখনও রাষ্ট্রের করায়ত্ত, তবু শিল্পবিচারে ধীরে ধীরে বুদ্ধি ও যৌক্তিকতার প্রাধান্য স্থাপিত হচ্ছে, এটাই আশার কথা।

গত আড়াই হাজার বছরের য়ুরোপীর সমালোচনাসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেখা গেল যে, কীভাবে য়ুরোপের চিন্তাজগৎ সাহিত্যকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। প্লেটো (খ্রীঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ) থেকে আরম্ভ করে অধুনাতন বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সাহিত্যবিচারপদ্ধতির স্বরূপ আলোচনা করলে দেখা যাবে, রূপের প্রত্যেক দেশেই সমালোচনা নিয়ে প্রায় একই প্রকার বিচার-বিতর্ক-মতকলহের উৎপত্তি হয়েছিল। কখনও সমালোচনা নীতিবাদী আদর্শকে মেনেছে, কখনও সৌন্দর্যকে শিরোধার্য

করেছে, কখনও-বা অ্যাকাডেমি বা ব্যক্তির করাঙ্গুলি ধরে পথ চলেছে। ১৯শ শতকের মধ্যেই সাহিত্য ও শিল্পের মূল্য সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্যগুলি প্রায় বলা হয়ে গেছে। বিশ শতক ধরে নতুন পথের সন্ধান চলেছে। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতন্ত্রবাদ, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রতন্ত্র—এর কোন্‌টি যে সাহিত্যবিচারের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে তাই নিয়ে মতবৈষম্যের এখনও অবসান হয় নি। হয়তো আগামীকাল কোন প্লেটো-অ্যারিস্টটল-লংগিনাস-সিডনে-লেসিং-কোল্‌রীজ-আর্নল্ড-পেটার-ক্রোচে-টলস্টয় এসে সাহিত্য ও সমালোচনাকে নতুন পথের প্রান্তে পৌঁছে দেবেন।

আট

॥ সংস্কৃত সাহিত্যবিচারের ধারা ॥

ভূমিকা

নানা কথা

ইতিপূর্বে আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যবিচারের ধারা সংক্ষেপে বিবৃত করে দেখেছি যে, কীভাবে এবং কোন্ দিক দিয়ে য়ুরোপে সমালোচনা ও সাহিত্যের মূল্য নির্ণীত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের অলঙ্কারশাস্ত্র বা সমালোচনা-তত্ত্ব আলোচনা করলে সাহিত্যবিচারপদ্ধতির আরও অনেক নতুন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে।

খ্রীষ্টীয় ৯ম-১০ম শতকে আবির্ভূত আলঙ্কারিক রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'য় রূপকের ছলে কাব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কাব্যপুরুষ হলেন সরস্বতীর পুত্র। সাহিত্যবিদ্যা তাঁর সহধর্মিণী, তাঁর শরীর হল শব্দ ও অর্থ; সমতা, প্রসাদ, মাধুর্য প্রভৃতি তাঁর গুণ; অনুপ্রাসাদি হল অলঙ্কার, আর রসই হচ্ছে তাঁর আত্মা। এর রূপকার্থ ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের ধারা দুটি শাখায় অগ্রসর হয়েছে। একটি শাখা কাব্যের শরীর অর্থাৎ শব্দার্থ-অলঙ্কার-রীতি নিয়ে ব্যস্ত; আরেকটি শাখা কাব্যের আত্মা অর্থাৎ ধ্বনি-রস নিয়ে বিচারশীল। এই বিচারপদ্ধতি প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে পরম্পরাক্রমে চলে এসেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের তত্ত্ববাদ যে রকম বহুমুখী, সুদূরবিস্তারী ও গভীর, তেমনি আবার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেও এর জুড়ি মেলা ভার। মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, ব্যাকরণ, ছন্দঃশাস্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রের সহযোগিতায় ভারতীয় সাহিত্যবিচারপদ্ধতি একটি অপূর্ব চিত্তগ্রাহ্য তত্ত্ববাদে পরিণত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে সাহিত্যতত্ত্বকে অলঙ্কারশাস্ত্র এবং সমালোচককে আলঙ্কারিক বলা হত। সে যুগে সাহিত্যের চেয়ে কাব্য শব্দেরই অধিকতর ব্যবহার লক্ষিত হয়। ভামহ, মাঘ প্রভৃতি আলঙ্কারিক ও কবিরা পূর্বেই শব্দার্থের সহিতত্ব অর্থে 'সাহিত্য' শব্দের ব্যবহার জানতেন। তবে রাজশেখরই তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'য় ব্যাপক অর্থে সাহিত্য শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। তা হলেও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে 'কাব্য' শব্দই (পদ্য, গদ্য ও নাটক) অধিকতর ব্যবহৃত ও সুপরিচিত।

কথা উঠবে, সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের নাম অলঙ্কারশাস্ত্র হল কেন? অলঙ্কার অর্থাৎ Figure of speech যে গ্রন্থে আলোচিত হয় তাকেই অলঙ্কারশাস্ত্র বলে। কিন্তু অলঙ্কার বা কাব্যের মণ্ডনকলা কাব্যতত্ত্বের একটি দিক মাত্র; সুতরাং কাব্যতত্ত্বের একাংশকে (অর্থাৎ অলঙ্কার) পুরো মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি? হয়তো এমন হতে পারে যে, ভারতীয় চিন্তাধারা অলঙ্কার নিয়েই বেশির ভাগ ব্যস্ত হয়েছিল। অলঙ্কারের সংখ্যা, সংমিশ্রণ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ—এই নিয়েই তো সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বারো আনা আয়োজন। অলঙ্কার কাব্যশরীরের স্থূল অনিত্যধর্ম; তার আত্মা হল রস ও ধ্বনি। কিন্তু প্রথম দিকে আলঙ্কারিকেরা খুব গভীর রসজ্ঞানের পরিচয় না দিয়ে কাব্যের অনিত্যধর্মের (অলঙ্কার) ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই সে যুগে সমালোচনাশাস্ত্রকে বলা হত অলঙ্কারশাস্ত্র এবং যাঁরা এই শাস্ত্র আলোচনা করতেন তাঁরা আলঙ্কারিক নামে অভিহিত হতেন। পরে ধ্বনি, রস প্রভৃতি কাব্যের গভীরতর তত্ত্ব (অলঙ্কারের পরিভাষায়—কাব্যের 'আত্মা') আলোচিত হলেও 'অলঙ্কারশাস্ত্র' নামটি কালজয়ী হল। আধুনিক কাব্যরসিকের কাছে অলঙ্কার-শাস্ত্রের এই নাম গ্রহণযোগ্য না হতে পারে। অ্যারিস্টট্লের *Poetics*-এর নাম যদি Rhetoric হত এবং পরবর্তিকালে য়ুরোপে কাব্যতত্ত্বকে Poetics না বলে যদি Rhetoric বলা হত, তা হলে

যে রকম অসঙ্গতি ঘটত, সংস্কৃত সমালোচনাশাস্ত্রকে অলঙ্কারশাস্ত্র নামে অভিহিত করাও কতকটা সেই রকম মনে হবে।

অবশ্য কেউ কেউ বলবেন যে, অলঙ্কার শব্দটিকে সংস্কৃত কাব্য-জিজ্ঞাসায় সর্বত্র কবিতার বহিরঙ্গগত মণ্ডনকলা বা rhetoric অর্থে প্রয়োগ করা হয় নি। অলঙ্কার শব্দটি সৌন্দর্য অর্থে ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। বামন তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'তে অলঙ্কারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ"—অলঙ্কার হল সৌন্দর্য। সুতরাং অলঙ্কারশাস্ত্রের 'অলঙ্কার' ঠিক rhetoric নয়, একে সৌন্দর্য বলে গ্রহণ করা যায়।[১] তা হলে অলঙ্কারশাস্ত্রের অর্থ হবে কাব্যসৌন্দর্য-বিচারগ্রন্থ। এই ভাবে অর্থ করে নিলে অলঙ্কার-শাস্ত্রের অব্যাপ্তিদোষ (too-narrow) অনেকটা কেটে যাবে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে অলঙ্কারশাস্ত্র বোধ হয় সৌন্দর্যবিচারগ্রন্থ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের আত্মা, রীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে গভীর গবেষণাসুলভ সূক্ষ্ম তার্কিকতা ও আলোচনা থাকলেও আলঙ্কারিকেরা অলঙ্কার (rhetoric) আলোচনা না করে এক পাও এগোতে পারতেন না। সুতরাং আমাদের অনুমান, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র প্রধানতঃ কাব্যের মণ্ডনকলা অর্থাৎ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার থেকেই অভিধা গ্রহণ করেছে। পরবর্তিকালে অনেক আলঙ্কারিক কাব্যের বহিরঙ্গগত অলঙ্কারকে আমল না দিয়ে তার আত্মা অর্থাৎ রস ও ধ্বনির দিকে বেশি ঝুঁকলেও অলঙ্কারশাস্ত্রের নাম পালটে নেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র প্রধানত শ্লেষণমূলক এবং দার্শনিক ধরনের। য়ুরোপীয় সমালোচনা এদিক থেকে কিয়দংশে সাংশ্লেষিক (synthetic)। য়ুরোপীয় সমালোচক কাব্যপুরুষের দেহ নির্মাণ করেছেন, সংস্কৃত আলঙ্কারিক তার দেহকে বিশ্লেষণ করেছেন, দোষ

১ শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী—অলঙ্কারচন্দ্রিকা (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃষ্ঠা ২৯৪-৯৫

গুণ নির্ণয় করেছেন, কাব্যের ফলশ্রুতি নিয়ে তুমুল তর্ক উত্থাপন করেছেন। সংস্কৃত কাব্যজিজ্ঞাসা, রসতত্ত্ব, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং পাশ্চাত্য Poetics, Theory of Literature প্রভৃতি তত্ত্ববিচারে একই বস্তু। কিন্তু দেশ ও কালভেদে উভয়ের মধ্যে বিশেষ লক্ষণে অনেক পার্থক্য দেখা যাবে। য়ুরোপের অ্যারিস্টট্‌ল *Mimesis* ও *Katharsis* নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, লংগিনাস *Hupsous* (sublime) অবলম্বনে নতুন কথা বলেছিলেন। পরবর্তিকালে ক্লাসিকতা, রোমান্টিকতা, বাস্তবতা প্রভৃতি তত্ত্ব নিয়ে য়ুরোপের নানা দেশে সমালোচক ও সাহিত্যিকেরা মানসিক শিরঃপীড়ায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। অন্যদিকে ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা অলঙ্কার, রীতি, বাচ্যার্থ-ব্যঙ্গ্যার্থ, রস প্রভৃতি বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন। এদেশের আলঙ্কারিকেরা প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে যে রকম গভীর ও তন্নিষ্ঠ হয়ে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন এবং সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁদের মননধর্মিতা ও চিত্তের স্বাভাবিক কৌতূহল আধুনিক পাঠকের কাছেও শ্রদ্ধা পাবে।

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের গোষ্ঠীভাগ

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব যে একটি সজীব ও পরিবর্তনধর্মী সাহিত্যপ্রত্যয়, তা এর নানা দল-উপদলের পরিচয় নিলেই বোঝা যাবে। য়ুরোপের সমালোচনা অন্ততঃ দুহাজার বছর ধরে নানা মতামত, দলাদলি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের ধারা অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে—এখনও সে পরিবর্তন থেমে যায় নি। ঠিক তেমনি সংস্কৃত সাহিত্য আজ অপ্রচলিত ক্লাসিকের পর্যায়ে উঠে গেলেও প্রাচীন যুগে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যে নানা পরিবর্তন ও মতামতের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই বিচিত্র তত্ত্বকলহের মধ্যে অন্ততঃ চারটি বিশেষ মতের পরিচয় পাওয়া যায়: '(১) অলঙ্কার-বাদী, (২) রীতিবাদী, (৩) ধ্বনিবাদী, এবং (৪) রসবাদী

অবশ্য একথা সত্য যে, এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে, যাকে 'School' বা গোষ্ঠী বলে, সেরকম কোন সমালোচকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে নি। যিনি যে মতের আচার্য ছিলেন, তাঁর শিষ্যেরা তাঁর মত কখনও পুরোপুরি নিয়েছেন, কখনও কিছু নতুন কথা যোগ করেছেন, কখনও-বা সম্পূর্ণ অন্য পথে গেছেন। মানসিক প্রবণতা ধরে উল্লিখিত চারটি ধারার মধ্যে সর্বদা যে কালগত বিকাশপরম্পরা লক্ষ্য করা যাবে, তা নয়। একই যুগে একাধিক মত জনসমাজে সমান জনপ্রিয় হয়েছিল। ধ্বনিবাদের যুগেও অলঙ্কারবাদীদের প্রাধান্য বিশেষ খর্ব হয় নি। আবার অলঙ্কারবাদীদের কেউ কেউ আভাসে ইঙ্গিতে রসের কথাও বলেছেন।

সংস্কৃত কাব্যবিচারের প্রথম স্তরটিকে অলঙ্কারবাদ বলা হয়। অলঙ্কারবাদীরা মনে করতেন, বাচ্য, অর্থ ও অলঙ্কারের দ্বারাই কাব্যসৃষ্টি হয়। বাচ্যার্থকে নানা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারে যথাবিহিত সাজিয়ে দিলেই কাব্যের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। অলঙ্কার হল কাব্যশরীরের শোভাকর বাহ্যিক মণ্ডনকলা; একেই ইংরেজীতে poetic embellishment বলে। যেমন অলঙ্কারের দ্বারা নারীদেহের রূপলাবণ্য রমণীয়তা প্রাপ্ত হয়, তেমনি সাধারণ শব্দ ও অভিধেয়ার্থ অলঙ্কারসহযোগে পরম শোভাকর সৌন্দর্য লাভ করে। কেউ কেউ বলেন, শুধু বাইরে থেকে আরোপিত অলঙ্কার-কৌশলই বাক্যকে কাব্য করে, এ কথা বলার অর্থ—কাব্যের শরীরকে স্বীকার করে আত্মাকে উড়িয়ে দেওয়া। যাঁরা অলঙ্কারের ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করতে চান, তাঁরা যে কাব্যবিচারে বহিরঙ্গবিলাসী, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য 'অলঙ্কার'কে পারিভাষিক অর্থে (অর্থাৎ rhetoric অর্থে) না নিয়ে কাব্যসৌন্দর্য অর্থে গ্রহণ করলে বামনের উক্তি, "কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ"—বাক্যাংশকে তত স্থূল মনে হবে না। তখন অলঙ্কারবাদকে পাশ্চাত্য সমালোচনার 'Æsthetic School'-এর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

অলঙ্কারতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি বিচারপদ্ধতির উৎপত্তি হয়েছিল। এর নাম রীতিবাদ। এই মতের প্রচারকগণ "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" (দণ্ডী) বাক্যটিকে সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। রীতির সংজ্ঞা—"বিশিষ্টা পদরচনা রীতি।"—বিশেষ নিয়মে শব্দগ্রন্থনের নাম রীতি। অনেকে style ও রীতিকে অভিন্ন মনে করেন; তা কিন্তু ঠিক নয়। Style হল লেখকের মনের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা যা শিল্পকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ style হল লেখকের ব্যক্তিপ্রবণতার চিহ্ন, অনেকটা subjective বা বিষয়িগত। অপর দিকে রীতি হল বিষয়গত বা objective; অনেকটা ইংরেজী diction শব্দের সঙ্গে তুলনীয়। রীতি লেখকের মনের ধর্ম নয়, রচিত গ্রন্থের রচনাকৌশলের বৈশিষ্ট্য। লেখকের কথা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কোথাও প্রাধান্য পায় নি। তাই আলঙ্কারিকগণ দেশভেদে বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, লাটীয়া প্রভৃতি রীতি বা রচনাভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন। ঔচিত্যবাদ, বক্রোক্তিবাদ প্রভৃতি মতগুলি এই রীতিবাদের সঙ্গে জড়িত। ঔচিত্য হল propriety বা যাথার্থ্য। কাব্যসৃষ্টির জন্য যা আবশ্যক, তাকেই ঔচিত্য বলে। বক্রোক্তিবাদ হল ভাষা ও বক্তব্যভঙ্গিমার অভিনবত্ব, বক্রতা, চারুত্ব। সাদামাঠা ভাবে বললে কাব্য হবে না; সাধারণ কথাকে যখন ঘুরিয়ে সুকৌশলে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে বলা যাবে, তখনই তা কাব্য বলে প্রতিভাত হবে। বলা বাহুল্য ঔচিত্যবাদ বা বক্রোক্তিবাদ রীতিবাদের সঙ্গে অন্বিত।

ধ্বনিবাদ হল সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সবচেয়ে মৌলিক তত্ত্ব। অধুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যবিচারেও suggested values বা ব্যঞ্জনার প্রভাব স্বীকৃত হচ্ছে। বাচ্যার্থ যখন অভিধেয়ার্থকে নির্দেশ না করে অপর বস্তুকে (বস্তু, অলঙ্কার, রস যাই হোক না কেন) আভাসে ফুটিয়ে তোলে, তখন ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার উৎপত্তি হয়। এই ধ্বনিবাদ নিয়ে যে কত রকমের আলোচনা হয়েছে তার হিসেব নেই। আধুনিক কালের গবেষকও এই মতবাদের অভিনবত্বে বিস্মিত।

কাব্যের কাজ অভিধেয়ার্থকে ছাড়িয়ে যাওয়া; মূল বক্তব্যের অন্তরালে যে রমণীয় বক্তব্যের সূক্ষ্ম আভাস ব্যঞ্জিত হচ্ছে—তাকেই কাব্যের আত্মা বলা হয়েছে। য়ুরোপে লংগিনাসের sublime-তত্ত্ব ধ্বনিবাদের মতই একটা মৌলিক মতবাদ, যদিও ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রে ধ্বনিবাদ যেরকম গৌরব ও প্রাধান্য অর্জন করেছে, লংগিনাস ঠিক ততটা মান্য হন নি।

সংস্কৃত কাব্য ও নাট্যতত্ত্বে রসবাদ অনেক পূর্ব থেকেই স্বীকৃত হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত অলঙ্কার, রীতি, ধ্বনি, বক্রোক্তি—সবই রসে পরিণতি লাভ করেছে। কাব্যপাঠ ও অভিনয়দর্শন থেকে আস্বাদ্যমান চিত্তবৃত্তির আনন্দময় অনুভূতিকেই আলঙ্কারিক পরিভাষায় রস বলে। শেষ পর্যন্ত রস ও আনন্দ একার্থবাচী হয়ে দেখা দেয় এবং "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" বাক্যটি ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের শেষ কথা ও সার কথা বলে কালজয়ী হয়। এমন কি যাঁরা ধ্বনি বলে শুরু করেছিলেন, তাঁরাও রসে এসে থেমেছেন। তাঁরা বলেছেন, ধ্বনির অর্থ—বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা; কিন্তু সে বিষয়ান্তরটি কি বস্তু? উত্তর হল, বিষয়ান্তরের অর্থ—রস। শ্রেষ্ঠ ধ্বনি কি?—না রসধ্বনি। অবশ্য রসবাদই অলঙ্কারশাস্ত্রের চূড়ান্ত কথা নয়। কেউ কেউ রসকে বাদ দিয়েও কাব্যবিচারের অন্য মাপকাঠি খুঁজেছেন। রমণীয়তা অর্থাৎ সৌন্দর্যই কাব্যের প্রাণ, শুধু রস নয়—এ মতবাদও পরবর্তিকালে বিশেষভাবে চিন্তা উদ্রেক করেছিল। সব দিক বিচার করলে দেখা যাবে, শেষ পর্যন্ত ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রে রস ও ধ্বনিই কাব্যতত্ত্ব হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

যদিও আলঙ্কারিকগণ কাব্যতত্ত্ব, তার দেহ ও আত্মা নিয়ে নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন, তবু তাঁদের বক্তব্যই কাব্যবিচারের চূড়ান্ত কথা নয়। কাব্যতত্ত্বের কোন কোন দিক তাঁদের কৌতূহল আকর্ষণ করে নি। যেমন কবিকল্পনা, কবি ও পাঠকের সম্পর্ক, কবির ব্যক্তিত্ব ও কাব্যে তার প্রতিফলন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা মিতবাক। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব কবির দিক থেকে আলোচিত না হয়ে

পাঠকের পক্ষ থেকে বিশ্লেষিত হয়েছে। কাজেই কাব্যসমালোচনাও যে একপ্রকার সৃষ্টিশীল সাহিত্যবস্তু—একথা সে যুগের আলঙ্কারিক ও কাব্যপাঠক—কেউই মানতে পারতেন না।

রাজশেখর প্রভৃতি পরবর্তিকালের আলঙ্কারিকগণ 'কবিশিক্ষা' নামক নতুন নামে অলঙ্কারশাস্ত্রের অভিধা নির্দেশ করে কবি কি ভাবে কাব্য রচনা করবেন, কবির লক্ষণ কি ইত্যাদির দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। সে তালিকা আধুনিক পাঠকের কাছে হাস্যকর মনে হবে। রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'র দশম অধ্যায়ে ('কবিচর্যা') কবির জীবন, খাদ্য-পানীয়, বাসভবন, নানা রকমের বাসকক্ষ, উদ্যানবাটিকা, ভোগবিলাসী দৈনন্দিন জীবন (স্নানের জন্য ধারাযন্ত্র বা shower bath, সেবার জন্য প্রচুর পরিচারক-পরিচারিকা ইত্যাদি) প্রভৃতির সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। সে যাই হোক, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতামতের পরিচয় নিলে দেখা যাবে যে, কাব্যতত্ত্বাদি প্রধানতঃ ন্যায় ও মীমাংসকদের আদর্শই অনুসরণ করেছে। আধুনিক পাঠকের কাছে এর কিছু অংশ অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও, ভারতীয় মনীষা যে একদা কাব্যতত্ত্ব নিয়ে গভীর চিন্তা করেছিল এবং নানা মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিল—এই আবিষ্কারই অলঙ্কারশাস্ত্রানুশীলনের সার্থক ফলশ্রুতি।

অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাস

সূচনা

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র অন্ততঃ হাজার বছরেরও পূর্ববর্তী। খ্রীঃ ৮ম শতাব্দী থেকে যথার্থ অলঙ্কারতত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে এবং প্রায় খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষেই সংস্কৃত ভাষায় নানা অলঙ্কারগ্রন্থ ও অজস্র টীকাটিপ্পনী রচিত হয়েছে ; সুতরাং স্থূলভাবে বলা যেতে পারে যে, হাজার বছর ধরে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র বিশেষজ্ঞের দ্বারা অনুশীলিত হয়েছে।

অবশ্য খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর পরে অর্থাৎ আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্ত-মম্মটভট্টের পরে অলঙ্কারশাস্ত্রের মৌলিক আলোচনা কিছু শিথিল হয়ে পড়ে। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। এই সময় থেকে প্রাদেশিক ভাষাসমূহ সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে শুরু করল এবং দান্তের *De Vulgari eloquentia* গ্রন্থের মতো কোন গ্রন্থ ক্লাসিক সংস্কৃত ভাষার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকূল মন্তব্য নিক্ষেপ না করলেও ১২শ শতাব্দীর পর সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অবারিত প্রবাহ কিছু স্তিমিত-বেগ হয়ে পড়ল।[২]

প্রাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে অলঙ্কারশাস্ত্রের স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হয় নি ; পাণিনির (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) পূর্বে কোন গ্রন্থে উপমাদির স্পষ্টতঃ নামোল্লেখ নেই—যদিও উপমা-রূপকাদি অলঙ্কার অনেক পূর্ব থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। ঋগ্বেদে উপমা ও অলঙ্কারের উল্লেখ থাকলেও তাকে অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত উপমা অলঙ্কার বলা যায় না। সেখানে অলঙ্কার অর্থে মণ্ডন এবং উপমা অর্থে সাদৃশ্য বোঝানো হয়েছে। বেদ, উপনিষদ, বেদের টীকা নিঘণ্টু ও নিরুক্তে উপমা প্রভৃতির যা কিছু উল্লেখ আছে, তা প্রধানতঃ বৈয়াকরণ তত্ত্ববিষয়ক। পাণিনিও ব্যাকরণে উপমান, উপমিত, সামান্য, উপমা, উপম্য প্রভৃতিকে ব্যাকরণ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই বিচার করেছেন। অনুমান ব্যাকরণতত্ত্ব থেকেই অলঙ্কারশাস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। আনন্দবর্ধনও স্বীকার করেছেন যে, তাঁর অলঙ্কারতত্ত্ব ব্যাকরণ থেকেই উপচিত হয়েছে। ভামহ, বামন প্রভৃতি বিখ্যাত আলঙ্কারিকগণ তাঁদের অলঙ্কারগ্রন্থে ব্যাকরণের ওপর এক-আধটি অধ্যায় সংযোজিত করেছিলেন। দর্শন ও ন্যায়ের গ্রন্থে শব্দের 'স্ফোটবাদ' আলোচনা করবার সময় সাদৃশ্যবোধক উপমার স্বরূপও আলোচিত হয়েছে।

ভরত থেকেই যথার্থতঃ ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের শুরু। নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ভরত প্রাচীন যুগে মুনি বলে কীর্তিত হয়েছেন।

২ রাজশেখর কিন্তু প্রাকৃত-অপভ্রংশের বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করেছেন।

কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, ভরত খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র' যে আকারে চলছে, তাতে পরবর্তিকালের হস্তক্ষেপচিহ্ন বর্তমান। অনেক পরে অভিনবগুপ্ত এই গ্রন্থের 'অভিনবভারতী' নামক এক টীকা লিখে ভরতকে পরবর্তিকালে জনপ্রিয় করেছিলেন। যদিও বর্তমানকালে প্রচারিত নাট্যশাস্ত্রটি খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর দিকে এই আকার লাভ করেছিল, তবু ভরত যে ভাস ও কালিদাসের পূর্ববর্তী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কালিদাস এঁরই নাট্যশাস্ত্রের সূত্রানুসারে নাটক রচনা করেছিলেন। ভরতের এই গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক হলেও এতে চারটি অলঙ্কার (উপমা, রূপক, দীপক, যমক), দশটি গুণ ও দশটি দোষ আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এতেই সর্বপ্রথম রসের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ", বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়, রসের এই সংজ্ঞা পরবর্তী যুগেও গৃহীত হয়েছে—অবশ্য এ রস নাট্যাভিনয়দর্শনজনিত আস্বাদ্যমান চিত্তবৃত্তি বিশেষ। এই রস কাব্যের রস নয় বলে তাঁকে পরবর্তিকালে নাট্যবিশারদ বলে সম্মান দেওয়া হয়েছে, কাব্যতত্ত্বজ্ঞ বলে নয়। সে যাই হোক, তিনি মোট আটটি রসের কথা বলেছেন—শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর, বীভৎস, হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, ভয়ানক। তাঁর এই মত পরের যুগের সমস্ত আলঙ্কারিক স্বীকার করেছেন, কেউ বা দু-একটি নতুন রস সংযোজিত করেছেন।

সূচনাপর্বের শ্রেষ্ঠ সমালোচক হলেন ভামহ। অবশ্য কেউ কেউ দণ্ডীকে ভামহের পূর্বে স্থাপন করতে চান। কিন্তু অধিকাংশ গবেষক ভামহকে দণ্ডীর পূর্ববর্তী বলেছেন। তিনি খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি বা ৭ম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বর্তমান ছিলেন। ভরতের গ্রন্থে কাব্যতত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে; ভামহ

কাব্যতত্ত্বের ওপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পূর্ব-সূরীদের কাছ থেকে তিনি অনেক জিনিস সংগ্রহ করে নিজের নতুন কথাও যোগ করে দিয়েছেন। এতেই অনুমিত হয় যে, খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর পূর্ব থেকেই কাব্যতত্ত্ব রীতিমতো আলোচিত ও অনুশীলিত হয়েছিল। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কাব্যালঙ্কারে' অলঙ্কারই বেশি আলোচিত হয়েছে। তিনি অলঙ্কার, দোষ, গুণ, বক্রোক্তি প্রভৃতি কাব্যের বহিরঙ্গকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং রস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। তাঁর মতে শব্দ, অর্থ ও অলঙ্কার—এই নিয়েই কাব্য। বলা বাহুল্য তিনি কাব্যবিচারে গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করতে পারেন নি। রস দূরের কথা, 'রীতি'র গুরুত্বও তাঁর অনায়ত্ত ছিল। পরে আরও অনেকে এই অলঙ্কারবাদের বহিরঙ্গে বিচরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে 'কাব্যালঙ্কারসংগ্রহে'র উদ্ভট (৮ম শতকের শেষ বা ৯ম শতাব্দীর প্রথম) ও 'কাব্যালঙ্কারে'র রুদ্রট (৯ম শতাব্দী) অলঙ্কারের প্রাধান্য স্বীকার করেছিলেন।

সৃষ্টির যুগ

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, কোন্ উৎস থেকে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র ধীরে ধীরে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিল। ভরত যদিও নাট্যতত্ত্বের ওপর গ্রন্থ লিখেছিলেন, তবু তিনিই সর্বপ্রথম বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারি-ভাবের দ্বারা রসোৎপত্তির কথা বলেছিলেন। ভামহ গুরুত্ব দিয়েছিলেন কাব্যের শরীরগত মণ্ডনকলার ওপর। এই যে কাব্যের দেহ (অর্থাৎ শব্দার্থ ও অলঙ্কার) এবং আত্মার (রস-নিষ্পত্তি) দ্বৈতলীলা—এটি অলঙ্কারশাস্ত্রের দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ সৃষ্টির যুগে আত্মপ্রকাশ করল। ভামহের পর থেকে আনন্দবর্ধন পর্যন্ত (অর্থাৎ খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর পর থেকে ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগ) অলঙ্কারশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যুগটি বিস্তৃত। এই যুগে এক দিকে অলঙ্কার-তত্ত্বের মণ্ডনকলা, রীতি, মার্গ প্রভৃতি কাব্যদেহের বহিরঙ্গগত রূপনির্মিতির কারুকলা আলোচিত হয়েছে, আর এক দিকে কাব্য-

দেহের অন্তর্লীন যে আত্মা—তারও কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

ভামহের অলঙ্কারবাদ পরবর্তী যুগেও বিশেষ ভাবে অনুসৃত হয়েছে—অলঙ্কারে আসক্ত উদ্ভট ও রুদ্রটের কথা আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। কেউ কেউ উদ্ভটকে রসবাদী বললেও তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহে' অলঙ্কারের প্রাধান্যই স্বীকৃত হয়েছে, রসের কথা স্পষ্টতঃ বলা হয় নি। প্রতীহারেন্দুরাজ এই গ্রন্থের যে টীকা রচনা করেন, তাতে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, হয়তো উদ্ভট রসকেও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেরূপ কোন ইঙ্গিত 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহে' নেই। তাই কেউ কেউ অনুমান করেন, হয়তো উদ্ভট তাঁর অন্য কোন গ্রন্থে[৩] রসের কথা বলেছিলেন, যা আমাদের যুগে এসে পৌঁছয় নি। সে যাই হোক, নতুন কোন প্রমাণ না পেলে আমরা উদ্ভটকে ভামহের পন্থানুসারী বলেই গ্রহণ করব।

রুদ্রট (নবম-দশম শতাব্দী) তাঁর 'কাব্যালঙ্কারে' রস ও রীতির কথা বললেও অলঙ্কার অর্থাৎ শব্দার্থের দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কারণ তিনি রীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাসের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে দু-তিনটি পদের সমাসে পাঞ্চালী, পাঁচ-সাতটি পদের সমাসে লাটীয়া, অনেক পদের সমাসে গৌড়ী আর সমাসহীন পদে রচিত হয় বৈদর্ভী, যা তাঁর মতে সর্বশ্রেষ্ঠ রীতি। রস সম্বন্ধেও তিনি দু-একটি মৌলিক কথা বলেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভামহের পর উদ্ভট ও রুদ্রট অলঙ্কার অর্থাৎ শব্দের মণ্ডনকলাকে গুরুত্ব না দিয়ে পারেন নি।

এর পরে রীতিবাদের প্রবর্তক দণ্ডী ও বামনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'কাব্যাদর্শ'-প্রণেতা দণ্ডী সম্ভবতঃ ৯ম শতাব্দীর কিছু পূর্বে দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কারণ ৯ম শতাব্দীর লোকভাষায় রচিত দক্ষিণ ভারতের একখানি অলঙ্কার-

৩ তিনি 'ভামহবিবরণ' নামক একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন বটে, কিন্তু তা পাওয়া যায় নি।

গ্রন্থে দণ্ডীর উল্লেখ আছে। অবশ্য তাঁর সনতারিখে নানা গোলমাল আছে। কেউ তাঁকে ভামহেরও পূর্ববর্তী যুগে (৬ষ্ঠ শতাব্দী) নিয়ে যেতে চান। তিনি সর্বপ্রথম অলঙ্কারকে কাব্যশোভাকর ধর্ম এবং 'অভীষ্ট-অর্থসংবলিত কাব্যশরীরই কাব্য' ("শরীরং তাব-দিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী"), এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এতে মনে হচ্ছে, তিনিও কাব্যের বহিরঙ্গের দিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রীতি বা মার্গের উদ্ভাবন তাঁর মৌলিক আবিষ্ক্রিয়া। তাঁর মতে রীতি বা রচনাকৌশল দু প্রকার—বৈদর্ভী ও গৌড়ী। তাঁর মতামত থেকে মনে হয়, তাঁরও পূর্ব থেকে রীতির কথা চলে আসছিল; কারণ তিনি রীতি বা মার্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পূর্বতন আচার্যদের কথা উল্লেখ করেছেন।

দণ্ডী-প্রচারিত 'মার্গকে' আরও স্পষ্ট ও প্রধান করে তুললেন 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'র লেখক আচার্য বামন। তিনি সম্ভবতঃ ভবভূতির পরে আবির্ভূত হন, কারণ তাঁর গ্রন্থে ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। ভবভূতি কনৌজের রাজা যশোধর্মের (৮ম শতাব্দীর প্রথম পাদ) ছত্রচ্ছায়াতলে বাস করতেন। তাই মনে হয় বামন ৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি বা শেষে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি "কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ" এবং "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" সে যুগে এবং এ যুগে অতিশয় প্রচার লাভ করেছে। অনেকের অনুমান, এই 'অলঙ্কার' কাব্যের মণ্ডনকলা (rhetoric) নয়; একে কাব্যের সৌন্দর্য বলে অভিহিত করাই উচিত। কাব্য গৃহীত হয় অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের জন্য—বোধ হয় উক্তিটির এই হল নিহিতার্থ। তাঁর রীতিবাদ পরে অতিশয় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল; তিনি দণ্ডীর রীতিকেই অলঙ্কার-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। দণ্ডী মাত্র দুটি রীতির (বৈদর্ভী ও গৌড়ী) কথা বলেছিলেন। বামন তার সঙ্গে 'পাঞ্চালী' রীতিকেও যোগ করে দিয়ে তিনটি রীতির পরিচয় দিলেন। তিনিও দণ্ডীর মতো বৈদর্ভী রীতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছেন। পরবর্তিকালে

আনন্দবর্ধনও বামনের রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। রীতিকে কেন্দ্র করে কোন একটি 'School' গড়ে উঠেছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু ধ্বনিবাদের পূর্বে সবচেয়ে শক্তিশালী মত হল রীতিবাদ। ধ্বনি ও রসের প্রাধান্যের যুগেও রীতি জনপ্রিয়তা থেকে বঞ্চিত হয়নি এবং এ বিষয়ে সকলেই বামনের মত শিরোধার্য করেছিলেন।

এই যুগে রসবাদীরা প্রাধান্য লাভ না করলেও রসের আদর্শ যে অজ্ঞাত ছিল তা মনে হয় না। কারণ ইতিপূর্বে ভরত নাট্য-শাস্ত্রে আট প্রকার নাট্যরসের উল্লেখ করেছেন। যাঁরা অলঙ্কার, রীতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরাও রসের কথা ভুলে থাকতে পারেন নি। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার লোল্লট, শঙ্কুক ও ভট্টনায়ক এই রসবাদ বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য লোল্লট ও শঙ্কুক গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রধানতঃ নাট্যরসের ওপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ভট্টনায়ক ধ্বনি-বাদের বিরোধিতা করলেও ভরতের পন্থা অনুসরণ করে রসকেই কাব্যে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং লোল্লট ও শঙ্কুকের মতো শুধু নাট্যরসের সীমার মধ্যে আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত না করে কাব্যের উদার ক্ষেত্রে রসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যাই হোক আনন্দবর্ধনের পূর্বে রসবাদ খুব কিছু প্রাধান্য অর্জন করতে পারে নি—যদিও ভরতের টীকাকারেরা রসতত্ত্ব নিয়ে অল্পাধিক আলোচনা করেছেন।

অগ্নিপুরাণের ৩৩৬-৩৪৬ অধ্যায়ে অলঙ্কার ও কাব্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। কারো মতে অগ্নিপুরাণ ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর সংগ্রহ এবং ৯ম শতাব্দীর দিকে এতে প্রচুর প্রক্ষেপ প্রবেশ করেছে। কেউ-বা একে পুরোপুরি ৯ম-১০ম শতাব্দীর সংগ্রহ বলতে চান। অগ্নিপুরাণ ৬ষ্ঠ বা ১০ম, যে শতাব্দীতেই রচিত হোক না কেন, এতে প্রচুর প্রক্ষেপ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই—কোন্ পুরাণই বা 'অক্ষত' বিশুদ্ধি দাবি করতে পারে? তবে অগ্নিপুরাণ ধ্বনিবাদের (৯ম শতাব্দী) পূর্বে সঙ্কলিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। কারণ অগ্নিপুরাণে আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদের উল্লেখ নেই, কিন্তু

আনন্দবর্ধন অগ্নিপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। সে যাই হোক, অগ্নিপুরাণের যে সঙ্কলক কাব্যতত্ত্ববিষয়ক অধ্যায়-গুলি লিখেছিলেন, তিনি প্রধানতঃ ভরত ও ভামহ-দণ্ডী থেকে মতামত ও শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যালোকে'র ("অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতি। যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে॥") শ্লোকটি অগ্নিপুরাণ থেকেই উদ্ধৃত করেছেন। অগ্নিপুরাণের কাব্যতত্ত্বে খুব বেশি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নেই, উক্ত সঙ্কলক তাঁর কালের কাব্যবিষয়ক বিভিন্ন মতগুলিকে এক জায়গায় সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

পূর্বে আমরা আলোচ্য যুগকে সৃষ্টির যুগ বলেছি। রীতিবাদ এই সৃষ্টিযুগের গোড়ার দিকে মৌলিক সাহিত্যচিন্তা বলে গৃহীত হতে পারে, কিন্তু এই যুগের শেষাংশেই তত্ত্ব ও চিন্তায় যে মৌলিকতা দেখে গেছে, ভারতের সহস্রবর্ষব্যাপীবিস্তৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের ইতিহাসে কোথাও তার অনুরূপ তুলনা মিলবে না। এই যুগের শেষভাগে অর্থাৎ ১০ম শতাব্দীর শেষে আনন্দবর্ধন কর্তৃক ধ্বনিবাদ বা ব্যঞ্জনাতত্ত্ব প্রচারিত হয় এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মোড় ঘুরে যায়। ধ্বনিবাদ প্রথমে বিশেষ জনপ্রিয় হতে না পারলেও পরে রসবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন প্রাধান্য অর্জন করে যে, সে যুগের শিষ্টজনেরা ধ্বনিবাদের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে পড়েন। সেইজন্য অনেকে সংস্কৃত সমালোচনাকে ধ্বনিবাদের ভিত্তিতেই বিভক্ত করতে চান। তাঁদের মতে ধ্বনিবাদের প্রথম প্রচারক আনন্দবর্ধনকে কেন্দ্র করে, তাঁর পূর্ববর্তী যুগকে প্রাক্‌ধ্বনির যুগ, তাঁর যুগকে ধ্বনির যুগ এবং পরবর্তিকালকে উত্তর-ধ্বনির যুগ—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা উচিত।

কাশ্মীররাজ অবন্তীবর্মার (খ্রীঃ ৮৫৫-৮৪) অন্যতম সভারত্ন 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের রচনাকার আনন্দবর্ধন ৯ম শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। ৯ম শতাব্দীর শেষে বা ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'য়

আনন্দবর্ধনের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আনন্দবর্ধনের কাল নিরূপণ অপেক্ষাকৃত সহজ। তাঁর 'ধ্বন্যালোক' দুভাগে বিভক্ত। এর প্রথমাংশের নাম 'কারিকা' বা শ্লোকসংগ্রহ। দ্বিতীয়াংশের নাম 'বৃত্তি' বা ব্যাখ্যা। এই বৃত্তিটুকু আনন্দবর্ধনের রচিত এবং এটি প্রথমাংশের ব্যাখ্যা। এই কারিকা কার লেখা জানা যায় না। আনন্দবর্ধন তাঁকে 'ধ্বনিকার' বলে উল্লেখ করেছেন। অজ্ঞাতনামা লেখকের কারিকাকে আনন্দবর্ধন অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও মনীষার দ্বারা বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যা করে ধ্বনিবাদকে রসিকসমাজে সুপ্রচারিত করেন। জাকোবি (Jacobi) নানা তথ্য থেকে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে, এই কারিকাকার[৪] নাকি কাশ্মীর-রাজ ললিতাপীড়ের (৭৮০-৮১৩) সময়ে বর্তমান ছিলেন। এ সম্বন্ধে নানা বাদপ্রতিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। মোট কথা যিনি সর্বপ্রথম শ্লোকে ধ্বনির কথা প্রচার করেন তাঁর কোন পরিচয়ই জানা যায় নি। মনে হয় তিনি এই মতের আবিষ্কর্তা নন, তাঁরও পূর্ব থেকে পরম্পরাক্রমে ধ্বনিবাদের আলোচনা চলে আসছিল। বাচ্যাতিরিক্ত ধ্বনিবাদ বা ব্যঞ্জনার জনকত্ব যাঁরই প্রাপ্য হোক না কেন, আনন্দবর্ধনই ব্যাখ্যার দ্বারা ধ্বনির কারিকার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য তিনি তিন রকমের ধ্বনির কথা বলেছিলেন : বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি ও রসধ্বনি। পরবর্তিকালে এই মতের বিখ্যাত আচার্য অভিনবগুপ্ত রসধ্বনির ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে রস ও ধ্বনির সম্পর্ককে অচ্ছেদ্য করে তোলেন।

প্রতিষ্ঠার যুগ

ভারতীয় অলঙ্কারতত্ত্ব, বিশেষতঃ ধ্বনিবাদ, ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ১১শ শতকের মধ্যভাগ ;—মোট দু শ বছরের মধ্যে রসিক-সমাজে অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব অর্জন করে। এর পূর্বে ধ্বনিবাদ

[৪] কারও মতে কারিকা-কারের নাম নাকি সহৃদয়। কিন্তু এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। য়ুরোপের *Pseudo Longinus* ও এই কারিকাকারের মধ্যে এই ব্যাপারে খানিকটা সাদৃশ্য আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে *Longinus* প্রসঙ্গে এ কথার আলোচনা করা হয়েছে।

শুধু ব্যাখ্যাত হয়েছিল, এবং বলাই বাহুল্য আনন্দবর্ধনের সমকালে এবং তার পরেও অনেকেই এই মতের সারবত্তা স্বীকার করেন নি। যাঁরা অলঙ্কার ও রীতিকেই প্রাধান্য দিতেন তাঁদের পক্ষে বড় জোর রসবাদ মেনে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু ধ্বনির মতো সূক্ষ্মতত্ত্বে অনুপ্রবেশ খুব সহজ নয়। যাই হোক, প্রসিদ্ধ শৈব দার্শনিক কাশ্মীর-অধিবাসী অভিনবগুপ্ত ১০ম শতাব্দীর গোড়াতে আবির্ভূত হন। তিনি আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোকে'র "লোচন" নামক টীকা রচনা করে ধ্বনিবাদের মর্যাদা এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন যে, পরবর্তিকালে এর বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রতিকূল মন্তব্য উৎক্ষিপ্ত হলেও কেউ আর ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্যে হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি। অভিনবগুপ্ত ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ওপর 'অভিনবভারতী' নামক একখানি উপাদেয় টীকা রচনা করেছিলেন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও কাব্যরসিক ছিলেন, ফলে তাঁর দ্বারা ধ্বনিবাদ স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। তিনি অবশ্য ধ্বনি বলতে রসধ্বনিকেই নির্দেশ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত রসে এসেই তাঁর তত্ত্বালোচনা নিবৃত্তি লাভ করেছে। "রসেনৈব সর্বং জীবতি কাব্যম্"—এই হল তাঁর শেষ কথা। অর্থাৎ অভিনবগুপ্তের সময় ধ্বনি ও রসের রাজযোটক মিল হল এবং সে পরিণয়কার্য সমাধা করলেন স্বয়ং আচার্যপ্রবর অভিনবগুপ্ত। এর পর রস ও ধ্বনি পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলেছে।

অভিনবগুপ্তের পরে মম্মটভট্ট (১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ১২শ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্ত) 'কাব্যপ্রকাশে' অভিনবগুপ্তের পথ ধরে ধ্বনিবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে ধ্বনিতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আরও অগ্রসর হয়েছিল। তিনি ধ্বনিকে বিশ্লেষণ করে তিন রকম কাব্যের কথা বলেছিলেন। যাতে বাচ্যার্থের চেয়ে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রবল, তার নাম ধ্বনিকাব্য, যেখানে বাচ্যার্থের চেয়ে ব্যঙ্গ্যার্থ গৌণ, তাকে বলে গুণীভূতব্যঙ্গ্য, এবং যে কাব্যে গুণ ও অলঙ্কার থাকলেও ব্যঞ্জনা নেই,

তাকে তিনি চিত্রকাব্য বলেছেন। তাঁর মতে অনলঙ্কৃত বাক্যও কাব্য হতে পারে।

অবশ্য মম্মটভট্টের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সত্ত্বেও কেউ কেউ ব্যঞ্জনার বিরোধিতা করেছিলেন। ১১শ শতকের শেষের দিকে আবির্ভূত কুন্তক (কুন্তল) তার 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে বক্রোক্তিকেই কাব্যের প্রাণ বলেছেন; একাদশ শতকেব মধ্যভাগে মহিমভট্ট 'ব্যক্তিবিবেকে' রসতত্ত্বের কথা স্বীকার করেও ধ্বনিবাদের স্বতন্ত্র গৌরব মেনে নিতে পারেন নি। ১১শ শতকের শেষভাগে রচিত 'শৃঙ্গারতিলকে' প্রধানতঃ রসশাস্ত্রের ভিত্তিতে কাব্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। 'দশরূপকে'র গ্রন্থকার ধনঞ্জয় এবং তাঁর ভাই ধনিক (১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগ) প্রধানতঃ রসবাদী ছিলেন; এঁরাও ধ্বনিবাদ মেনে নিতে পারেন নি। ধনঞ্জয়ের মতে পাঠক কর্তৃক আস্বাদ্যমান স্থায়ী ভাবই রসে পরিণত হয়। ধ্বনি বলে অতিরিক্ত কিছু নেই। মালবাধিপতি ভোজরাজ 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' গ্রন্থে গুণ, অলঙ্কার ও রসকে স্বীকৃতি দিলেও ধ্বনিকে মানতে পারেন নি।

এই সমস্ত আলোচনায় দেখা যাবে যে, অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসের তৃতীয় পর্বে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার যুগে কেউ কেউ ধ্বনির স্বতন্ত্র মর্যাদা ও যৌক্তিকতা স্বীকার না করলেও অভিনবগুপ্ত ও মম্মটভট্ট আনন্দবর্ধনের মতকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সামান্য বিরোধিতা সত্ত্বেও ধ্বনিবাদকে কেউ আর বাধা দিতে সমর্থ হন নি।

বিচারবিতর্কের যুগ

সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিশেষ কোন মতবাদ ও তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর একটা দীর্ঘ বিরতি বা শূন্যতা সৃষ্টি হয়; সেই শূন্যতাকে টীকাটিপ্পনী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির দ্বারা ভরিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়। য়ুরোপে গ্রীকরোমান সাহিত্যতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত

হবার পর অনেক দিন কোন মৌলিক চিন্তাধারার সাক্ষ্য পাওয়া যায় নি—শুধু প্রাচীন আচার্যদের গ্রন্থের ভূরিপরিমাণ টীকা-ব্যাখ্যা রচিত হয়েছিল। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীর পর থেকে খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত—প্রায় সাতশ বছর ধরে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে প্রচুর গ্রন্থ ও টীকাভাষ্য রচিত হয়েছে, কিন্তু দু-একখানি ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও প্রশংসনীয় রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই বিচারবিতর্কের যুগ শুরু হয়েছিল ধ্বনিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে। মূলতঃ মম্মটভট্টের পর থেকে জগন্নাথ পর্যন্ত এই দীর্ঘ বন্ধ্যা যুগ প্রসারিত। ১২শ শতকের রুয্যক (কাব্য-প্রকাশের টীকা 'কাব্যপ্রকাশসঙ্কেত' ও 'অলঙ্কারসর্বস্বে'র লেখক), প্রথম বাগ্‌ভট ('বাগ্‌ভটালঙ্কার') এবং হেমচন্দ্র ('কাব্যানুশাসন') বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিতে পারেন নি। রুয্যক তাঁর 'অলঙ্কারসর্বস্বে' অলঙ্কারের স্বরূপ সম্বন্ধে নিপুণ আলোচনা করেছেন। বাগ্‌ভট ও হেমচন্দ্র কখনও ধ্বনি, কখনও-বা রস সম্বন্ধে পুরাতন পন্থার অনুসরণে কিছু আলোচনা করেছিলেন। ১৩শ শতাব্দীর দ্বিতীয় বাগ্‌ভট, জয়দেব প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ অর্থালঙ্কার নিয়েই অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন। কাব্য সম্বন্ধে এঁরাও গভীর অনুভূতি ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি। কেবল ১৪শ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত 'সাহিত্যদর্পণ'-কার বিশ্বনাথের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আলাউদ্দিন খিল্‌জীর (১৩১৫ সালে মৃত্যু) সময়ে বর্তমান ছিলেন। কারণ তিনি তাঁর গ্রন্থের এক স্থলে 'অল্লাবদীন'-এর নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি মম্মটভট্টের ওপর বেশি নির্ভর করেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" কাব্যের সংজ্ঞারূপে আধুনিক কালেও সসম্মানে গৃহীত হয়েছে। তিনি ধ্বনিকে স্বীকার করলেও প্রধানতঃ রসের গৌরব-প্রচার করেছেন। পরবর্তী যুগে তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ'

নবীন পাঠার্থীদের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ হয়েছিল। ১৯শ শতাব্দীতে ইংরাজীশিক্ষিতেরা অন্য আলঙ্কারিকের কোন খোঁজ না রাখলেও 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথের নাম জানতেন।

এর পরে বাঙলা দেশে ১৬শ শতাব্দীতে দুজন বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের নাম উল্লেখযোগ্য। কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী কবিকর্ণপুর (পরমানন্দ সেন) এবং রামকেলি-নিবাসী রূপগোস্বামী বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তিতে একটু নতুন ভাবে রসতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। কবিকর্ণপুরের 'অলঙ্কারকৌস্তভে' (১৬শ শতাব্দীর শেষে রচিত) ভক্তিধর্মের পটভূমিকায় অলঙ্কার ও রসতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ভক্তিরসাত্মক অলঙ্কারগ্রন্থ। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিখ্যাত জীবগোস্বামী 'লোচনরোচনী' নামক এর একখানি টীকা রচনা করেন। রূপগোস্বামীর 'নাটকচন্দ্রিকা'য় নাট্যলক্ষণ ও নাট্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবদার্শনিক বলদেব বিদ্যাভূষণের 'কাব্যকৌস্তুভ', 'সাহিত্যমীমাংসা' প্রভৃতি গ্রন্থ বৈষ্ণব ভক্তসমাজে সুপরিচিত। এঁরা প্রধানতঃ অলঙ্কার, ধ্বনি ও রস নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এঁদের অলঙ্কারগ্রন্থে ভক্তিকে রসের পর্যায়ে আলোচনা করে ভক্তিরসকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তিকালে 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে বিবৃত কাব্যতত্ত্ব ও রসপর্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পরিশেষে অলঙ্কারশাস্ত্রের সর্বশেষ জ্যোতিষ্ক ১৭শ শতাব্দীতে আবির্ভূত জগন্নাথের নাম উল্লেখ করে এই প্রস্তাব সমাপ্ত করা যাচ্ছে। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী জগন্নাথ ১৭শ শতাব্দীতে দারাশেকোর সময়ে বর্তমান ছিলেন; তিনি দারার গুণকীর্তন করে 'জগদাভরণ' নামক একখানি কাব্যও লিখেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থের নাম 'রসগঙ্গাধর'। এতে তিনি আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের অনুরূপ তীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে পূর্বসূরীদের অনেক মতামত খণ্ডন করেছেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজ মত

প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর প্রদত্ত কাব্যসংজ্ঞা—"রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্"—কাব্য হল সুন্দর-অর্থযুক্ত শব্দ। তিনি রসকে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার না করে "লোকোত্তর-আহ্লাদজনক-জ্ঞানগোচরতা"কেই কাব্যের লক্ষণ বলে ধরেছিলেন। রস থেকে কাব্যের আনন্দ আসতে পারে, আবার রসব্যতিরিক্ত শব্দগ্রন্থনা থেকেও কাব্যানন্দ লাভ হতে পারে। বলতে গেলে জগন্নাথই সর্বপ্রথম অলঙ্কারশাস্ত্রে আধুনিক মনোভাব প্রয়োগ করে কাব্য বিচার করেছেন। অলঙ্কার নয়, ধ্বনি নয়, রস নয়—সৌন্দর্যই কাব্যের প্রাণ—এই হল তাঁর মূল বক্তব্য। প্রদীপ নিভবার আগে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসে যবনিকা নামবার আগে 'রসগঙ্গাধরে'র গ্রন্থকার জগন্নাথ শেষবারের মতো তাঁর বুদ্ধির মণিদীপবিচ্ছুরিত কিরণমালার তির্যকতা সৃষ্টি করে বিলীন হয়ে গেলেন। তারপরে প্রাদেশিক সাহিত্যের বিকাশ হল, সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যতত্ত্ব আতপ্ত জীবনরসের প্রসাদবঞ্চিত হয়ে গবেষকের আলোচ্য বস্তুতে পরিণত হল। ১৯শ শতাব্দীতে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহে য়ূরোপীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রভাবে সমালোচনায় বিষয়বস্তু ও দর্শনভঙ্গী সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকা গ্রহণ করে নতুন পথে যাত্রা করেছে।

নয়

॥ বাংলা সাহিত্যবিচারের খসড়া ॥

ভূমিকা

রিপ্ ভ্যান উইঙ্কলের মতো ভারতবর্ষের কোন মধ্যযুগীয় কবি যদি গোটা চারেক শতাব্দীর ঘুমসায়র পার হয়ে অকস্মাৎ আধুনিক ভারতবর্ষের সাহিত্যপ্রাঙ্গণে উপনীত হন, তা হলে তিনি ইদানীন্তন সাহিত্য ও তার বাণীমূর্তি দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়বেন। মধ্যযুগেও তো কাব্যনাট্যাদি কতই রচিত হয়েছে, কিন্তু রচিত কাব্য সম্বন্ধে কাব্য সৃষ্টি করার রেওয়াজ সে যুগে ছিল না। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনধারার সংস্পর্শে এসে সারা ভারতের তাবং নব্য সাহিত্য একটা নতুন সম্পদ লাভ করেছে; তা হল সমালোচনাসাহিত্য, যার অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, গুজরাটী, মারাঠী সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ। ১৯শ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় সাহিত্যসমালোচনার প্রভাবে ভারতের আধুনিক ভাষাতে নিজস্ব সাহিত্যবিচারপদ্ধতি গড়ে উঠেছে। অবশ্য নব্য রেনেসাঁসের আদ্যাপীঠ কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সমালোচনার সূত্রপাত হয়। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য জীবনরস আহরণ করেছে প্রধানতঃ বাংলা থেকেই। বাংলা সাহিত্যে যথার্থ সমালোচনা শুরু হয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য সাহিত্যে (হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি) সমালোচনা সাহিত্যশাখা হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে অনেক পরে, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের একটু আগে। বলতে গেলে হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি সাহিত্যে সাহিত্যবিচার শুরু হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবকাশেই উত্তরাপথের প্রাদেশিক ভাষায় সমালোচনা-সাহিত্য প্রাধান্য অর্জন করেছে। বাংলা সমালোচনা তার অর্ধ

শতাব্দী আগে আসর জাঁকিয়ে বসেছিল। সম্প্রতি হিন্দী সাহিত্য-বিচারে 'ছায়াবাদ', 'প্রগতিবাদ', 'প্রয়োগবাদ'—ইত্যাদি দক্ষিণ ও বামপন্থী মতবাদ, মীস্টিক তত্ত্ব ও মার্কস্‌বাদ, বাস্তবতা ও রোমান্টিকতা, আধুনিকতা ও নব্য ক্লাসিকতা প্রভৃতি নানা আন্দোলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওড়িয়া সাহিত্যে ১৯০৩ সালে গোপবন্ধু দাস ও তাঁর সহকারীদের প্রচেষ্টায় 'সত্যবাদী' নামক সত্যসন্ধ সাহিত্য-বাদের উৎপত্তি হয়। অবশ্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র প্রভাবে তরুণ ওড়িয়া সাহিত্যিকগোষ্ঠী "সবুজ" দল ওড়িয়া সাহিত্যে আধুনিক মনোভাবকে স্থায়ী করবার চেষ্টা করছেন। এই আধুনিকতা প্রসঙ্গে বাঙালী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের প্রভাব তরুণ ওড়িয়া সাহিত্যিকেরা এখনও স্বীকার করে থাকেন। মারাঠী কাব্যেও 'রবিকিরণমণ্ডল' নামক কবিগোষ্ঠী এবং 'নাট্যমন্বন্তর' নামক নাট্যগোষ্ঠী নতুন ভাবে সাহিত্যবিচার শুরু করেছেন। অতি আধুনিক কালে হিন্দী, মারাঠী, ওড়িয়া, আসামী এবং দক্ষিণী সাহিত্যে মার্কসীয় মতবাদের অতিপ্রাধান্য দেখা যাচ্ছে—যা প্রগতিবাদ নামে পরিচিত হয়েছে। ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান এবং মার্কসের বস্তুদর্শন এখন প্রায় সমস্ত আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে নব্য লেখকের চিত্ত আকর্ষণ করেছে। অবশ্য এর বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়েছে। রোমান্টিকতা, প্রতীকতা, ভক্তিবাদ, নব্যক্লাসিকতা, জাতীয়তা ইত্যাদির প্রাচীর তুলে এই মনো-বৈজ্ঞানিক ও বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য ও সাহিত্যবিচারের মূল্যমানকে বাধা দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এ যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে?

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যসমালোচনা

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যবিচার বলতে যা বোঝায় তার বিশেষ কোন প্রসঙ্গ থাকার কথা নয়। য়ুরোপীয়

সাহিত্য ও আদর্শের প্রভাবেই বাংলা সমালোচনার উদ্ভব হয়, সুতরাং উনিশ শতকের পূর্বে যে সমালোচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না, তা তো স্বাভাবিক। মধ্যযুগে সারা ভারতেই সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের বহু টীকাটিপ্পনী লেখা হয়েছিল। বাঙলা দেশেও তার অন্যথা হয় নি। চৈতন্যভক্তগণ সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের অনুকূলে নতুন করে ব্যাখ্যা শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে রূপগোস্বামীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' নামক দুখানি গ্রন্থে রূপগোস্বামী সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের রসতত্ত্বকে (বিশেষতঃ শৃঙ্গার রস) ভক্তির গঙ্গোদকে সিঞ্চিত করে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। কবিকর্ণপুরের 'অলঙ্কার-কৌস্তুভ', কবিচন্দ্রের 'কাব্যচন্দ্রিকা', রূপগোস্বামীর 'নাটকচন্দ্রিকা' মূলতঃ অলঙ্কারগ্রন্থ হলেও এঁদের প্রথম দুটিতে বৈষ্ণব মনোভাব আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। এঁদের গ্রন্থে ব্যাখ্যাত রসতত্ত্ব, ভক্তিবাদ নায়ক-নায়িকাপ্রকরণ প্রভৃতি পরবর্তিকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যে একমাত্র আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

মধ্যযুগীয় বাঙালী কবিরা সমালোচনার বিশেষ ধার ধারতেন না। ঈশ্বর-প্রত্যাদেশের দোহাই পেড়ে প্রায় সকলেই লেখনী ধারণ করতেন; তাঁদের কাব্যপ্রবন্ধ মূলতঃ ধর্মীয় বাতায়নতলেই উপস্থাপিত হত। সুতরাং রচিত কাব্যের ভালমন্দের বিশ্লেষণ বাহুল্য মনে হত। অবশ্য কোন কোন কবি পূর্বসূরীদের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করতেও ছাড়তেন না। 'পদ্মাপুরাণে'র কবি বিজয়গুপ্ত উক্ত কাব্যের আদিকবি (?) কানা হরিদত্তের প্রতি তীব্র মন্তব্য করে লিখেছেন—

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত॥

'মূর্খ কানা হরিদত্তে'র কাব্য কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গেলে দেবী মনসার প্রত্যাদেশে বিজয়গুপ্ত নতুনভাবে কাব্য লিখতে আরম্ভ করেন। কোন কোন কবি কিছু কিছু কাব্য ও কবির নাম উল্লেখ

করেছেন। পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী নামক অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের এক কবি তাঁর 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কবিচন্দ্র, বৈষ্ণব কবি ও ভারতচন্দ্রের উল্লেখ করেছেন।[১] তবে ভারতচন্দ্রই বোধহয় মধ্যযুগের শেষভাগে সর্বপ্রথম সাহিত্যবিচারের মনোভাবটি পেয়েছিলেন। তিনি প্রধানতঃ শাব্দিক কবি; শব্দের বর্ণাঢ্য চাতুরী এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের এরকম তীব্র তীক্ষ্ণতা মধ্যযুগে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি বাংলা ভাষায় 'যাবনী মিশাল' শব্দ ব্যবহারের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ভারিভারি সংস্কৃত শব্দ সাধারণে বুঝবে না, "অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।" কারণ তাঁর মতে—

প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
সে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥

তাঁর এই মত বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। রাজশেখরের 'কর্পূর-মঞ্জরী' নামক প্রাকৃত নাটকে ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে। তাঁরও মতে রসময়তাই কাব্যের প্রধান লক্ষণ— "ভাষা জা হোদু সা হোদু" (ভাষা যাই হোক)। বৈষ্ণব কবিদের রসতত্ত্ব অথবা বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ—যার প্রভাবেই হোক, বাংলার মধ্যযুগীয় সাহিত্যে 'রসই কাব্যের প্রাণ'—এই রকম একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ—প্রাগ্‌বঙ্কিম যুগ

১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য প্রভাব বাঙালীর জীবন, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এমন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করল যে, এই শতাব্দীর মাঝখানে পৌঁছবার আগেই বাংলা সাহিত্যের বস্তু-উপাদান, রচনারীতি ও ভাবাদর্শের সম্পূর্ণ মূল্যপরিবর্তন হল। উনিশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যে সাময়িক পত্র, রামমোহন, ডিরোজিও-পন্থী, ভবানীচরণ ও ধর্মসভা, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও

১ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম), ২য় সং, পৃঃ ৭০৭

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা এবং বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ফলে উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বৎসরেই বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও দুর্নিবার প্রাণশক্তি দেখা দিল। 'সংবাদপ্রভাকর', 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা শুরু হল। কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্যক পরিচয় আমাদের দেশের অনেকেই রাখেন না, তাই তাঁকে কেউ কেউ প্রগতিবিরোধী বলে থাকেন। কথাটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ঈশ্বর গুপ্তের সাপ্তাহিক ও দৈনিক 'সংবাদপ্রভাকরে' প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হত। তিনি নিজেও পয়লা বৈশাখের মাসিক 'সংবাদপ্রভাকরে' যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতেন তাতেও তৎকালীন সাহিত্যের একটা সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ পরিচয় থাকত। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা—তিনিই সর্বপ্রথম ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালাদের প্রামাণিক জীবনী ও কাব্যসংগ্রহ-প্রকাশে অগ্রণী হয়েছিলেন। তাঁকে সমালোচকের গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাঁকে ঘিরেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পালেরা (রঙ্গলাল, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু প্রভৃতি) একটা সাহিত্যমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন। সেদিন থেকে হোগলকুঁড়িয়ার এই অশিক্ষিত কবি ও সম্পাদক শ্রদ্ধার যোগ্য হয়েছেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সমালোচনার নতুন দিগন্ত আবিষ্কৃত হল। এর পূর্বে সমালোচনার কোন মূল্যমান স্থির হওয়া দূরের কথা, সমালোচনা বলতে কি বোঝায়, তার সুস্পষ্ট ধারণা লেখক-পাঠক কারোরই ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগের অল্প পরে রঙ্গলাল ('বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ', ১৮৫৪), রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ('বিবিধার্থসংগ্রহে' প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ) এবং বিদ্যাসাগরই ('সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব', ১৮৫৩) সর্বপ্রথম সাহিত্যের রূপ, রীতি, তত্ত্ব প্রভৃতির সার্থকতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। ইংরেজী সাহিত্যে

কৃতবিদ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুস্তিকায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পক্ষ সমর্থন করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্যে অশ্লীলতা এবং অন্যান্য গুণাগুণ প্রভৃতির তুলনামূলক আলোচনা করেন। রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থসংগ্রহে'র প্রায় প্রতি সংখ্যায় য়ুরোপীয় রীতিতে সাহিত্যবিচার শুরু করেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক ক্ষুদ্র বক্তৃতাকে ঈষৎ পরিমার্জিত করে প্রকাশ করেন। এটি ভারতীয়ের লেখা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস। বিদ্যাসাগর এই পুস্তিকায় আপ্তবাক্য ও মহাকবি-প্রোক্তির প্রতি অহেতুক ভক্তি বর্জন করে য়ুরোপীয় সমালোচনার রীতি অনুসারে সংস্কৃত ঋষি-কবিদের রচনার মধ্যেও অনেক অসঙ্গতি আবিষ্কার করেছিলেন। অনেকটা তাঁর আদর্শেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৫৪ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় 'মাসিক পত্রিকা' নামক একখানি ক্ষীণকলেবর পত্রিকা প্রকাশিত হল শুধু বালকবালিকা ও অন্তঃপুরিকাদের জন্য। সুতরাং সহজবোধ্য ভাষায় এটি প্রকাশিত হত। এই দুজনে সর্বপ্রথম সদম্ভে ঘোষণা করেন যে, সমাজকল্যাণ, স্ত্রীশিক্ষা প্রচার প্রভৃতি উদ্দেশ্যমূলক লক্ষ্যই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র (১৮৭২) আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সমালোচনার এই সামান্য দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে যে, তখনও সমালোচনার তত্ত্ব ও আদর্শ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা জন্মায় নি। তবে এই যুগের অকিঞ্চিৎকর রচনাগুলি থেকে এইটুকু লক্ষণীয় যে, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির স্বল্পপরিসর রচনায় সাহিত্যবিচার-ঘটিত নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে এবং তাঁরা কিয়দংশে য়ুরোপীয় মতের অনুরূপ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, দু রকম রীতির দ্বারাই সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

বঙ্কিমপর্ব

১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে বাংলা সমালোচনাসাহিত্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিল। এর পরও উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন সাহিত্য-সাম্রাজ্যের মুকুটহীন সম্রাট। তিনি উনিশ শতকের ৭ম দশক থেকে শেষভাগ পর্যন্ত, প্রায় তিরিশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্য ও সমালোচনার দিক নির্দেশ করেছেন; এমন কি রবীন্দ্রপর্বের গোড়ার দিকেও তাঁর প্রভাব বিশেষ খর্ব হয় নি। ইংরেজী সমালোচনাসাহিত্যে স্যর ফিলিপ সিড্‌নে, ড্রাইডেন, কোল্‌রীজ ও ম্যাথু আর্নল্ড যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও বাংলা সমালোচনায় অনুরূপ ভূমিকা অধিকার করে আছেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রে ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৭৮ সাল—প্রায় ছ-সাত বছর ধরে তিনি আটটি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন, যা পরে তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধে' সঙ্কলিত হয়েছিল।[২] এ ছাড়াও তিনি নানা প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু, প্যারীচাঁদ প্রভৃতি তদানীন্তন কবি ও লেখক সম্বন্ধে অনেক মৌলিক আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন—"রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিমচন্দ্র একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গ সাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।" অভ্রান্ত ও নিষ্কাম মনের অসংশয় ও যৌক্তিক আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যবিচারের দুর্গম পথে অবলীলাক্রমে চলতে সাহায্য করছে। প্রাচীন কবিদের তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি সর্বপ্রকার ভক্তি ও সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন; তাই কালিদাস ও ভবভূতির নাটক বিচার করে তার মধ্যে ত্রুটি আবিষ্কার করতেও তিনি অনুৎসাহিত বোধ করেন নি। অপরদিকে

২ এই প্রবন্ধগুলির নাম : উত্তরচরিত (১২৭৯ বঙ্গাব্দ), গীতিকাব্য (১২৮০), বিদ্যাপতি ও জয়দেব (১২৮০), শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা (১২৮২), আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প (১২৯১), দ্রৌপদী (১২৮২), বাংলার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন (১২৯১), বাঙ্গালাভাষা (১২৮৫)।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম) গ্রন্থে ভবভূতি শূদ্রক প্রভৃতিকে ভক্তি-প্রশংসার বিল্বদলে অভিষিক্ত করেছেন। শেকস্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে যে ভাবে উদ্দীপিত করেছিল, সংস্কৃত সাহিত্য সেভাবে তাঁকে আনন্দ দিতে পারে নি। তদানীন্তন যুগপ্রভাবে তিনি উত্তাল জীবনসমুদ্রের লবণাক্ত ঢেউ নিতেই অভিলাষী হয়েছিলেন ; কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবির নন্দনকাননে বিশ্রম্ভালাপ তাঁর মনঃপূত হয় নি। (সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর মনেও প্রশ্ন জেগেছিল। তাঁর উক্তিটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বহুদূরসঞ্চারী—"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতি শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।") যে-বঙ্কিম নব্য হিন্দুধর্ম প্রচারের প্রধান উদ্‌গাতা, তিনি সাহিত্যে নীতিবাদকে কথঞ্চিৎ স্বীকার করেও এখানে যেভাবে সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাতে তাঁকে পুরোপুরি নীতিবাদী বলে অপাংক্তেয় করা উচিত নয়। যাই হোক তাঁর সাহিত্যবিষয়ক মতামত আজ আমরা স্বীকার করি আর নাই করি, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তিনিই সর্বপ্রথম সমালোচনাকে অবজ্ঞার অনাদর থেকে উদ্ধার করে তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথম যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ ও বিচারপ্রণালীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘিরে একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল ; এই গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত এবং 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার', 'সাধারণী', 'নবজীবন' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। বঙ্কিমচন্দ্রের

সাহিত্যাদর্শ ও সমালোচনারীতিকে এঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এক বিষয়ে ডক্টর জনসনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সার্থকভাবে তুলনীয়। জনসন-চক্রের ওপরে জনসনের যেমন একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, ঠিক তেমনি তদানীন্তন লেখকদের ওপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবও সুদৃঢ় ভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। তবে জনসন সাহিত্যবিচারে মাঝে মাঝে অহেতুক উষ্মা প্রকাশ করতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা এ বিষয়ে অনেকটা দোষমুক্ত। আর এক বিষয়ে তাঁর প্রগতিশীল মনোভাব স্মরণীয়। শেষ জীবনে তিনি নব্যহিন্দুধর্মের প্রচারকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তার সমালোচনায় এই ধরনেব হিন্দুয়ানী ভাব নেই। পরবর্তিকালে তাঁর সাহিত্যশিষ্যদের মধ্যে নীতি, ধর্ম, আদর্শ, হিন্দুযানি প্রভৃতির প্রভাব উগ্র হয়ে উঠলেও গুরুর সমালোচনা এই ব্যাধি থেকে অনেকটা নির্মুক্ত ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগই এই প্রতিক্রিয়াশীল উগ্রতা থেকে তাঁকে রক্ষা করেছে। তাঁর প্রায় সমকালে আবির্ভূত রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮) নামক পুস্তিকায় স্বাদেশিকতার ওপর অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। কিন্তু তার 'বিবিধপ্রবন্ধে' (১৮৮২) প্রকাশিত মন্তব্যগুলি এই ধরনের জাতীয় বা ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা থেকে অনেকটা মুক্ত। রমেশচন্দ্র দত্তের ইংরেজিতে লেখা *The Literature of Bengal* (*1877*) গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্র এতে শুধু বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক পরিচয়ই লিপিবদ্ধ করেন নি, প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মূল্যবিচার প্রসঙ্গে তিনি প্রধানতঃ পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র—উভয়েই সংস্কৃত সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন, কিন্তু কেউই সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন নি—এইটি বঙ্কিমপর্বের বিশেষ লক্ষণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে এবং রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়স পর্যন্ত বঙ্কিম-নির্ধারিত সমালোচনা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর

শিষ্যেরা, যাঁরা প্রধানতঃ বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং যাঁরা তাঁর ঠিক চিহ্নিত শিষ্য ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ('সাহিত্যমঙ্গল', ১৮৮৮), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ('সারস্বতকুঞ্জ', ১৮৮৮), চন্দ্রনাথ বসু ('শকুন্তলাতত্ত্ব', ১৮৮১; 'বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি', ১৮৯৯) পূর্ণচন্দ্র বসু ('সাহিত্যচিন্তা', ১৮৯৭)[৩] —এঁরা বঙ্কিম প্রভাবকে প্রায় সর্বতোভাবে স্বীকার করেছিলেন। অনেক সময় 'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী' হয়ে ওঠে। এরাও বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে সমালোচনার রীতিপ্রকরণ গ্রহণ করলেও সিদ্ধান্ত ও মন্তব্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার হানিকর পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের প্রায় সকলেই জাতীয়তার আবেগ ও হিন্দুয়ানির রুদ্ধ বাতায়ন থেকে সাহিত্য বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এঁদের প্রভাব রবীন্দ্র-যুগের প্রথম পর্বেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যাভিসারী ও রসবাদী সমালোচনা এবং প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর সংস্কারমুক্ত মননশীল বিচারপদ্ধতির প্রভাবে বঙ্কিমগোষ্ঠীর আদর্শবাদী ও হিন্দুয়ানি-ভাবে ভরা সমালোচনা অল্পে অল্পে পাঠক-চিত্ত থেকে লোপ পেয়ে গেল। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনিও বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ সাহিত্যশিষ্য। যদিও পরবর্তিকালে শাস্ত্রীমহাশয় প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসে অধিকতর অভিনিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাহিত্যপ্রবন্ধগুলির স্মিত রূপ ও সহজ কথোপকথনের ঢঙে লেখা সমালোচনাগুলি মননে খুব তীক্ষ্ণ না হলেও পাঠকমহলে সুখপাঠ্য বলে পরিচিত।

রবীন্দ্রপর্ব

উনিশ শতকের শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান হলে বাংলা সাহিত্যের উদার প্রাঙ্গণে বঙ্কিম-শিষ্যেরা কিছুকাল অবাধ বিহার করেছিলেন

৩ এখানে স্থান-সঙ্কোচনের জন্য লেখকদের দু-একটি গ্রন্থের নাম উদ্ধৃত হল।

বটে, কিন্তু নানা বাধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ক্রমেই শক্তি অর্জন করল। একাধারে কবি ও সমালোচক হিসেবে এতখানি প্রাধান্য ও মননশক্তির সুদূর ব্যাপকতা একমাত্র ইংরেজী সাহিত্যের ড্রাইডেন, কোল্‌রীজ, শেলী ও আর্নল্ড ছাড়া পশ্চিম বিশ্বেও বড় একটা চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ পনেরো বছর বয়স থেকে সমালোচনা শুরু করেন; কৈশোর বয়সেই তিনি যে রকম তীক্ষ্ণ মননের পরিচয় দিয়েছিলেন তার সমতুল্য দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নয়। বস্তুতঃ ১৮৭৬ সালে মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম সমালোচনাতেই ('ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসরসরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনী') ভাবীকালের সম্ভাবনা পাওয়া গেল। বাংলা ১২৮৪ সাল এবং ১২৮৯ সালের 'ভারতী'তে তিনি দুবার 'মেঘনাদবধে'র প্রখর সমালোচনা করেন। তখন তাঁর বয়স কুড়ি-একুশের বেশি নয়। অবশ্য বয়োধর্মগত তারুণ্যের জন্য এই সমালোচনা কিছু তীব্র ও আক্রমণাত্মক হয়েছিল। ইংরেজী ১৯০৪ সাল থেকেই তাঁর যথার্থ সমালোচনা-প্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হল। 'ভারতী', 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত প্রবন্ধ ১৯০৭ সালে তিনখানি গ্রন্থে ('প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্য' ও 'আধুনিক সাহিত্য') সঙ্কলিত হয়। 'সাহিত্যে' তিনি সাহিত্যতত্ত্ব, রসবিচার, সমালোচনা ও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্যান্য দুটি গ্রন্থে রসবাদী মনোভাবই প্রধান হয়ে উঠেছে। যদিও এই যুগের সমালোচনায় তিনি কিয়ৎ-পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু 'আধুনিক সাহিত্যে' তাঁর মনোভাব শুধু আবেগপ্রবণ নয়, তা যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধিবিবেচনাধীনও বটে। এর দীর্ঘকাল পরে ১৯৩৬ সালে তাঁর 'সাহিত্যের পথে' ও মৃত্যুর পরে ১৯৪৩ সালে 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন সাহিত্যসমস্যা, আধুনিকতা, আধুনিক কাব্য ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই তাঁর চিত্তে নানা প্রশ্ন ও সংশয় জেগেছিল। 'সাহিত্যের

পথে' গ্রন্থে তিনি পূর্বতন সৌন্দর্যবাদ ও রসবাদ দিয়েই শুধু সাহিত্যবিচার করলেন না, ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের নিরিখে সাহিত্য-তত্ত্বকে দার্শনিকতার পর্যায়ে তুলে ধরলেন।

তাঁর সমালোচনা-গ্রন্থ, চিঠিপত্র ও ডায়েরি থেকে মনে হয়, তিনি সাহিত্যবিচারে শেষ পর্যন্ত রসবাদের প্রভাব থেকে নির্মুক্ত হতে পারেন নি। বাস্তবতা, সমাজমানসিকতা ইত্যাদির প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাঁকে রসলোক থেকে মাটির বুকে টেনে নামাতে পারে নি—তা স্বীকার করতেই হবে। এদিক থেকে তাঁর মতের সঙ্গে ক্রোচে ও পেটারের কিছু সাদৃশ্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর তিনিই বাংলা সমালোচনাকে তত্ত্ববাদ ও ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দিক থেকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরে দাঁড় করালেন।

এই সাহিত্যবিচারপ্রসঙ্গে তাঁকে অনেকবার মতকলহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছিল। বিশ শতকের প্রথম দশকে দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি সাহিত্যিক ও সমাজ-নেতৃবৃন্দের নির্মম কটুবাক্য তাঁর ওপরে নির্বিচারে বর্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার প্রেরণা সম্বন্ধে যে দৈবী চৈতন্যের কথা বলেছেন,[৪] সমালোচকদের দল, বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাকে ছলনা ও ভণ্ডামি বলে সুরুচিহীন ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করলেন। বিপিনচন্দ্র পাল সে পথে না গিয়ে বাস্তবের প্রশ্ন তুলে বললেন যে, রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পূর্ণ অবাস্তব—অতএব সাহিত্যাংশে তা হেয়। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের 'নারায়ণ' পত্রেও রবীন্দ্র-বিরোধিতা শুরু হয়েছিল। তর্ক প্রবলাকার ধারণ করল ১৯১৪ সালের দিকে। প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত 'সবুজপত্রে' রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রকাশিত হত; ফলে যাঁরা 'সবুজপত্র'-বিরোধী ছিলেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের

৪ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক গ্রন্থে তাঁর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ আত্মজীবনীর ছাঁচে তাঁর অন্তরঙ্গ কবিজীবনীর পরিচয় দিয়েছিলেন। তাতে তিনি তাঁর কাব্যসাধনাকে জীবন-দেবতার সঙ্কেতসূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এই কথা বলেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রায় অকারণে এই রচনাটির প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথকে অশোভনভাবে আক্রমণ করেন।

প্রতিও বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তরুণদের পক্ষ থেকেও তাঁর ওপর আঘাত এল। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বললেন যে, রবীন্দ্রসাহিত্য ভাবলোকবাসী অশরীরী ও বস্তুস্বরূপহীন—অতএব তা যথেষ্ট আধুনিক নয়। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই সমস্ত মতামত তাঁর 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হলে যাঁরা নির্জলা বাস্তববাদ পছন্দ করেন, তাঁরা পরম প্রীতি লাভ করলেন। এর পর 'বিচিত্রা' পত্রে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে (যাতে তিনি য়ুরোপীয়ানার সাম্প্রতিক ফ্যাশন ও অসংযত আধুনিকতাকে মেনে নিতে পারেন নি) ১৯২৭-২৮ সালের দিকে সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আবার বিতর্ক প্রবল হয়ে উঠল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এই দ্বন্দ্বে 'যুদ্ধং দেহি' রবে মালসাট মেরে সাহিত্যরণাঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন। তাঁরা রবীন্দ্র-মতের ঘোরতর প্রতিবাদ করে দেখালেন যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নীতিদুর্নীতি, সুন্দরকুৎসিতের চেয়ে মানবজীবনের বিচিত্র হার্মনি অধিকতর গৌরবান্বিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সত্য, সৌন্দর্য, নিত্যতা প্রভৃতি সাহিত্যবিষয়ক অভিমত বিশ শতকে অচল। য়ুরোপীয় জীবনকল্লোল বাংলা সাহিত্যের খালবিলে সমুদ্রসঙ্গীত সৃষ্টি করছে—এ তো সাহিত্যের সজীবতার লক্ষণ। এই সমস্ত তর্কবিতর্ক ও মতদ্বন্দ্ব থেকে বাংলা সমালোচনার মূল লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হবে। বিশ শতকের প্রথম দু দশকে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে অভিযোগ ছিল দুটো—তা যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু নয় এবং তাতে দুর্নীতির প্রশ্রয় আছে। দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকে তাঁর ওপর নতুন অভিযোগ নিক্ষিপ্ত হল—তা যথেষ্ট বাস্তব নয়। বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র—এঁরা প্রধানতঃ বাস্তবতার অভিযোগ এনেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, এঁদের এ সমস্ত অভিযোগে সমালোচকদের নিঃস্পৃহ সুরটি ধরা পড়ে নি; বরং রবীন্দ্রনাথের মত ও মন্তব্যগুলি স্থায়ী মূল্য আজকের দিনেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য। সাহিত্যতত্ত্ব

সম্বন্ধে তিনি কোন অভিনব মতবাদ প্রচার বা 'স্কুল' প্রতিষ্ঠা না করলেও তাঁর আলোচনায় বাংলা সমালোচনা যৌবনের যথার্থ দার্ঢ্য অর্জন করেছে। তাঁকে সাধারণ ভাবে সাহিত্যবিচারে সনাতনপন্থী বলা যায়। রস, সৌন্দর্য ও বৃহৎ জীবনাদর্শ—তাঁর সমালোচনায় প্রধানতঃ এই তিনটি স্তর বিকাশ লাভ করেছে। সাহিত্যবিচারে মনোবিজ্ঞান, সমাজদর্শন, রাজনীতি-অর্থনীতি ইত্যাদি বাস্তব পরিবেশ-চেতনার ওপরে তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের ভাবমণ্ডলে বর্ধিত বলেন্দ্রনাথের 'চিত্র ও কাব্য' (১৮৯৪) নামক সমালোচনাগ্রন্থটি পাঠকপাঠিকার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা দাবি করতে পারে। ঠাকুরবাড়ির তরুণ লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী গদ্যলেখক বলেন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে লোকান্তরিত না হলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যশিষ্য হিসেবে তাঁর সমালোচনা প্রতিভা নতুন দিকে বিকশিত হতে পারত। বলেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ সংস্কৃত সাহিত্যবিচারের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও, আলোচনাতে এমন একটি প্রসন্ন ব্যক্তিগত রুচি ও পরিমিত মতামতের সবজনভোগ্য রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ ধরনের সমালোচনার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রানুরাগী অথচ প্রখর ব্যক্তিত্বশালী প্রমথ চৌধুরী ('বীরবল') সাহিত্যবিচারে বিশ্লেষণপন্থী ও বুদ্ধিজীবী হলেও রসই তার অন্বেষিতব্য। রবীন্দ্রনাথ যাকে "অপ্রয়োজনের আনন্দ" বলেছেন, বীরবল তাকেই "সাহিত্যে খেলা" নাম দিয়েছেন। তার তীক্ষ্ণ ও তীর্যক সমালোচনা মননশীলতার চূড়ান্ত রূপ বলে বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে চিরদিন নন্দিত হবে। ভারতচন্দ্র, রামমোহন, বাংলা সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য, য়ুরোপীয় সাহিত্যে রেনেসাসের প্রভাব—সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের ভাষাসমস্যা সম্বন্ধে 'বীরবল' যে মন্তব্য করেছেন ও নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন, তাতে তাঁকে একটি ব্যক্তিবিশেষ বলে না ধরে একটি ইনস্টিটিউশন রূপে গণ্য করা উচিত। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁকে ঘিরেও একটি

শক্তিশালী, প্রাণবান্, ঐতিহ্যবাদী ও সংস্কারপন্থী সাহিত্যচক্র সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর বালিগঞ্জের বাসভবনকে বাঙলা দেশের 'সালোঁ' এবং তাঁর ভক্তগোষ্ঠীকে *Bloomsbury Group* বলে অভিহিত করলে উপহসিত হতে হবে না। 'সবুজপত্রে'র বনস্পতি বহু নভোচারীকে আশ্রয়শাখা দান করেছিলেন এ কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য। শুধু পরিতাপ এই যে, 'বীরবল' যথোপযুক্ত 'সিরিয়স' হয়ে সমালোচনায় অবতীর্ণ হন নি। তাঁর 'খেয়াল খাতা'র খেয়ালিপনার সঙ্গে যদি বঙ্কিম-রবীন্দ্রসুলভ সুদৃঢ় তন্নিষ্ঠতা থাকত, তা হলে বাঙলার দুর্বল সমালোচনা অচিরে নব জীবনরস লাভ করতে পারত।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের আগে থেকেই বাংলা সমালোচনায় তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি হল প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের ধারা, একটি উনিশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সমালোচনার প্রভাব, আর একটি সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় সাহিত্যবিচারপদ্ধতির আদর্শ। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'সবুজপত্রে'র দীর্ঘ প্রবন্ধে ভারতীয় অলঙ্কারতত্ত্ব, বিশেষতঃ ধ্বনিবাদ ও রসবাদকে নতুন দৃষ্টির আলোকে বিচার আরম্ভ করেন। পরে সেই প্রবন্ধগুলি 'কাব্যজিজ্ঞাসা' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাটি প্রকাশের পর অনেক পণ্ডিত ও অধ্যাপক এই অলঙ্কারতত্ত্বকেই সাহিত্যসমালোচনার যথার্থ রীতি বলে গ্রহণ করলেন। ধ্বনি, রস, অলঙ্কার, ভাব প্রভৃতি তত্ত্বের দ্বারা এঁরা সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হলেন। এঁদের মতে পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের চেয়ে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র অধিকতর সুদৃঢ় যুক্তিতত্ত্বের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুধীর-কুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতি অধ্যাপকেরা এই অলঙ্কারতত্ত্বের ধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। অপর দিকে মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-

বিচারে উনিশ-শতকী য়ুরোপীয় সমালোচনার দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত শেষ পর্যন্ত আশ্রম-মাহাত্ম্যে সাহিত্য ও দিব্যজীবনের 'ইকোয়েশন' নির্ণয় করতে গিয়ে সাহিত্যবিচারের প্রশংসনীয় প্রতিভার অনেকটা বিসর্জন দিয়েছেন।

কবি মোহিতলাল কিছু কিছু মানসিক বিক্ষেপ সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের পর সাহিত্যবিচারের ধারাটিকে আর্নল্ড ও পেটারের আদর্শে বলিষ্ঠতর করে তোলেন। অবশ্য তিনি উনিশ শতকের য়ুরোপীয় সাহিত্য ও সমালোচনার অমৃতরস সেবন করে যতটা মানসিক উচ্চতা লাভ করেছিলেন, বিশ শতকের সাহিত্য ও সমালোচনাকে ঠিক ততটা হৃদ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি। সে যাই হোক তাঁর সমালোচনায় যে রকম সুগভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুলপ্রসারী মনস্বিতা দেখা যায়, আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের পর সে রকম সুগভীর প্রত্যয় ও দূরাভিসারী মনঃপ্রকর্ষ আর কারো মধ্যে বিশেষ সুলভ নয়।

শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যাকাডেমিক সমালোচনায় বিস্ময়কর বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন যা ইদানীং পল্লবগ্রাহী শৌখীন সমালোচনার যুগে দুর্লভ। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর সমালোচনা যেমন বিশ্লেষণাত্মক, তেমনি একটি সর্বাঙ্গীণ রূপ নির্ধারণে নিয়ত সমুৎসুক। পাণ্ডিত্য, রসবোধ ও রসিকতা তাঁর সাহিত্যালোচনাগুলিকে একটা ধূপছায়া ধরনের স্বাদু মাধুর্য দান করেছে।

গত দু দশক ধরে বাংলা সমালোচনা নানা ঘাত প্রতিঘাতে বিত্রস্ত হয়ে পড়েছে। ইতিপূর্বে 'সবুজপত্র' গোষ্ঠী তীক্ষ্ণ মননের দ্বারা বাংলা সমালোচনাকে বাধামুক্ত করলেন; পরে 'কল্লোল' পত্রে অধুনাতন য়ুরোপীয় জীবনদর্শন ও শিল্পবিচার প্রসঙ্গে সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক অভিনব মতের আমদানি হয়েছে। ঈষৎ পরে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা

সমালোচনাকে নানা দিক থেকে রুচিবান করে তুলেছেন। সুধীন্দ্রনাথের মননধর্মী সাহিত্যবিচারপদ্ধতি ও বিশ্বসাহিত্যে স্বেচ্ছাবিহার এবং বুদ্ধদেব বসুর রোমান্টিক ও ব্যক্তিক সমালোচনার স্বপ্নিল পদচারণা বাংলা সমালোচনায় নতুন সুর সংযোজনা করেছে। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় শিল্পসমুদ্রের উত্তরস্নাতক এবং আধুনিক ভারতীয় শিল্পেরও একজন সুরসিক ভাষ্যকার। অনধিকারীর কাছে তাঁর সাহিত্যবিচার খানিকটা 'ওঁ হিলিহিলিং ওঁ কিলিকিলিং' ধরনের মনে হলেও আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যপরিমিতি তাঁর হস্তামলকে পরিণত হয়েছে, তা কে অস্বীকার করবে? অবশ্য তাঁর 'সন্ধ্যাভাষা'র উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দুর্ভেদ্য আভিজাত্যের বেড়া দিয়ে ঘেরা বলে সহৃদয় পাঠক অনেক সময় তাঁর বাক্‌পুঞ্জের অন্বয় করতে অপরাগ হয়ে তাঁর ওপর বীতানুরাগ হয়ে পড়েন। অবশ্য এখানেই বাংলা সমালোচনা থেমে নেই। যাঁরা মার্কসপন্থী, বস্তুবাদী ও পূর্বহেতুজ ইতিহাস-চেতনায় বিশ্বাসী—তাঁরা সামাজিক প্রয়োজনের পক্ষ থেকে সাহিত্যবিচার করছেন। এঁদের মতে সাহিত্য মূলতঃ বস্তু-উপাদানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, মানসিক উপাদান বস্তু উপাদানেরই 'বাই-প্রোডাক্ট'। শিল্পতত্ত্বে এঁরা পরিবেশপন্থী। সাহিত্যবিচারে বামাচারী শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার সশিষ্য এই পথের পথিক।

সম্প্রতি বাংলা সমালোচনাসাহিত্য খানিকটা সাংবাদিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। স্বল্পবিত্ত ও অনধিকারী তরুণ সমালোচকেরা সাহিত্যবিচারের সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে সমাজনীতি, মনোবিজ্ঞান ও আর বিদেশী গুরুর মন্ত্রবচন কণ্ঠে ধারণ করে এঁরা সমালোচনার খোলামাঠে যথেচ্ছা বিচরণ করছেন। এরই মধ্যে শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায় সুগভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সংস্কারবর্জিত উল্টোপাল্টা কথা বলে পাঠকমহলে খানিকটা উত্তাপ ও উত্তেজনা সঞ্চার করতে পেরেছেন। অবশ্য অপ্রিয় সত্যভাষণের দম্ভ তাঁর বিচারবুদ্ধিকে অনেক সময়ে একপাক্ষিকতার এক কোণে সরিয়ে রাখে, তাও শঙ্কার সঙ্গে স্মরণীয়।

বর্তমান বাংলা সমালোচনা সামান্য দলাদলি ও ব্যক্তিগত কলহের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করে আদর্শগত বিরোধের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন বিশুদ্ধ সাহিত্য দিয়ে সাহিত্যবিচার করা হচ্ছে না,—সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি প্রভৃতি বস্তুগ্রাহ্য পূর্বহেতুর দ্বারা সাহিত্যের বংশকৌলীন্য নির্ধারিত হচ্ছে। ফলে অনেক সময়ে সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে মূল্যাবনতি ও মূল্যান্তর ঘটছে। য়ুরোপে যেমন গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমালোচনার রূপান্তর হলেও এখনও যুগান্তর আসে নি, বাংলা সমালোচনা সম্বন্ধেও সে কথার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার ফলে অ্যাকাডেমিক সাহিত্যালোচনা ও গবেষণার সীমা বেড়ে গেছে এবং 'ডিলাটেন্ট' সমালোচকের কৃপায় নানারকম মতবাদ সাহিত্যবিচারশালায় সাক্ষীসাবুদ নিয়ে হাজির হয়েছে। আগামীকাল বাংলা সমালোচনা কোন্ পথে যাবে, সৌন্দর্যবিচারের অক্ষয় স্বর্গবাস, না গণজীবনের অনিকেত হাহাকার, তার স্বরূপ নির্ধারণ করা সহজ নয়।

॥ নির্ঘণ্ট ॥